বর্ত্তমান থাকিতে অপরকে অধীন করিয়া নিজে উচ্চ হইবার চেষ্টা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম জড় হইতে চেতন পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে মহাবেগে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এক পরমাণু অপর হইতে বিযুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। পৃথিবী সূর্য্য হইতে এবং সূর্য্য সূর্য্যান্তর হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। চোর এই স্বাধীনতার প্রেরণায় যথার্থ পথ না জানায় চুরী করিতেছে আবার সাধু মহাপুরুষেরা ঈশ্বরকৃপায় স্বার্থহীন বিশুদ্ধ ভালবাসাই এই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ জানিয়া দিন দিন জীবনের মহান্ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামই মনুষ্যকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইতেছে এবং অবশেষে পূর্ণ জ্ঞানভক্তিতে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করিয়া তাঁহার অনন্ত শক্তির অধিকারী করিয়া দিতেছে। এ স্বাধীনতালোপ জগতে কে কাহারই বা করিতে পারে? স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, বন্ধু, গুরু প্রভৃতির সহিত যদি নিত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে চাও, তো নিজের স্বার্থকে বলি দিয়া তাহাদের সুখে সুখী হও। ভগবানের মূর্ত্তি জানিয়া তাহাদের সেবায় রত থাক। জগতের যাবতীয় স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ও পুরুষকে দেবতাজ্ঞানে দর্শন করিতে চেষ্টা পাও ও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন কর।

এখন বেদান্তের বিবর্ত্তবাদের বিষয় কিছু বলিয়া আজকার কার্য্য শেষ করিব। আমরা এই সৃষ্টিকার্য্য দুই দিক্ দিয়া অবলোকন করিতে পারি। ১ম, আমাদের মনুষ্যের দিক্ দিয়া দেখিলে আমরা সৃষ্টি, তাহার ক্রম, নিয়ম, শক্তি প্রভৃতি এবং পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান, হিতাহিত প্রভৃতি দেখিতে পাই। কিন্তু যদি কল্পনা করিয়া ভগবানের দিক্ হইতে ইহা দেখিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে কি দেখি? সৃষ্টি ও সৃষ্টির ভিতরের কিছুরই বিদ্যমানতা দেখিতে পাই না। কারণ, সৃষ্টি ত সেই ভগবানেই রহিয়াছে; তিনি ছাড়া ত কিছু নয় বা নাই। অতএব যদি কেহ কোন উপায়ে ঈশ্বরদৃষ্টি লাভ করিতে পারে, সে আর কখনই জগৎকে আমাদের মত দেখিতে পারে না। জগৎকে দেখিতে হইলে আপনাকে জগৎ হইতে অন্ততঃ কিছু ভিন্ন, এ ভাব না হইলে কখন সম্ভবে না। অতএব সে তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টার সহিত সর্ব্বতোভাবে একত্ব অনুভব করিতে থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থাই বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ নামে কথিত এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে জগতের অস্তিত্ব, পাপপুণ্য প্রভৃতি সমুদয় মানিয়া লইয়া বহুকাল কর্ম্মভক্তিজ্ঞানযোগাদি দৃঢ়

অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। তবেই অবশ্য আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ একত্ব আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন সেই বাক্যাতীত অবস্থার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ধ্রুবচরিত্র।

দ্বিতীয় অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(সুনীতির কুটীর, গাইতে গাইতে ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব।　　মা! এনেছি কত ফুল তুলে,
　　দে না দে না মালা গেঁথে, ওমা
　　　　গেঁথে দে না এই ফুলে ফুলে।

সুনী। বাবা! এতক্ষণ কোথা ছিলি? দেখ দিকি নি, গায়ে কত ধুলো মেখেছিস্। দুঃখিনীর ধন! আয় কাছে আয়; (ধূলা মুছাইয়া দিয়া) আয় বাবা, আয়, একবার কোলে আয়।

ধ্রুব। ওমা! ওমা! আমাকে মালা গেঁথে দে না। কত ফুল এনেছি; আমি পোর্‌বো, দে না মা—শীগ্‌গির দে না মা।

সুনী। দোব বৈ কি বাবা! একবার দাঁড়া—তোকে প্রাণ ভোরে দেখি। তোকে যে অনেকক্ষণ দেখি নি বাবা।

ধ্রুব। না, শীগ্‌গির দে, নৈলে কোলে থাক্‌ব না।

সুনী। এই যে আমি দিচ্চি বাবা।

(মালা গাঁথিতে আরম্ভ)

ধ্রুব। ফুলের পোষাক পোর্‌বো আমি সাজিয়ে দেমা ভাল কোরে।
　　কোর্‌বো খেলা নেচে নেচে, পোষাক পোরে বনের ধারে॥
　　　　পোর্‌বো গলায় ফুলের মালা,
　　　　পোর্‌বো হাতে ফুলের বালা,
　　ধোর্‌বো মাথায় ফুলের ছালা, ফুল ছড়াব দ্বারে দ্বারে,
　　　　ফুল বিলাব ঘরে ঘরে॥

দৈববাণী। হরিনামের মালা গেঁথে বিলাইবি দ্বারে দ্বারে।

নেপথ্যে। ধ্রুব ধ্রুব, আয়্ খেলবি আয়।

ধ্রুব। সাজিয়ে দেনা শীগ্‌গির কোরে,
খেলা হোলে আস্‌বো ফিরে,
কাঁদিস নে তুই আমার তরে।

(মালা গাঁথিয়া ধ্রুবকে সাজাইতে আরম্ভ)

সুনীতি। (কাঁদিতে কাঁদিতে)
আজ কিনা, বনফুল মালা
পরাই ধ্রুবের গলে!
আহা! দুলিত এ গলে মুকুতার হার
অভাগীর বনবাস নাহি যদি হতো।
বুক ফেটে যায়—
সোনার কঙ্কন স্থানে
আজ কি না ফুলের কঙ্কন!

ধ্রুব। মা! তুই কাঁদিস্ কেন? তুই কাঁদ্‌লে আমি চলে যাব।

সুনী। (দীর্ঘশ্বাস) না—আমি কাঁদিনি,—ও আমি একটা কথা বল্‌ছিলুম।

ধ্রুব। হ্যাঁ মা! বনবাস কি মা? সোনা কি মা? মুক্তো কি মা?

সুনী। মুক্তো একটা ফলের নাম বাবা।

ধ্রুব। মা! আমি খাব, আমাকে খেতে দেনা মা।

সুনী। সে ফল খায়না বাবা—পোর্‌তে হয়।

ধ্রুব। তবে আমাকে পরিয়ে দেনা।

সুনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে)
কোথা পাব মুকুতা রতন?
অবোধ সন্তান!
সে যে বাছা রাজাদের ধন।
আমি অনাথিনী--নহি রাজরাণী;
ভিখারিণী জননী তোমার।
আহা! ফেটে যায় প্রাণ
চেওনা চেওনা আর ওরে যাদুমণি।

ধ্রুব। কাঁদিস্‌নে কাঁদিস্‌নে মা কাঁদিস্‌নে কো আর,
চাব না কখন আমি মুকুতা রতন।

মুক্তার চেয়ে ফুল ভাল, চাইনে আমি মুকুতার হার।

চাহলে পরে মা কাঁদে, কাঁদাব না মাকে আর।

মা! মা! সাজান হয়েছে কি?

সুনী। একটু বাকি আছে বাবা, দাঁড়া।

ধ্রুব। কি বাকি মা?

সুনী। ফুলের মুকুট।

ধ্রুব। মুকুট কি মা?

সুনী। মাথায় পরে। সাজিয়ে দিই, দেখতে পাবি। (ফুল অন্বেষণ) তাই ত, আর যে ফুল নেই। ধ্রুব! আর ফুল নেই, মুকুট হোল না বাবা।

ধ্রুব। ফুল নেই? তবে ঐ লতার মুকুট কোরে দে মা। তাই আমি পোর্‌বো। আমাকে মুকুট পোর্‌তেই হবে।

সুনী। আচ্ছা বাবা, তাই দিচ্ছি। (লতার মুকুট পরাইয়া দেওন)

ধ্রুব। মা! আমাকে এখন কেমন দেখাচ্ছে?

সুনী। বেশ দেখাচ্ছে বাবা। এখন তুমি আমার সামনে নেচে নেচে গান গাও, আমি তোমাকে প্রাণ ভরে দেখি।

ধ্রুব। যাই মা খেলিতে নাচিতে নাচিতে
গাইতে গাইতে যাই।
ঐ দেখ দূরে কত খেলা করে
পথের খেলুনি ভাই।

(গাইতে গাইতে তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। কোথা যাদুমণি যাইবে এখনি
আমি ত ছাড়িব নাই।

ধ্রুব। হয়ে গেল বেলা হবে না যে খেলা,
ছেড়ে দাও আমি যাই।

তপ। গান শুনি তোর হইনু বিভোর,
আবার শুনিতে চাই।

ধ্রুব। বেলা হলে পরে চলে যাবে ঘরে
সকল খেলুনি ভাই।

তপ। আমরা খেলুনি হইব বাছনি
খেলা কর এই ঠাঁই।

ধ্রুব। তাই তাই তাই পলাইয়া যাই
ধর দেখি মোরে মাই।

(প্রস্থান)

সুনী। ভগিনি।
বনবাস এতদিনে স্বর্গবাস মোর।
নহে এ কুটীর মম—রাজার প্রাসাদ।
ধ্রুব রাজা—আমি রাজমাতা
বিধি কৃপা করি
এ রতন দিয়াছেন মোরে,
দিবানিশি ডরি,
পাছে—অভাগিনী আমি—
হারাই এ অমূল্য রতন।

তপ। কি ভয় ভগিনি।
বিশ্বের প্রহরী সদা আছে জাগরিত,
ফিরে তার পাশে পাশে।
অনাথ বালক—অনাথরক্ষক আছে।
ভেব না ভগিনি। যাও তুমি গৃহকাযে।

(সুনীতির প্রস্থান)

তপ। গিরি উপবনে, গোপনে গোপনে,
চল লো চল লো নিঝুম প্রাণ।
দূর গিরি শিরে, নিরঝর তীরে,
প্রাণ নাথে ডাকি গাইব গান॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত।

(খেলা করিতে করিতে ধ্রুব ও বালকগণের প্রবেশ)

১ম বা। আয় সবে মিলি, ধুলো খেলা খেলি,
উচুঁ দিকে আয় ছুড়ে দিই ফোল।

ধ্রুব। না ভাই না ভাই না, করি তোমায় মানা,
ধুলো দিওনা গায় বকিবে যে মা।

২য় বা।　কেন ছোড় ধূলি　　এস কুসুম তুলি,
ফুলে ফুলে ভাই গাঁথি মালাগুলি।

১ম বা।　উড়্‌লো ধূলো দূরে,　　পোড়্‌ছে ঘুরে ঘুরে,
লাগ্‌বে তোদের গায় দাঁড়া সোরে সোরে।

ধ্রুব।　ওকি ওকি ভাই,　　দেখিতে না পাই,
চোখ গেল মোর ধূলায় ধূলায়।

৪র্থ বা। কেন তুই ওর চোখে ধূলো দিলি বল্‌ দেখি নি? আহা, হা— আচ্ছা ছেলে ত তুই! ও সকলের ছোট বলে কি যা ইচ্ছে তাই কর্‌বি? আবার ধূলো দাও দিকিনি, এখনি তোমাকে মজা দেখাব।

১ম বা। আরে যা যা, ভারি মজাওলা হয়েছিস্‌, দেখাতে এলে আবার দেখ্‌তে হবে, তা জানিস্‌।

৩য়বা। কেন ভাই তোরা ঝগড়া কোচ্ছিস্‌? যা ভাই, আর ঝগড়া করিসনে।

ধ্রুব। আয় ভাই—ঝগড়া করিস্‌ নে। আমায় লেগেছে, লেগেছে, যেতে দে ভাই; আমার না হয় একটু কষ্ট হল, তোরা কেন ঝগড়া কচ্ছিস্‌? চল ভাই—ঐ পাহাড়ের ওপর উঠিগে—ফুল তুলি গে, ফল পাড়িগে,—ঐ ঝরণার ধারে বসি গে।

দেখ গিরি শিরে,　　নামে ধীরে ধীরে,
কল কল করি ঝরণা জল।

৩য় বা　　শিলায় শিলায়,　　জল ছুটে যায়,
ফুটে উঠে কত মুকুতা দল।

৪র্থ বা।　　পাখী দলে দলে,　　ডাকে কল কলে,
পাখীসনে গান গাইব চল।

১মবা।　　ফুলগুলি তুলি,　　ধরি পাখীগুল,
শাখায় শাখায় পাড়িব ফল!

সকলে।　　ঐ যে ভানু,　　মলিন তনু
পোড়্‌ছে ঢোলে মেঘের কোলে,
বেলা গেল,　　সন্ধ্যা হোল,
আয় খেলি ধরি গলে গলে।

১মবা। ভাই! এখানে সব চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয় না, ঐ বনের ভেতর যাই, পাখী ধরি গে, ফুল তুলিগে, ফল ছিঁড়িগে।

ধ্রুব। না ভাই। ফল ছিঁড়িস্, ফুল তুলিস্, পাখী ধরিস্ নে। আহা, দেখ্ দেখি, কেমন ওরা বনে বনে বেড়াচ্ছে,—কেমন মিষ্টি গান গাচ্ছে। ওদের ধল্লে পর আর কি ওরা অমন কোরে গান গাবে?

৪র্থবা। যা যা;—আর পাখী দোর্ত্তে হবে না। খালি তোমার দুষ্টুমি।

ধ্রুব। আয় ভাই, আমরা ফুল তুলিগে।

৩য়বা। না ভাই, আর ফুল তুলে কায নেই: সন্ধ্যা হয়েছে, পড়া তৈরি কোর্ত্তে হবে,—নৈলে পাঠশালে গুরু মশায়ের কাছে মার খেতে হবে। তোরা সব চলে আয়। ধ্রুব! আয় ভাই।

১মবা। ধ্রুব গিয়ে কি পড়া তৈরি কোরবে না কি? ও কি পাঠশালে যায় না কি?

২য়বা। হ্যাঁ ভাই ধ্রুব! তুই পাঠশালে যাসনে কেন? তোর মা কি লেখা পড়া শেখায় না?

ধ্রুব। মা বলে—কি কোরে লেখা পড়া শেখাব বাবা, আমার কি আছে যে, তোকে কাপড় কিনে দোব, পাততাড়ি দোব, কলম দোব, কালি দোব; এ সব তোকে কে দেবে বাবা? এই কথা মা আমাকে কেবল বলে।

২য়বা। কেন, তোমার বাবার কাছে যাও না ভাই?

ধ্রুব। বাবা আমার কে, মা বৈ ত কাকেও জানি না।
মায়ের কাছে থাকি, মা মা বোলে ডাকি,
মা বৈ ত কাকেও জানি না।
ক্ষিদে পেলে, মা মা বোলে,
ঝাঁপিয়ে উঠি মায়ের কোলে,
মা ডাকে আমায় বাবা বোলে, আমি মাই খাই
আর বলি মা মা।

বাবা কি ভাই? আমার বাবা কে? মাই তো আমাকে বাবা বাবা বলে। বাবা কে ভাই?

সকলে। হা হা হা হা, বলিস্ কি রে?

ধ্রুব। ভাই! তোরা অত হাস্‌লি কেন?

১মবা। আরে দূর বোকা, তোর বাপ আছে, তুই তার নাম জানিস্ না বোধ হচ্ছে।

ধ্রুব। না ভাই, আমি জানি নি।

৪র্থ। আচ্ছা, কাল তুই তোর্ মাকে জিজ্ঞাসা কোরে আমাদের কাছে বলিস্।

১মবা। আর তুই যখন কাল আমাদের সঙ্গে খেলা কোত্তে আস্‌বি, তখন তুই একটুখানি কাপড় পোরে আসিস্ নে। একখানা ভাল কাপড় পোরে আস্‌বি আর কাঁধে একখানা উত্তরী নিয়ে আস্‌বি।

ধ্রুব। উত্তরী কেন?

৪র্থবা। ওরে, আমরা তোকে এ দেশের রাজার কাছে নিয়ে যাব। রাজার কাছ থেকে তোকে কিছু টাকা চেয়ে দোব; তা হোলে তোর লেখা পড়ার খরচ চোল্‌বে,—ভাল কাপড় হবে,—আমাদের সঙ্গে রোজ পাঠশালে যেতে পার্‌বি।

ধ্রুব। আচ্ছা, তাই কোর্‌বো।

৪র্থবা। এখন সন্ধ্যা হোয়েছে—বাড়ী যাবি, চল্।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুনীতির কুটীর।

সুনী। এ জীবনে আসিয়াছে যেন
নূতন জীবন।
বিশুষ্ক লতায়, ফুটিয়াছে একটী কুসুম,
আমোদিত প্রাণ সৌরভে তাহার।
বিধি কৃপাবলে, পাইয়াছি এই অমূল্য রতন,
কাঙ্গালিনী আমি—নাহি অন্য ধন,
হৃদয় কৌটায় পূরে সদা তাই রাখিতে বাসনা।
চন্দ্রানন হেরিয়া ধ্রুবের ভুলে যাই সকল যাতনা।
করিলে ধারণ বক্ষে ধ্রুবনিধি মোর
জুড়ায় সকল জ্বালা
সন্ধ্যা হোয়ে এল—
এখনও ধ্রুবমণি মোর কেন নাহি ফিরে এল?
বহুক্ষণ গিয়াছে খেলিতে,
আকুল হইল বড় প্রাণ।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

সুনী। হাঁ বাবা! এতক্ষণ কোথায় ছিলি? মুখখানি শুকিয়ে গেছে। আয়—কিছু খাবি আয়।

ধ্রুব। (নিরুত্তর)

সুনী। চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? অনেকক্ষণ কিছু খাস্‌নি—আয় খাবি আয়।

ধ্রুব। না, আমি খাব না।

সুনী। কেন? তোর্ কি হোয়েছে?

ধ্রুব। কিছু না।

সুনী। তবে খাবিনি কেন?

ধ্রুব। তুই আমাকে একটা কথা বোল্‌বি বল—তবে খাব।

সুনী। কি কথা?

ধ্রুব। আমার বাবার নাম কি?

সুনী। (বিস্মিত হইয়া স্বগতঃ)

কে শিখালে হেন প্রশ্ন মোর বাছনিবে?
এ প্রশ্নের কি দিব উত্তর।

ধ্রুব। মা, বল্ না। বল্‌বিনি? বল্‌বিনি?

সুনী। নাহি জানি কি দিব উত্তর।

শুকাইল কণ্ঠ, রসনা নীরস,
ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস
শোণিত প্রবল বহে
হৃদ্‌পিণ্ড দুক দুক করিছে আমার,
কি দিব উত্তর
শিশু নাহি জানে নিজ পিতৃনাম!

ধ্রুব। মা! নাম বল্‌না।

সুনী। আজ নয়—কাল বোল্‌বো।

ধ্রুব। না—এখনই বল্।

সুনী। (স্বগতঃ) কি করি?—বলিব কি?

বলিলে—জানিবে সন্তান
রাজার কুমার আমি।

অবোধ সন্তান, রাজপুত্র বলি
যথা তথা দিবে পরিচয়,
কে বিশ্বাস করিবে উহার ?
পরিশেষে লাভ উপহাস !
নাম যদি নাহি বলি—
অপযশ পরিণাম !
পুত্র নাহি জানে নিজ পিতৃনাম।
ছি ছি ! কি লজ্জা !

ধ্রুব। ওমা ! কি ভাব্‌ছিস্ ?—বল্‌না।

সুনী। তোর্ পিতার নাম উত্তানপাদ। হোয়েছে ত ; এখন আয়—খাবি আয়।

ধ্রুব। মা ! আর একটা কথা আছে।

সুনী। আবার কি ?

ধ্রুব। আমাকে কাল ভাল কাপড় পোরিয়ে দিতে হবে।

সুনী। ঐ যে কাপড় রোয়েছে বাবা, আবার কাপড় কেন ?

ধ্রুব। না, ভাল কাপড়, আর কাঁধে পর্‌বার উত্তরী চাই।

সুনী। উত্তরী কোথা পাব বাবা, উত্তরী নেই।

ধ্রুব। না, না দিলে আমার খেলুনিরা আমাকে নিয়ে খেলা কোর্‌বে না।

সুনী। উত্তরী নিয়ে কি আর খেলা করে ! তোমার ঐ কাপড় পোরে খেলা কোরো বাবা।

ধ্রুব। তারা যে আমাকে উত্তরী নিয়ে যেতে বোলেছে।

সুনী। কোথা পাব বল্, তাই তোকে দোব ?

ধ্রুব। না, আমাকে দিতেই হবে। (জানুধারণ)

সুনী। বাবা ! আমি দুঃখিনী ; তুই দুঃখিনীর ছেলে ; আমি পরের কাছে তোর ঐ ছোট কাপড় খানি ভিক্ষে কোরে এনেছি। বার বার ভিক্ষে কোত্তে লজ্জা হয় যে বাবা।

ধ্রুব। মা ! তুই একবার ঘরের ভেতর খুঁজে দেখ্ না–যদি কিছু কাপড় থাকে ;

সুনী। (স্বগতঃ) বুক ফেটে যায়,

রাজার কুমার লালায়িত আজি এক খণ্ড বস্ত্র তরে।
রাশি রাশি বস্ত্র, দরিদ্র আতুরে
অকাতরে কত করিয়াছি দান—
আজ কি না প্রাণের সন্তানে
সামান্য উত্তরী খণ্ড নাহি পারি দিতে।
বিদীর্ণ হউক বক্ষঃ, ছেড়ে যাক্ প্রাণ,
হতভাগী সুনীতির লুপ্ত হোক্ নাম,
প্রাণের সন্তান বস্ত্র চাহে,
নাহি পারি দিতে।
(প্রকাশ্যে) আমি জানি বাবা, কিছুই নেই।

ধ্রুব। মা! তবে কাপড় আর উত্তরী হবে না ?

সুনী। বাবা! আর চাস নি—আর মা বোলে ডাকিস্ নি।

ধ্রুব। মা! তোর কাছে নইলে কার কাছে চাইব ?

সুনী। মা বসুন্ধরে! দ্বিধা হও,
লুকাই তোমার আঁধার জঠরে ;
লুকাইলে ধ্রুব আর পাবে না দেখিতে,
না চাহিবে বস্ত্র আর।
"মা! মা!" বলি রোদিবে যখন,
পৃথিবী জঠর হোতে করিব উত্তর
নাহি তোর মা—মা তোর মরিয়াছে।

ধ্রুব। মা! তুই কি বল্‌ছিস্ ?—তুই কি মরে যাবি বল্‌ছিস্ ? তবে আমি কোথায় দাঁড়াব ? তবে আর আমি কাপড় চাই নি।

সুনী। রাগ করিস্ নে, দোব এখন।

ধ্রুব। কোথা থেকে দিবি ?

সুনী। আমার এই পরা কাপড় থেকে এবই আঁচল ছিঁড়ে দোব।

ধ্রুব। না মা! তোর্ কাপড় ছিঁড়িসনি, তুই কি পোর্‌বি ? আমি চাইনি—আমি কারু কাছে উত্তরী ভিক্ষে কোরে নোব।

সুনী। না বাবা, আমি বেঁচে থাকতে তোকে ভিক্ষে কোত্তে দোব না। মা তোর্ মোরে যাক্, তার পর ভিক্ষে করিস। কাপড় থাকতে ভিক্ষে কেন বাবা ?

ধ্রুব। না মা, তোর্ আঁচল ছিঁড়িস্‌নি।

সুনী। আচ্ছা এখন আয়, খাবি আয়।

ধ্রুব। আর তুই কাঁদ্‌বিনি বল্।

সুনী। না, তুই আয়। [উভয়ের কুটীর মধ্যে প্রবেশ]

সাধনা।

বর্ত্তমান কালে সমুদয় ভারতে 'সাধনা,' 'সাধনা' বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে। উহা এক হিসাবে খুব শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু অপর দিকে, এই হুজুক ধরিয়া নানাপ্রকারের লোক নানারূপে আপন আপন স্বার্থ চরিতার্থের, প্রাধান্যলাভের ও স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতপোষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেকে অজ্ঞাতসারে করিতেছে—তাহারা জানে না, ইহা কতদূর দায়িত্বের কার্য্য, অনেকে আবার জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মের বাজারে এই প্রতারণার জাল বিস্তার করিয়াছে। শাস্ত্রসমূহ ইহাঁদের হাতে পড়িয়া নানা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। নানাপ্রকার সত্যমিথ্যামিশ্রিত আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অদ্ভুত অর্থে শাস্ত্রের প্রকৃত মূর্ত্তি চেনা ভার হইয়া পড়িয়াছে। নবানুরাগীর এই সকল ধাঁধায় পড়িয়া দিগ্‌ভ্রমের বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

আকাঙ্ক্ষা যদি বাস্তবিক জাগিয়া থাকে, আর যদি সাধক অপকট হন, তবে এই সকল জালের মধ্য হইতেও ঈশ্বরকৃপায় তিনি অবশ্যই প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেরূপ আকাঙ্ক্ষা কয় জনের হয়, কয় জনই বা একেবারে অকপট ঈশ্বরানুরাগী হইতে পারেন?

কেহ কেহ দুই একখানি যোগশাস্ত্র পড়িয়া হয়ত যোগবিভূতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রাণায়ামসাধনের অনুরাগী হইয়া পড়েন ও গ্রন্থবিশেষ হইতে শিখিয়া আপনিই প্রাণায়ামসাধনে প্রবৃত্ত হন। ভাগ্যে অধ্যবসায়হীনতাবশতঃ বেশী দিন ইহা করিতে পারেন না, তাই রক্ষা, নতুবা সংশয়াপন্ন ব্যাধি লইয়া ডাক্তার কবিরাজের শরণাপন্ন হইতে হয়। কেহ বা আমার মত গুরুর নিকট উহা শিক্ষা করিতে যান, যিনি আপনাকে আপনি বাঁচাইতে অক্ষম। কচিৎ কেহ কৃতকর্ম্মা গুরুলাভ করিয়া অধ্যবসায়সহকারে সাধন করিতে পারেন। কিন্তু সাধন করিলেও প্রকৃত লক্ষ্য বিস্মৃত হওয়াতে দুই একটা সামান্য সিদ্ধি লাভ করিয়াই মনে করেন, বাস, আমি সিদ্ধ হইয়াছি।

কেহ বা গুরু অন্বেষণ করেন। শাস্ত্রে পড়িয়াছেন, জ্ঞানীরা জড়োন্মত্ত-পিশাচবৎ ভ্রমণ করেন, তাই পাগ্‌লা ভাবের লোক দেখিলেই সেই দিকে তাঁহাদের টান হয়। এইরূপ কাচে মণিভ্রম করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কাহারও কাহারও অদৃষ্টে প্রকৃত জ্ঞানিজনের মিলন না ঘটে, এমন নহে।

কেহ কেহ শুনিয়াছেন, সাধুমহাত্মারা নিবিড় পর্ব্বতগুহায়, হিমালয়ে বাস করেন। এই মনে করিয়া কেহ কেহ হিমালয়ে মহাত্মাদর্শনের জন্য ধাবিত হন। বাড়ীতে হাহাকার উঠে। তিনিও হয় ত কিছুদিন এইরূপ মহাত্মার বিফল অনুসন্ধানের পর হয় ফের ঘোরসংসারে মগ্ন হন, নতুবা ভণ্ড সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া গাঁজা খাইতে ও বুজরূকি করিতে শিখেন।

ভক্তিপ্রবণ কেহ কেহ সঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়া অথবা সংকীর্ত্তনের দলে মিশিয়া ভক্তিতে বিভোর হন। ক্রমশঃ দশাপ্রাপ্তি হইতে থাকে। ক্রমশঃ হয় নিজে একটী ছোটখাট কৃষ্ণ বিষ্ণু হইয়া দাঁড়ান, সাঙ্গোপাঙ্গ জুটে, নতুবা কোন অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া পড়েন।

জ্ঞানের অনুরাগী যাঁরা, তাঁহারা কতকগুলি বেদান্তের গ্রন্থ কিনিয়া মায়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি লইয়া প্রবল চর্চ্চা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের বিচারের চোটে গগন ফাটিয়া যায়। অনবরত অস্তি, ভাতি, প্রিয়, সমাধি, সোঽহং প্রভৃতি বড় বড় শব্দ তাঁহাদের আলোচনার স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়।

এই সকল নানা গোলমাল দেখিয়া কেহ বা নূতন মত ছাড়িয়া সেই প্রাচীন কুলগুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া সাধনপূজাদি আরম্ভ করেন। কেহ বা গোপনে তান্ত্রিক মতে শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক হইয়া নানামুদ্রা, ন্যাস, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ও পঞ্চমকারের কোন কোন মকার অবলম্বনে সাধনা দ্বারা সাধনা করিতেছি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

ইহাঁদের মধ্যে আবার সংসারে থাকিয়া সাধনা করা উচিত অথবা সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত, এই লইয়াও বিচার চলিয়া থাকে। অধিকাংশ লোক যে মতে বলে, সংসারে থাকিয়া সাধনা শ্রেষ্ঠ, সেই মতেই গমন করেন। দুই চারিজন বালক ও যুবক, কখন কখন দু এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়াও থাকেন।

কেহ কেহ সাধনাকে এতদূর একটা গুহ্য ব্যাপার করিয়া তুলেন যে, তাহার মধ্যে বিন্দুবিসর্গ দন্তস্ফুট করিবার সামর্থ্যও থাকে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয়, হে সাধকগণ, ভগবানের জন্য তোমাদের কাহারও প্রাণ কাঁদিয়াছে কি না? অথবা না কাঁদিয়া থাকে,

প্রাণকে কাঁদাইবার কোন উপায় করিতেছ কি না? মূল লক্ষ্য, ভগবানলাভ যদি সর্ব্বদা মনে থাকে, তবে মনে হয়, অতি সহজ সাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যায়।

সাধনা সহজ বলিলাম, ইহার অর্থ কি? সহজ অর্থে সাধনা করিতে গেলে এত ঘুরিতে হয় না বা নানা গুপ্ত বা কুটিল তত্ত্ব জানিতে হয় না। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যিনি যে কোন মত বা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অপরে ভুল বলিলেও নিষ্ঠা সহকারে তাহা ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

তুমি কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছ। ক্ষতি কি? তুমি আবার আর একটা মন্ত্র লইবার জন্য ঘুরিতেছ কেন? ঐ মন্ত্রকে ভগবানের নাম-বোধে সাধন কর দেখি। কেমন না হয়? সংসারের জন্য তুমি যে পরিশ্রম কর, তাহার শতাংশের একাংশও উহার জন্য কর দেখি, কিছু ফল হয় কি না। ভগবানকে ডাকিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী পাইতেছ না বলিয়া ভগবানকে ডাকা হইতেছে না, নহে। মনকে ঠিক করাই আসল সাধনা। সংসারের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে কঠোর যুদ্ধ করিতে করিতে মনকে ধরিবার চেষ্টা কর দেখি। তুমি কোন মন্ত্র লও নাই, আচ্ছা, ভগবানের যে নাম তোমার ভাল লাগে, তাহা লইয়া তুমি খানিকক্ষণ করিয়া নির্জ্জনে বস দেখি। মনকে ধীরে ধীরে চিনিতে পারিবে, তখন মন ধীরে ধীরে স্থির হইবে। ফস করিয়া একটা কিছু হইবে ভাবিও না। যেমন কঠোর সাধনায় লেখা পড়া শিখিয়াছ, যেমন কঠোর সাধনায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ, তদ্রূপ একটু চেষ্টা কর দেখি, ভগবানের জন্য। সাধনার বিঘ্ন আর কেহ নহে—সাধনার বিঘ্ন তোমার মন। এখান হইতে পালাইয়া তুমি কোথায় যাইবে? যেখানে যাইবে, মনকে ফেলিয়া ত পলাইতে পারিবে না। মনকে যখন ফেলিয়া পলাইতে সমর্থ হইবে, তখনই যথার্থ সংসারত্যাগ হইবে। নতুবা এখান হইতে সেখানে বসিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া অনর্থক শক্তিক্ষয় করিও না। তুমি সংসারী হইবে কি সন্ন্যাসী হইবে, এ ভাবনা ঈশ্বরের উপর দিয়া তুমি তাঁহাকে ভাবিতে চেষ্টা কর। দিনের মধ্যে খাইতে শুইতে বসিতে উঠিতে পড়িতে চাকরি করিতে যত তাঁকে ভাবিতে পার, ততই লাভ, ততই তুমি অগ্রসর হইতেছ। গুরুর জন্য চিন্তা তোমার? একে ওকে তাকে গুরু করিয়া কেন প্রতারিত হইতে যাইবে? তুমি গুরু চিনিবে কিরূপে? তাঁহাকে ডাকিবার শক্তি সকলের ভিতর আছে—তাঁহাকে ডাকিবার চেষ্টা

কর। মনকে স্থির করিবার চেষ্টা কর—রিপুবশ করিবার জন্য ক্রন্দন কর। ভগবান নিজে গুরু জুটাইয়া দিবেন, তিনি স্বয়ং গুরু হইয়া আসিবেন, তিনি স্বয়ং সাধনা শিখাইবেন। তোমার কার্য্য কেবল তাঁকে ডাকা।

আর একটী প্রকৃত সাধনা, যাহা আমরা সকলেই করিতে পারি, তাহা আমরা সকলে বড় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। এ সাধনা সর্ব্বত্রে হয়। এ সাধনায় কোন গুরূপদেশ বা গুহ্যোপদেশের আবশ্যক করে না। এ সাধনায় কিন্তু সকলেই ধন্য হইয়া যায়। শুন নাই কি শাস্ত্রে যে, সকলেই ভগবানের মূর্ত্তি? এই বুদ্ধিতে হে পুত্রকন্যাগণ, তোমরা কেন না তোমাদের পিতামাতার সেবা কর? হে ছাত্রগণ, কেন না, তোমরা তোমাদের গুরু শিক্ষকের সেবা কর? কেন না অতিথি অভ্যাগত আসিলে তাহাকে নারায়ণ জানিয়া প্রাণপণে তাহার সেবা কর? কেন না, প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে তাহার সর্ব্ববিধ সাহায্য করিয়া সাধক নাম ধন্য করিতে চেষ্টা কর? তোমার অর্থ নাই? শরীর ত আছে। তোমার শরীর নাই? বাক্য ত আছে। শোকের সময় কেন না শাস্ত্রের উপদেশ দানে শোক দূর কর? আজ যদি এই নিঃস্বার্থপরতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা পরস্পরের সেবা আরম্ভ করি, তবে দেখ দেখি, এ সংসার নরককুণ্ড না হইয়া ইহাই স্বর্গে পরিণত হয় কি না? নিঃস্বার্থতাই ভগবান। যাহার প্রাণ সকলের জন্য কাতর হইয়াছে, যে নিঃস্বার্থ হইয়াছে, সে কোন যোগ না জানিলেও যোগী, কোনরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী না হইলেও জ্ঞানী, কোনরূপ ভক্তিলক্ষণ তাঁহার অঙ্গে দেখা না যাইলেও তিনি মহাভক্তশিরোমণি। তাঁহার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম।

সমাজ সংস্কার।

আজকালকার হিন্দুসমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনের গতি প্রধানতঃ তিনটী দিকে প্রবাহিত। একদল বলেন, আমাদের প্রাচীন যাহা কিছু ছিল, সব ভাল, তাহাদের রক্ষণেই হিন্দুসমাজের মঙ্গল। দ্বিতীয় দল, সংস্কারের পক্ষপাতী। তৃতীয় দল বলেন, আমাদের প্রাচীন সমুদয় ভাব রক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বর্ত্তমানকালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। প্রথম দলকে রক্ষণশীল, দ্বিতীয় দলকে উন্নতিশীল বলে। তৃতীয় দলের বিশেষ কোন নাম আছে কি না, বলিতে পারি না. আমরা সহজবোধার্থ ইহাদিগকে সমন্বয়কারী নাম প্রদান করিব।

এই তিন দলকে আপাততঃ পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু এই তিন দলের নেতৃগণের মতামত আলোচনা করিলে বোধ হয়, ইঁহারা কেহই পরিবর্ত্তনের বিরোধী নহেন আর কেহই একেবারে প্রাচীন ভাবসমুদয় উড়াইয়া দিবারও পক্ষপাতী নহেন। তবে ইঁহারা এক একটা দিকে বেশী ঝোঁক দেন, এই মাত্র। আর এক কথা এই, ইঁহারা কেহই সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করেন না। অনেকেই কতকগুলি সাধারণ মূলসূত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হন, বিশেষ মীমাংসায় খুব কম ব্যক্তিই অগ্রসর হইয়া থাকেন। কিন্তু মনে হয়, এক্ষণে আমাদের সাধারণ ও বিশেষ উভয় ভাবেই সামাজিক সমস্যা মীমাংসা করিবার আবশ্যক হইয়াছে। শুধু ভাবোচ্ছ্বাসবশে পক্ষবিশেষ সমর্থন করিবার চেষ্টার সময় আর নাই—এখন স্থিরভাবে এই সকল বিষয় বিচার করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে এ সম্বন্ধে নূতন কোন আলোক দিতে পারিব, সে আশা করি না। তবে চিন্তাশীলগণের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করানই আমার এ সামান্য উদ্যমের উদ্দেশ্য।

যাঁহারা প্রাচীনতন্ত্রের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য, প্রাচীন বলিতে তাঁহারা কি বুঝেন? তাঁহারা কি বৈদিক যুগের সমুদয় আচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে চান, না, পৌরাণিক যুগের? অথবা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাপ পিতামহ যাহা করিতেন, তাহাই তাঁহাদের আদর্শ? তাঁহারা এ সম্বন্ধে স্থিরভাবে তাঁহাদের মন্তব্য ব্যক্ত করুন। হিন্দুর ভাগ্যচক্রের ইতিহাস কি তাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন? তাঁহারা কি মানেন, হিন্দুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সামাজিক রীতিনীতির নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? যদি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? সে সকল পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা কে বা কাহারা? সে সকল পরিবর্ত্তনে শুভ না অশুভ ঘটিয়াছে? অথবা কি কোনটীতে শুভ, কোনটীতে অশুভ ঘটিয়াছে? তবে কোন্‌টীতেই বা শুভ, কোন্‌টীতেই বা অশুভ ঘটিয়াছে? যাঁহারা প্রাচীন ভাবে সমাজকে গঠন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অবশ্য ইহা স্বীকৃত সত্য যে, নব্য অশুভ ভাব কতকগুলি প্রবেশ করায় সমাজ বিকৃত হইয়াছে। সেই প্রাচীন সমাজের আদর্শটী কি? এবং নব্য কোন্ কোন্ অশুভ ভাব ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে? প্রাচীন-পক্ষপাতী নেতৃগণ যদি যথাসম্ভব শাস্ত্র ও ইতিহাসসাহায্যে এই সকল তত্ত্ব বেশ খুলিয়া বলিতে পারেন, তবে সমস্যা অনেকটা সোজা হইয়া আসে।

পরিবর্ত্তনপক্ষপাতী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাস্য, তাঁহাদের আদর্শ কি? তাঁহারা

কি প্রাচীন হিন্দুর সমুদয় ভাবগুলিকে অশুভকর বলিয়া বিশ্বাস করেন? পাশ্চাত্য সমাজ কি তাঁহাদের চক্ষে নিখুঁত আদর্শ? পরিবর্ত্তন মাত্রই কি শুভ? অথবা তাঁহারা প্রাচীন প্রাচীনতর প্রাচীনতম হিন্দুসমাজের সকল অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থার কোন্ প্রথাগুলিকে শুভকর ও কোন্গুলিকেই বা অশুভকর বলিয়া বোধ করেন? পাশ্চাত্যসমাজের কোন্ কোন্গুলিকে শুভ, কোন্ কোন্গুলিকেই বা অশুভ বলিয়া বিবেচনা করেন? সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন যদি শুভকর না হয়, তবে কি কি পরিবর্ত্তন কি প্রণালীতে সাধিত হওয়া উচিত? তাঁহাদের মতে মীমাংসা করিবার মধ্যস্থ কে? যুক্তি কি? যুক্তি কি সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়া সম্ভব? অথবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যদি যুক্তি দেখাইয়া বিভিন্ন মত সমর্থন করেন, তবে সমাজসংস্কার ও গঠনেরই বা উপায় কি?

সমন্বয়কারিগণও এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্থিরচিন্তাপ্রসূত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে ভাল হয়।

আমার বিবেচনায় এই সকল বিষয়ে মতগঠনের জন্য কতকগুলি সাধনার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ পাশ্চাত্যমতে শিক্ষিতব্যক্তিগণের কতকগুলি সক্ষম ব্যক্তির কর্ত্তব্য—পাশ্চাত্য দেশসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ, সেই সকল প্রদেশের বিভিন্ন রীতিনীতির বিশেষ করিয়া আলোচনা—আর পাশ্চাত্য জাতির সামাজিক রীতিনীতির বিকাশ ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাস অধ্যয়ন ও আলোচনা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদিগকে হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন বিকাশ প্রথমতঃ পরম্পরাগত প্রথামত পরম্পরাগত ভাবপ্রাপ্ত গুরুগণের অর্থাৎ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিবর্গের নিকট অধ্যয়ন করিতে হইবে। তৎপরে স্বাধীন যুক্তিদ্বারা হিন্দুরীতিনীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। তারপর আর একটী কার্য্য আছে। সমুদয় হিন্দুস্থান ভ্রমণ করিয়া এই সকল শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সমগ্র ভারতবর্ষে কোথায় কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এই সকল ব্যতীত তাঁহাকে চরিত্র গঠন এরূপ ভাবে করিতে হইবে, যেন তাঁহার মনে সত্যব্যতীত অন্য কোন দিকে bias অর্থাৎ ঝোঁক না থাকে। এইরূপ সাধনসম্পন্ন হইলে তবে নব্য সম্প্রদায় হিন্দুসমাজ-সম্বন্ধে একটা মতামত প্রকাশে অধিকারী হইবেন।

প্রাচীন সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে কি করিতে পারেন? তাঁহারা ত সহজেই প্রাচীন শাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন। এতদ্ব্যতীত, একটু চেষ্টা করিয়া

ভারতীয় হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশতত্ত্ব তাঁহাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। তিনি অবশ্য পাশ্চাত্যপ্রদেশে যাইতে অস্বীকৃত। কিন্তু তিনি এখানে যথাসম্ভব পাশ্চাত্যসম্প্রদায়ের সহিত মিলিতে পারেন আর পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহ আলোচনায় তাঁহার বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না। তার পর তাঁহাকেও সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিতে হইবে এবং সত্যনিষ্ঠার সাধন করিতে হইবে। এইরূপ হইলে তিনিও সমাজসম্বন্ধে মত প্রকাশে অধিকারী হইবেন।

উভয়কেই সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। অপর পক্ষকে খণ্ডন করিবার সময়—সকলেরই এইটী স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, তাঁহার প্রতিপক্ষের মতে হয়ত কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে।

এইরূপভাবে সমাজসম্বন্ধে মতগঠনের কিছু চেষ্টা হইতেছে কি?

পাগলের প্রলাপ।

দুটী পথ মানুষের সম্মুখে খোলা—একটী হচ্চে নেওয়া, আর একটী হচ্চে দেওয়া। কেউ নিতে আসে, কেউ কেবল দিতে আসে। জগতে শুধু যে এই দুই চূড়ান্ত ভাবেরই লোক আছে, তা নয়, এই দুই ভাবের অল্পাধিক মিশ্রণ, সকল মানুষেরই ভিতর। এখন তুমি কোন্ দিকে লয় দেবে? শান্তি ত এই দুই ভাবের একটীর চূড়ান্ত না হলে হবে না।

আপনার কোলে ঝোল টানিবার দিকে আমাদের বড় ঝোঁক। চেষ্টাও কচ্চেন অনেকে। শান্তি পেয়েছেন কি? অপরকে জিজ্ঞাসা না করে, নিজেকে জিজ্ঞাসা কর দেখি? অপরকে জিজ্ঞাসা করলে ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। বাহিরের চাকচিক্য দেখে গোলমাল হয়ে যেতে হয়।

সুখ তখনই, যখনই আপনাকে ভুলতে পারা যায়। এ কথা আপাততঃ রহস্যপূর্ণ বোধ হলেও সত্য—অতি সত্য। জীবনে যদি কোন সত্য থাকে ত এই একমাত্র সত্য—আত্মবিস্মৃতি। পরোপকারে, বিচারে, ভক্তিতে আত্মহারা হোতে পারা যায়। যে যাতে পার, কর। মোদ্দা—উদ্দেশ্য হচ্চে আত্মবিস্মৃতি। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র বেদ পুরাণ তন্ত্র বাইবেল আলোড়ন কর, দেখ্‌বে, এই এক লক্ষ্য সবার। যে আপনাকে ভুলতে পেরেছে, সেই সুখী, সেই দেবতা—শুধু, তাই নয়, সেই ভগবান। আপনাকে এক ক্ষুদ্রদেহে সীমাবদ্ধ বোধে যে কোন কায হয়, তাইতেই অশান্তি আর যখন কায হয় উচ্চ লক্ষ্য থেকে, আপনাকে বিশ্ব-

ব্যাপী বোধ কোরে, তখনই শান্তি। বিশ্বের সকলের সুখে আমার সুখ, সকলের দুঃখে আমার দুঃখ। এ ভাব একবার উপলব্ধি করবার ক্ষণিকও চেষ্টা কর, বুঝবে কি আনন্দ।

তুমি জগৎ থেকে এত পাবার দাবী কর কিসে? তোমার অধিকার কি আছে—জগৎ তোমাকে যা অনুগ্রহ করিয়া দেয়, তাইতেই সন্তুষ্ট হও—তুমি জগতের লোককে কিছু দেবার চেষ্টা কর। তোমায় কে ভালবাসলে না বাসলে, দেখো না, তুমি সকলকে ভালবাসবার চেষ্টা কর।

তুমি ত বল্লে, সকলকে ভালবাসবার চেষ্টা কর, তুমি বলেই খালাস। বল দেখি, কে জগতে বলে? তোমার কি কাকেও নিঃস্বার্থ বোলে বোধ হয় না, না কি? যদি এরূপ লোক নাই পেয়ে থাক, এ কথা ত বুঝতে পাচ্চ, ঐটে একটা মস্ত আদর্শ? আদর্শ অনুসারে না চোল্লে উন্নতি কোর্বে কি করে? এক যায়গায় জড় হয়ে পড়ে থাকা ত হতে পারে না? কেন পারে না? এর কি উত্তর দেবে? উন্নতিই হোল প্রাণের স্বভাব। প্রাণ সদাই চাচ্চে অগ্রসর হোতে। আচ্ছা, মান্লাম, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হওয়া, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হওয়া একটা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কিন্তু হওয়া কি সম্ভব? যদি কখনই না হোতে পারে? যতটুকু চেষ্টা করা, ততটুকুতেই আনন্দ।

আচ্ছা, কেন এরূপ হয়, বোল্তে পার? যেটাকে 'আমি' 'আমি' কোচ্চো, সেটা প্রকৃত 'আমি' নয়। গাছের একটা ডাল মনে করে আপনাকে এই যে, ডালটুকু, এইটুকুই সমগ্র গাছটা। ডাল যদি আপনার ডালত্ব ভুলে গিয়া আপনাকে গাছ বোলে ভাবে, তখনই তার জ্ঞান হয়। তাই বোল্চি, আপনাকে পৃথক্ বোধই যত জঞ্জালের মূল। 'অহংটাকে একেবারে নাশ কোরে ফেল্তে হবে।' আমি কিছু কচ্চি, এ ভাবটা একেবারে তাড়াতে হবে। প্রভু, তুমি সব কোচ্চো, এই বোলে আপনার অভিমান একেবারে দূরে ফেলে দাও, তবেই তোমার অমরত্ব লাভ হবে। তুমি বুদ্বুদ, কেন তুমি আপনাকে সমুদ্র থেকে পৃথক্ মনে কোচ্চো? একবার প্রাণভরে বল, প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক—বল একবার প্রাণ ভরে সোহহং—তখন দেখ্বে, যা কিছু কার্য্য, সবই ঈশ্বরের, সবই সেই প্রভুর।

এর 'ত' স্থানে 'ঢ' হইলে, সেই পরবর্ত্তী 'ঢ'কে নিমিত্ত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ঢকারের, 'ঢো ঢে লোপঃ' ।৮।৩।১৩। ('ঢ'কার পরে থাকিলে, ঢকারের লোপ হয়) সূত্রানুসারে লোপ হইলে, 'সহি বহোরোদবর্ণস্য' ।৬।৩।১১। ('সহ্' ধাতু এবং 'বহ্' ধাতুর 'অ'বর্ণের স্থানে, 'ও'কার হয়, 'ঢ' লোপ হইলে) এই সূত্রানুসারে, বহ্ ধাতুর লোপাবশিষ্ট 'ব'কারের 'অ'কারের স্থানে 'ও'কার হইলে, ত এই স্থলে, সন্ধ্যক্ষর 'ও'কার পাওয়া যাইবে। যাহাদের, লুঙ্ এ, 'উদবোঢম, 'উদবোঢম্' উদবোঢ প্রভৃতি ('উৎ' উপসর্গের সহিত মিলিত হইয়া) প্রয়োগ হইয়া থাকে ?

ইহাও 'ও'কারান্ত নহে। যে হেতু 'ঢো ঢে লোপঃ' সূত্র, অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের হওয়াতে ; আর 'সহিবহোরোদবর্ণস্য' এই 'ও'কারের বিধায়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের সূত্রের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ হইয়াছে। 'ঢ' সুতরাং 'ঢ'কার লোপ অসিদ্ধ বলিয়া, ইহা ('ও'কার) অন্ত্য হইবে না।

ভাষ্যমূল।—ব্যঞ্জনস্য তর্হি প্রাপ্নোতি। অভৈৎসীৎ। অচ্ছৈৎসীৎ। হলন্তলক্ষণা বৃদ্ধির্বাধিকা ভবিষ্যতি। যত্র তর্হি সা প্রতিষিধ্যতে নেটীতি। অকোষীৎ। অমোষীৎ। সিচিবৃদ্ধেরপ্যেষ প্রতিষেধঃ। লক্ষণং হি নাম ধ্বনতি ভ্রমতি মুহূর্ত্তমপি নাবতিষ্ঠতে। অথবা সিচি বৃদ্ধিঃ পরস্মৈ পদেষিতি সিচি বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি। তস্যা হলন্ত লক্ষণাবৃদ্ধির্বাধিকা। তস্যা অপি নেটীতি প্রতিষেধঃ। অস্তি পুনঃ কচিদন্যত্রাপি অপবাদে প্রতিষিদ্ধে উৎসর্গোপি ন ভবতি। অস্তীত্যাহ। সুজাতে অশ্বসূনৃতে অধ্বর্গো অদ্রিভিঃ সুতম্। শুক্রং তে অন্যদিতি। পূর্ব্বরূপে প্রতিষিদ্ধোহয়াদযোহপি ন ভবন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল স্থলে না হইলে, তবে ব্যঞ্জনের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ? যেমন,—'ভিদ্' ধাতু এবং 'ছিদ্' ধাতুর উত্তর, লুঙ্ এর 'সিচ্' এ, 'দ্'কারের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং 'অভৈৎসীৎ' 'অচ্ছৈৎসীৎ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না ?

এই স্থলে দোষ হইবে না। কারণ, 'বদব্রজ হলন্তস্যাচঃ' ৭।২।৩। (বদ ধাতু, ব্রজ ধাতু এবং হলন্তধাতুর অন্তস্থিত অচ্ এর স্থানে বৃদ্ধি হয় পরস্মৈপদী সিচ্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, হলন্ত ধাতুর অচের বৃদ্ধি হয় বলিয়া, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' এই অবিশেষ সূত্রকে, বিশেষ সূত্র বাধ করিবে। সুতরাং অচ্ এরই বৃদ্ধি হইবে। 'হল্'এর হইবে না।

তবে যে স্থলে, হলন্ত লক্ষণসম্পন্ন 'বদ ব্রজাদি' সূত্রের, 'নেটি'। ৭।২।৪।

(ইড়াদি সিচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, হলন্ত ধাতুর অচের বৃদ্ধি হয় না) এই সূত্র বাধক হইয়া থাকে, সেখানে কি হইবে? যেমন,—অকোষীৎ ('কুষ্ ধাতুর 'লুঙ্'এর 'সিচ্'এ) অমোষীৎ ('মুষ' ধাতু, 'লুঙ'এর 'সিচ্'এ) প্রভৃতি হলন্ত ধাতুর যখন 'অচ্'এর বৃদ্ধি নিষেধ করিতেছে, তখন ত পুনঃ 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রানুসারে, সাধারণভাবে হলন্তেরও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না, কারণ 'নেটি' সূত্র যে কেবল 'বদব্রজ' সূত্রেরই প্রতিষেধক তাহা নহে; কিন্তু 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' এই সাধারণ সূত্রেরও প্রতিষেধক। কারণ, প্রতিষেধ লক্ষণ-নামক সূত্র, তাহার আপনার অধিকারে অন্য কোন সূত্র না আসিতে পারে; এজন্য ধ্বনি (গর্জ্জন) করিতে থাকে, ভ্রমণ করিতে (পাহারা দিতে) থাকে, একমুহূর্ত্তও অবস্থান করে না (বসে না)।

অথবা সামান্য লক্ষণসম্পন্ন 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রানুসারে, 'সিচ্' পরে থাকিলে, সামান্যতঃ সর্ব্বত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 'বদব্রজ হলন্তস্যাচঃ' এই বিশেষ হলন্ত লক্ষণ সম্পন্ন সূত্র, তাহার সেই বৃদ্ধির দিকে বাধক হইবে। এবং এই হলন্ত লক্ষণসম্পন্ন বিশেষ সূত্রকেও তদপেক্ষা বিশেষ লক্ষণ সম্পন্ন 'নেটি' সূত্র, বাধ করিবে।

ইহা ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে, এইরূপ দৃষ্টান্ত আছে কি যে, অপবাদ (বিশেষ সূত্র)কে বাধ করিলে, উৎসর্গ (সামান্য সূত্র) ও প্রবর্ত্তিত হয় না।

আমরা বলিব যে,—আছে। যেমন, সামবেদে এরূপ মন্ত্র আছে যে, "সুজাতে অশ্বসূনৃতে অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতম্,' শুক্রং তে অন্যৎ" ইত্যাদি স্থলে, 'এ'কারের পরে এবং 'ও'কারের পরে, 'অ'কার থাকিলে, এঙঃ পদান্তাদতি। ৬।১।১০৯। (পদান্তস্থিত 'এঙ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরে, 'অ'কার থাকিলে, পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হয়) এই সূত্রকে বাধ করিয়া, 'সুজাতে অশ্বসূনৃতে' এইরূপ প্রকৃতিভাব হইলে, উৎসর্গ সূত্র 'এচোঽয়বায়াবঃ'। ৬।১।৭৮। (এচ্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের পরে অচ্ থাকিলে, যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্, আব্, হইয়া থাকে) সূত্রানুসারে, অয়াদি আর প্রাপ্তি হয় নাই।

ভাষ্যমূল।—উত্তরার্থমেব তর্হি সিজ্গ্রহণং বৃদ্ধিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। সিচিবৃদ্ধিরবিশেষেণোচ্যতে। মা ভূৎ। ন্যনুবীৎ। ন্যধুবীৎ। নৈতদস্তি-প্রয়োজনম্। অন্তরঙ্গত্বাদত্রোবঙাদেশে কৃতেঽনন্ত্যত্বাদ্ বৃদ্ধির্ন ভবিষ্যতি।

যদি তর্হি সিচ্যন্তরঙ্গং ভবতি। অকার্ষীৎ। অহার্ষীৎ। গুণে কৃতে চানন্ত্যত্বাদ্বৃদ্ধির্ন প্রাপ্নোতি।

মাভূদেবং হলন্তস্যেতোবং ভবিষ্যতি। ইহতহিন্যস্তোরীৎ। অদারীৎ। গুণেকৃতেহবাদেশে চানন্ত্যত্বান্ বৃদ্ধির্ন প্রাপ্নোতি। হলন্ত লক্ষণায়াশ্চ নেটীতি প্রতিষেধঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্র, অবিশেষব রূপে (সামান্যতঃ) উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই বৃদ্ধি 'ক,' 'গ,' কিংবা 'ঙ' ইৎ হইলে না হয়, এইজন্য 'ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'বৃদ্ধি' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা, অনুবীৎ (নি—ণু ধাতুর লুঙ্ এর সিচ্), অধুবীৎ (নি—নূঞ্ ধাতু) ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। কারণ, এই স্থলে বৃদ্ধি হইলে, উকারের বৃদ্ধিতে ঔকার হইত।

এই স্থানের জন্য 'বৃদ্ধি' গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কারণ, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রে, বৃদ্ধি করিবার জন্য নিমিত্ত অনেক থাকাতে, আর 'অচিশ্নুধাতু ভ্রুবাং য্বোরিয়ঙুবঙৌ'। ৬।৪।৭৭। (শ্নু প্রত্যয় অন্তে আছে যার, ইবর্ণ বা উবর্ণ অন্তে আছে যার এমন ধাতুর; আর 'ভ্রূ' শব্দের অন্তের, 'ইয়ঙ্' এবং 'উবঙ্' আদেশ হয়, 'অচ্' আদি বিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে) এই সূত্রে, 'উবঙ্' আদেশ করিবার জন্য, নিমিত্ত কম হইয়াছে, সুতরাং অন্তরঙ্গও হইয়াছে। অতএব অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ শাস্ত্র অসিদ্ধ হয় বলিয়া, পূর্ব্বে 'উবঙ্' আদেশ হইলে, 'উ' কারান্ত ধাতু আর অন্তে না থাকাতে, স্বতঃই বৃদ্ধি হইবে না।

যদি বল যে, 'সিচ্' বিধিতেও অন্তরঙ্গ কার্য্য হয়; তবে 'অকার্ষীৎ' 'অহার্ষীৎ' ইত্যাদি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কারণ, 'সিচিবৃদ্ধিঃ পরস্মৈপদেষু' সূত্রাপেক্ষা, 'সার্ব্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ'। ৭।৩।৮৪। (১) সূত্র অন্তরঙ্গ বলিয়া, এই সূত্রানুসারে 'কৃ' ধাতু ও 'হৃ' ধাতুর 'ঋ' কারের গুণ করিলে (অকর্, অহর্) 'র' পরবিশিষ্ট শব্দ হইবে। তখন 'ঋ' অন্তে না থাকাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। এইরূপ ('সিচিবৃদ্ধিঃ' সূত্রানুসারে) নাইবা হইল; পূর্ব্বোল্লিখিত 'বদব্রজ হলন্তস্যাচঃ' সূত্রানুসারে, 'হল্' (রেফ) অন্তবিশিষ্ট ধাতুরই বৃদ্ধি হইবে? তাহা হইলেই 'অকার্ষীৎ' 'অহার্ষীৎ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে?

তবে 'অস্তারীৎ' 'অদারীৎ' এই সকল স্থলে দোষ হইবে। কারণ, 'স্তৃঞ্' ধাতু এবং 'দৃ' ধাতুর 'ঋ' কারের গুণ করিলে, 'র' পর বিশিষ্ট হইবে, সুতরাং 'ঋ' অন্তবিশিষ্ট না হওয়াতে, বৃদ্ধিও ('সিচিবৃদ্ধিঃ' সূত্রানুসারে,) প্রাপ্তি

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

হইবে না? ('বদব্রজ' সূত্রানুসারে) হলন্তলক্ষণসম্পন্ন ('র'পর বিশিষ্ট 'স্তর্' 'দর্') হওয়াতেও বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। কারণ, তাহাকেও আবার 'নেটি' সূত্র, নিষেধ করিবে। অতএব 'বৃদ্ধি' সর্ব্বতোভাবে নিষেধ হওয়াতে, 'অস্তারীৎ' 'অদারীৎ' ইত্যাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। (১)

এইরূপ ঋকারান্তও 'বৃঙ্' এবং 'বৃঞ্' ধাতুই কেবল অনিট্, আর যাবতীয় ঋকারান্ত ধাতু সেট্, অতএব, 'স্তৄ' এবং 'দৄ' ধাতুও ইডাদি হইয়াছে বলিয়া, 'অস্তারীৎ' 'অদারীৎ' প্রভৃতি স্থলে, দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—মাভূদেবম্। ল্যান্তস্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি অলাবীৎ। অপাবীৎ। গুণেকৃতেঽবাদেশে চানন্ত্যত্বাদ্ বৃদ্ধির্ন প্রাপ্নোতি। হলন্তলক্ষণায়াশ্চ নেটীতি প্রতিষেধঃ। মাভূদেবম্। ল্যান্তস্যেত্যেবং ভবিষ্যতি। লান্তস্যেত্যুচ্যতে। নচেদং ল্যান্তম্। ল্যান্তেত্যত্র বকারোঽপি নির্দিশ্যতে। কিং বকারো ন শ্রূয়তে। লুপ্তনির্দিষ্টো বকারঃ। যদ্যেবং মা ভবানবীৎ। মাভবান্ মবীৎ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি

অবিময়োর্নেতি বক্ষ্যামি। তদ্বক্তব্যম্। ন বক্তব্যম্। নিদ্ধিভ্যাং চৌ নিপাতয়িষ্যৌ। যদ্যপ্যেতদুচ্যতে। অথবৈতর্হি নিত্যোঃ প্রতিষেধো ন বক্তব্যো ভবতি। গুণেকৃতেঽবাদেশে চ যান্তানাং নেত্যেব প্রতিষেধো ভবিষ্যতি। এবং তর্হ্যাচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ন সিচ্যন্তরঙ্গং ভবতীতি। যদয়মতো হলাদের্লঘোরিত্যকারগ্রহণং করোতি।

কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। অকারগ্রহণস্যৈতৎপ্রয়োজনম্। ইহ মাভূৎ। অকোষীৎ। অমোষীৎ। যদি সিচ্যন্তরঙ্গং স্যাৎ। অকারগ্রহণমনর্থকং স্যাৎ। গুণেকৃতে হলন্তত্বাদ্ বৃদ্ধির্ন ভবিষ্যতি। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো ন সিচ্যন্তরঙ্গং ভবতীতি ততোঽকার গ্রহণং করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'স্তৄ' এবং 'দৄ' ধাতুর, 'ঋ'কারের গুণ হইয়া 'র'পর বিশিষ্ট ধাতু হইলে, এই পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রয়োগ সিদ্ধি নাইবা হইল; অতো ল্যান্তস্য।৭।২।২। (হ্রস্ব অকারের সমীপবর্ত্তী 'ল'কার এবং 'রেফ্', সেই 'রেফ্' 'লকার' অন্তে আছে যার তদঙ্গের 'অ'কারের বৃদ্ধি হয়, পরস্মৈপদী সিচ্ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, 'ল'কার রেফান্তের 'অ'কারের বৃদ্ধি হয়

(১) ত্বিষ্, তুষ্, দ্বিষ্, দুষ্, পুষ্য, পিষ্, বিষ্, শিষ্, শুষ্, শ্লিষ্যতয়ো, ঘসিঃ। (কৃষি) ষকারান্ত ধাতুর মধ্যে, ইহারাই 'অনিট্'। এতদ্ভিন্ন যাবতীয় 'ষ'কারান্ত ধাতু 'ইট্'।

বলিয়া, 'স্তৃ' ও 'দৃ' ধাতুর 'ঋ'কারের গুণ হইয়া রেফান্ত হইলেও, বৃদ্ধি হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

যদি এইরূপই হয়; তবে 'অলাবীৎ' ('লুঞ্' ধাতু লুঙ্এর সিচ্এ), 'অযাবীৎ' (যু ধাতুর ঐরূপ) এই সকল স্থলে কি হইবে? কারণ 'লূ' এবং 'যু' ধাতুর গুণ করিলে অব্ আদেশ হইলে, 'উ'কার, অন্তে না হওয়াতে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না। 'বদব্রজ' সূত্রানুসারে হলন্ত লক্ষণের বৃদ্ধি করিতে গেলেও 'নেটি' সূত্রানুসারে প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

এই প্রকারে নাইবা হইল, 'অতোল্রান্তস্য' সূত্রানুসারেই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

লান্তস্য (রেফ্ লকারান্তের) বলিয়া সিদ্ধ বলিবে? ইহা ত 'ল'কারান্তও নয় রেফান্তও নয়?

ল্রান্ত এই স্থলে 'ব' কার ও নির্দেশ করা হইয়াছে।

'ব'কার শুনা যাইতেছে না কেন?

লোপ নির্দ্দিষ্ট বকার জানিতে হইবে; অর্থাৎ 'ব্ল্রান্তস্য' এইরূপ 'ব'কারাদি বিশিষ্ট সূত্র করা হইবে; কিন্তু 'লোপোব্যোর্বলি'। ৬।১।৬৬। ('ব'কার এবং 'য'কারের লোপ হয়, 'বল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে) সূত্রানুসারে, 'ব'কারের লোপ জানিতে হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে যে স্থলে 'অব' এবং 'মব' ধাতুর স্থলে, 'মাভবান্ অবীৎ, মাভবান্ 'মবীৎ' (১) প্রয়োগ হইয়াছে; সেই স্থলেও 'ব'কারান্ত ধাতুর 'অ'কারের বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইবে?

তাহা হইবে না। কারণ 'অব' ধাতু এবং মব' ধাতুর 'ব'কার পরে থাকিলে, 'অ'কারে বৃদ্ধি হয় না, এইরূপ বলিব।

তাহা হইলে, তাহাও ত বলিতে হইবে?

তাহা বলিতে হইলেও অতিরিক্ত কিছু বলা হইবে না। কারণ, 'নি' এবং 'শ্বি' দ্বারা তাহা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ 'হ্ম্যন্তক্ষণশ্বসজাগৃণিশ্ব্যেদিতাম্ ।৭।২।৫। (হ ম এবং যকারান্তের, ক্ষণাদি ন্যন্তের, শ্বি ধাতুরই দিতের, বৃদ্ধি হয় না, ইত্যাদি 'সিচ্' পরে থাকিলে) এই সূত্রের, নি, শ্বি পরিত্যাগ করিব, তৎপরিবর্ত্তে 'অব', 'মব' ধাতুর গ্রহণ করিব, তাহা হইলেই গৌরবও

(১) 'অব ধাতু' এবং 'মব' ধাতুর স্থানে, অবীৎ, এবং মবীৎ প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

হইবে না ; অথচ প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে। আর যদি এইরূপ বলা যায়, তবে 'হ্ম্যন্ত * * *' সূত্রে, 'নি' এবং 'শ্বি'র প্রতিষেধও বলিতে হইবে না। কারণ 'ণি' এবং 'শ্বি'র গুণ একার করিলে, 'এ'কার স্থানে 'অয়্' আদেশ হইলে, সূত্রে, হকার, মকার এবং যকারান্তের বৃদ্ধি নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া, 'অয়্' আদেশও 'য'কারান্ত হওয়াতে, বৃদ্ধির প্রতিষেধ প্রাপ্তি হইবে।

এইরূপ করিলে তবে, আচার্য্যের (পাণিনির) প্রবৃত্তি (সূত্রারম্ভের অভিপ্রায়)ই জ্ঞাপন করিবে যে, 'সিচ্' পরে থাকিলে, অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না। যেহেতু 'অতোহলাদের্লঘোঃ।৭।২।৭। ('হল্' আদিতে আছে এমন যে 'ধাতু', তাহার যে 'লঘু' অকার, তাহার বৃদ্ধি হয় বিকল্পে, 'ইট্' আদিবিশিষ্ট পরস্মৈপদী 'সিচ্'পরে থাকিলে) এই সূত্রে, 'অ'কারের গ্রহণ করিয়াছেন।

কেমন করিয়া (অকারগ্রহণ) জ্ঞাপক হইল ?

'অ'কার গ্রহণের ইহাই প্রয়োজন যে, 'অকোষীৎ' ('কুষ'ধাতু) অমোষীৎ ('মুষ' ধাতু) এই সকল স্থলে, 'উ'কার লঘু হইলেও 'অ'কার না হওয়াতে, 'বৃদ্ধি' না হয়। যদি 'সিচ্' বিষয়ে ও অন্তরঙ্গ কার্য্য হয়, তবে 'অ'কারের গ্রহণই অনাবশ্যক হয়। কারণ, ('সার্বধাতুকার্ধকয়োঃ সূত্রানুসারে) গুণ করিলে, অর্থাৎ 'কোষ' 'মোষ' হইলে, লঘুত্বাভাবপ্রযুক্ত 'বৃদ্ধি' হইবে না। অতএব আচার্য্য ইহা দেখিয়াছেন যে, 'সিচ্' কার্য্যে, অন্তরঙ্গ হয় না ; সেই হেতুই 'অ'কার গ্রহণ (সূত্রে) করিয়াছেন।

ভাষ্যমূল।—নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্ত্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। যত্র গুণঃ প্রতিষিধ্যতে তদর্থমেতৎ স্যাৎ। ন্যকুটীৎ। ন্যপুটীৎ। যত্তর্হি শিশ্ব্যোঃ প্রতিষেধং শাস্তি তেন নেহান্তরঙ্গমস্তীতি দর্শয়তি। যচ্চ করোত্যকারগ্রহণং লঘোরিতি কৃতেহপি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা ("অতো হলাদের্লঘোঃ" সূত্রে, 'অ'কার গ্রহণ) কথনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কারণ, বচনে (সূত্রে), ইহার ('অকার-গ্রহণের) অন্য প্রয়োজন আছে।

কি সেই প্রয়োজন ?

যেই স্থলে গুণের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, সেই স্থানের জন্য ইহা ('অ'কার-গ্রহণ) করা হইয়াছে। যেমন,—'কুট'ধাতুর গুণনিষেধ (১) হওয়াতে, 'ন্যকুটীৎ' এবং 'পুট' ধাতুর গুণ নিষেধ হওয়াতে, 'ন্যপুটীৎ' (২) প্রযোগ

(১) (২) গাঙ্কুটাদিভ্যো ঞ্ণিন্ ঙিৎ।১।২।১ (গাঙ্ আদের

সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব যেহেতু ণি এবং শ্বিতে বৃদ্ধির প্রতিষেধ করিয়াছেন, সেই হেতুই আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, এই স্থলে ('সিচ্'এতে) অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না। আর যেহেতু, 'অতোহলাদের্লঘোঃ' সূত্রে, 'লঘু' গ্রহণ সত্ত্বেও 'অ'কার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে ও আচার্য্য দেখাইয়াছেন যে 'সিচ্' বিষয়ে, অন্তরঙ্গ কার্য্য হয় না।

বার্ত্তিকমূল।—তস্মাদিগ্‌লক্ষণা বৃদ্ধিঃ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সেই হেতুই 'ইক্' লক্ষণসম্পন্নের বৃদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূল।—তস্মাদিগ্‌লক্ষণাবৃদ্ধিরাস্থেয়া।

ভাষ্যানুবাদ। সেই হেতুই, যাহাতে 'ইক্' লক্ষণসম্পন্ন বর্ণের বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য 'বৃদ্ধি' শব্দ ('ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে) গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বার্ত্তিকমূলম্।—ষষ্ঠ্যাঃ স্থানে যোগত্বাদিগ্‌নিবৃত্তিঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত স্থানের যোগ রহিয়াছে বলিয়া, যাবতীয় 'ইক্'এর নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।*

ভাষ্যমূল।—ষষ্ঠ্যাঃ স্থানে যোগত্বাৎ সর্ব্বেষামিকাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। দধি। মধু। পুনর্বচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রে, 'ইকঃ' শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা'।১।১ ৪৯ (যে ষষ্ঠী দ্বারা, কোন সম্বন্ধ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার স্থানে হয়, এরূপ জানিতে হইবে) এই সূত্রানুসারে 'ইকঃ' এই ষষ্ঠী দ্বারা যাবতীয় 'ইক্'এরই স্থানে, 'গুণ' বা বৃদ্ধি' হইতে থাকিবে। অতএব 'ইক্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, কুত্রাপি দেখা যাইবে না। সুতরাং 'দধি' শব্দের 'ই'কার এবং 'মধু' শব্দের 'উ'কারও নিবৃত্তি হইয়া 'এ'কার এবং 'ও'কার (দধে, মধো) প্রাপ্ত হইবে।

যদি তাহাই হয় তবে পুনরায় বচন ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রে, গুণবিধান প্রভৃতি) কি জন্য?

বার্ত্তিকমূল —অন্যতরার্থং পুনর্বচনম্।*।

হইয়াছে এমন যে ধাতু তাহার, এবং কুটাদিগণ পঠিত ধাতুর, ঞ ইৎ এবং ণ ইৎ ভিন্ন প্রত্যয় পরে থাকিলে, ঙিৎ সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে, কুটাদি-গণপঠিত কুট এবং পুট ধাতুর ঙিৎ সংজ্ঞা হইয়াছে। অতএব 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারে, গুণের নিষেধ হইবে।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অন্যতর অর্থাৎ গুণ বা বৃদ্ধির মধ্যে কোনও একটী হওয়া জন্য পুনর্ব্বচন। *।

ভাষ্যমূল।—অন্যতরার্থমেতৎ স্যাৎ। সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োর্গুণ এবেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা ('ইকোগুণবৃদ্ধী' সূত্রানুসারে গুণ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তি সত্ত্বেও, গুণ বা বৃদ্ধি বিধায়ক সূত্রে), গুণ বা বৃদ্ধিরূপ দুই কার্য্য একত্র না হইয়া, ইহার কোনও একটী কার্য্য হওয়ার জন্য করা হইয়াছে। যেমন,—'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রে, ইগন্তাঙ্গের গুণ বিধান করা হইয়াছে; অতএব এই স্থলে, যাহাতে গুণই প্রাপ্তি হয়, কিন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্তি না হয়, এই জন্য, বচনের (সূত্রের) প্রয়োজন।

বার্ত্তিকমূল।—প্রসারণে চ। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—সংপ্রসারণেও যাবতীয় 'যণ্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণের নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে? *

ভাষ্যমূল।—প্রসারণে চ সর্বেষাং যণাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অস্যাপি প্রাপ্নোতি। যাতা। বাতা।

পুনর্বচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—'সংপ্রসারণ' কার্য্যেও সকল 'যণ্'এর নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে। অতএব 'যা' ধাতুর এবং 'বা' ধাতুর স্থানে য'কার বা 'ব'কারের সংপ্রসারণ হইয়া, 'ই'কার বা 'উ'কার প্রাপ্তি হইবে; সুতরাং 'যাতা,' 'বাতা' এইরূপ প্রয়োগেরও নিবৃত্তি প্রাপ্তি হইবে।

যদি তাহাই হয়; তবে এক্ষণে পুনরায় বচন (সূত্র) করিবার প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূল।—বিষয়ার্থং পুনর্বচনম্। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রাপ্য বিষয় নির্ব্বাহের জন্য পুনরায় বচন (সূত্র) করা কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূল।—বিষয়ার্থমেতৎ স্যাৎ। বচিস্বপিযজাদীনাং কিত্যেবেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যে স্থলে সংপ্রসারণের বিষয় প্রাপ্তি হওয়া উচিত, সেই স্থলেই যাহাতে সংপ্রসারণ হয়, সেইজন্য বচন (সূত্র) করা কর্ত্তব্য। যেমন;—'বচিস্বপিযজাদীনাং কিতি' ।৬।১।১৫। ('বচ্' ধাতু, 'স্বপ্' ধাতু এবং যজাদিধাতুর সংপ্রসারণ হয়, কিৎ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে, কেবল 'ক'কার ইৎ পরে থাকিলেই, যাহাতে সূত্রোক্ত ধাতু সমূহের সংপ্রসারণ হয়, অন্যত্র না হয়, এই জন্য বচন করা কর্ত্তব্য।

সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সংক্ষেপ

(রামকৃষ্ণ মিশন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮, রবিবার।)

পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, আজ তাহার সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিব। কারণ, তাহা হইলে সেই সকল বিষয় মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইবে। প্রথমে আমরা দেখিয়াছি, বেদ কাহাকে বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান; ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, যাহা তাঁহার সহিত অনন্তকাল অবস্থিত রহিয়াছে। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, বেদ অনাদি। যদিও আমরা উহা পুস্তকাকারে লিখিত দেখিতে পাই, কিন্তু এই পুস্তকের বিষয় তিন কালেই বর্ত্তমান, তাহার আদি নাই। এই অনাদিজ্ঞান কখন কোন ভাগ্যবানের নিকট আবির্ভূত হন। যাহারা এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বলে। ঋষি অর্থে মন্ত্রদ্রষ্টা। এই জ্ঞান কেবল যে এক জাতীয় লোকের নিকটেই আবির্ভূত হন, তাহা নহে। বেদে অনেক স্ত্রীলোক ঋষি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সত্যকামাদি জারজ ব্যক্তিও ঐ জ্ঞানপ্রভাবে ঋষি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই জ্ঞান সকলেরই নিকট জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে উপস্থিত হইতে পারে। পূর্ব্বে বৈদিক কালে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইহা গুণগত ছিল। বেদের অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পূর্ব্বে একবর্ণ ছিল, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ কথা আছে যে, পূর্ব্বে কেবল ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল, পরে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইল। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বেদের প্রাচীন অংশ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যগণ কেবল পঞ্চনদের গুণ গান করিতেছেন এবং আপনাদের পূর্ব্ব বাসস্থান অত্যন্ত শীতল দেশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহারা নূতন দেশে আসিয়া আদিমনিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন এবং স্বভাবতঃ ধর্ম্ম অনুসারে সকলে, ক্ষত্রিয় বর্ণ, ব্রাহ্মণ বর্ণ, এক জাতিই ছিলেন; পরে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত ও অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। প্রথমে এই ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব কতকগুলি গুণের সমষ্টি মাত্র হওয়াই সম্ভবে। অথবা স্বভাবপ্রেরিত গুণ যুদ্ধ বিগ্রহ, যজ্ঞোপাসনাদি কর্ম্মানুসারেই হওয়া সম্ভব। গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি চিরকালই জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে। কিন্তু জাতিগত ব্রাহ্মণত্ব মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতির সহিত ক্রমশঃ তিরোধান হইবে। এই ব্রাহ্মণত্ব

ক্ষত্রিয়ত্ব গুণ আবার ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জাতি ব্রাহ্মণত্বগুণসম্পন্ন, যেমন প্রাচীন আর্য্যগণ ছিলেন, এবং ভারতে এখনো সত্বগুণবিশিষ্ট যথার্থ ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন সাত্বিক ভাবাপন্ন দুই চারিটী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দেশে ইহা আরো বিরল। এইরূপ আধুনিক ইউরোপীয় জাতিরা ক্ষত্রিয়গুণসম্পন্ন। ইংরাজ জাতিতে বৈশ্য গুণের অধিক সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন সময়ে কোন এক গুণ অধিক প্রবল দেখা যায়। বর্ত্তমান কাল বৈশ্য গুণ-প্রধান। বৈশ্যগুণহীন লোকের একালে অধোগতি প্রাপ্তি হইতেছে। যাহা-দের ঐ গুণ প্রবল, তাহারাই উন্নত হইতেছে। মহাভারতেও আমরা এই কথা দেখিতে পাই। পূর্ব্বে এক জাতি ছিল, পরে গুণ কর্ম্ম ভেদে জাতি-ভেদ হইয়াছে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগদ্বারা আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সদ্গুণসম্পন্ন হইলেই বেদে অধি-কার হইত ও এখনও হওয়া উচিত। আমরা দেখিয়াছি, বেদ দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হওয়ার কথা কথিত আছে। স্বর্গ অর্থে পৃথিবী অপেক্ষা কোন উচ্চতর লোক, যেখানে অধিককালস্থায়ী সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সুখ ভোগের পর আবার মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবতা সকল ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, প্রভৃতি একটী একটী পদমাত্র। যে কেহ কর্ম্মদ্বারা উচ্চগতি প্রাপ্ত হইযাছেন, তিনি ইন্দ্র হইযাছেন ও সেই পদে কিছু দিন অবস্থান করিয়া আবার তাঁহার পতন হইয়াছে। মনুষ্য মাত্রেই কর্ম্মদ্বারা এই পদলাভ করিতে পারেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ড স্বর্গাদি লোক লাভের উপায় বলিয়া দেয়। কিন্তু ঐ সকল সুখও নিত্য নয়। সেই জন্য মনুষ্য তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাহার প্রাণ নিত্যবস্তুলাভের জন্য লালায়িত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সেই নিত্য পদার্থের বিষয়ই বর্ণিত আছে। আমরা দেখিয়াছি, শাস্ত্রে সৃষ্টি অনাদি বলিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মে সৃষ্টির আদি আছে, এরূপ কথা বলে। বলে, এমন এক সময় ছিল, যখন সৃষ্টি আদৌ ছিলনা। ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু বেদ তাহা বলেন না। সৃষ্টির আদি আছে বলিলে ভগবানে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ আসিয়া পড়ে। জগতের এই যে বিষমতা দেখিতেছি, কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী ইত্যাদি, সৃষ্টির আদি থাকিলে ঈশ্বর তাহার কারণ হন। সুতরাং

পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। এবং ২য়তঃ তিনি নিষ্ঠুর হন। কিন্তু সৃষ্টি অনাদি। হইলেও সৃষ্টির বিকাশাবস্থা অনাদি নহে। কখন প্রকাশিত কখন লুপ্তাবস্থায় বীজ ও বৃক্ষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া সৃষ্টি অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত রহিয়াছে। যেমন ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, আবার সেই বৃক্ষ কালে বীজে পরিণত হয়, সেইরূপ সৃষ্ট জগৎ কখন বীজরূপ ও কখন প্রকাশরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা ভগবান হইতে নির্গত, ভগবানেরই অংশ, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। ভগবান বলিতেছেন, জগৎ আমার এক অংশ মাত্র। যদি সৃষ্টি অনাদি হইল, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি? শাস্ত্র বলেন; এই বৈষম্যের কারণ কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্মও অনাদি। আমাদের সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইতেছে। কর্ম্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। কর্ম্মের সহিত তাহার ফল নিত্যসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে; তবে মুক্তি কিরূপে সম্ভবে? নিষ্কাম ভাবে নিঃস্বার্থ হইয়া কায করিলে কর্ম্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা সমগ্র বন্ধন নাশ করিয়া দেয়। ইহাকেই কর্ম্মযোগ কহে। এক কথায় বলিতে গেলে স্বার্থশূন্য হওয়াই ধর্ম্ম। কি কর্ম্মযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি জ্ঞানযোগী, সকলেই নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহ আমি আমি করিয়া কেহ বা তুমি তুমি করিয়া পূর্ণ নিঃস্বার্থভাব দিকে অগ্রসর হইতেছে। সকলেই ছোট স্বার্থপর 'আমি' জ্ঞান, ভূমা মহান্ আমিতে ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছে। কেহবা সর্ব্বভূতে সেই এক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই মহান্ আমিকে সকলের ভিতর দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। অপর কেহ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানকেই সর্ব্বত্র দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। বুঝিয়া দেখিলে দুই পথের উদ্দেশ্যই এক, কেবল নামের ভিন্নতা মাত্র প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, কর্ম্মে কোন দোষ নাই। কর্ম্মের ভাল মন্দ গুণ আমাদের নিজের ভাব লইয়া হইয়া থাকে। আমরা যখন যে ভাবে কার্য্য করি, আমাদের কার্য্য সেই ভাবে ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। একটী কার্য্য আশ্রয় না করিয়া অন্য একটী কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারি না। নীচকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমে নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। যে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, সে বিবাহ করিলে তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত স্বার্থত্যাগই হইবে কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবাহ তদ্বিপরীত স্বার্থপরতা বৃদ্ধিরই পরিচায়ক হইবে। একের পক্ষে যাহা

নিঃস্বার্থ কর্ম্ম, অপরের পক্ষে তাহাই আবার স্বার্থপর কর্ম্ম। যে যেমন অবস্থায় অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে যাহা ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধকতা করে, তাহাই তাহার সম্বন্ধে সংসার। তাহার সেই সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। কাহার কাম কাহার ক্রোধ কাহার ধন ঈশ্বর পথের কণ্টক; তাহাকে তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু পরিত্যাগ করিতে হইলে পূর্ব্বে আর এক উচ্চতর বিষয় অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উঠিতে হইবে, নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, পরে এমন অবস্থা উপস্থিত হইবে, যখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করিতে পারিবে। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যেরূপ কার্য্য, পর পর জন্মে সেইরূপ দেহাদি প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা মনুষ্য এরূপ পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, যাঁহারা তাহাকে ঐরূপ দোষ বা গুণযুক্ত দেহাদি প্রদান করিতে পারেন। আপাততঃ দেখিলে সন্তানে দোষ গুণ অনুক্রামিত হওয়ার কারণ পিতামাতাই বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক সন্তানের কর্ম্মই ঐরূপ পিতামাতা অন্বেষণ করিয়া লয়। এই কর্ম্ম করিবার শক্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? আমরা দেখিয়াছি, এই দৃষ্ট স্থূল ব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট দেহ। আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র দেহ সেই বিরাটেরই অংশ মাত্র। সেইরূপ আমাদের মনসমূহও সেই বিরাট মনের অংশ মাত্র। আমাদের শরীর ও মনের পুষ্টি সেই বিরাট শরীর ও মন হইতেই নিত্য হইতেছে। আহার ও নিশ্বাসের দ্বারা শরীরে যাহা গ্রহণ করি, তাহা সেই অনন্ত বিরাটেরই অংশ। আমরা না জানিলেও আমাদের মনের পুষ্টিও সেইরূপ বিরাট মন হইতেই হইয়া থাকে। নূতন জল যেমন আবর্ত্তে আসিতেছে ও যাইতেছে কিন্তু আবর্ত্ত একইরূপ দেখিতেছি, সেইরূপ দেহ ও মন একই রূপ দেখিতে থাকিলেও সেই বিরাট দেহ ও মন হইতে তাহাদের উপাদান আমরা অবিরত গ্রহণ করিতেছি। ভগবানের অনন্ত শক্তি সকলেরই অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহা হইতেই আমরা নিজ নিজ শক্তি গ্রহণ ও বিকাশ করিতেছি। এই শক্তির অপব্যয় না করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলেই জীবনের মহান্ লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব।

মন্ত্রযোগ।

(শ্রীযুক্ত নারায়ণ ব্রহ্মচারী)

সর্ব্বজীবহিতকারী এবং অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পূর্ণ সনাতন ধর্ম্মে যত প্রকার ঈশ্বরোপাসনাসম্বন্ধীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিকারী সাধন নিয়ম প্রচলিত আছে, আচার্য্যগণ সে সকলকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছেন যথা—

মন্ত্রযোগো লয়শ্চৈব রাজযোগো হঠস্তথা।
যোগশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তঃ যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

তত্ত্বদর্শী যোগিগণ যোগধ্যানের ক্রিয়াসিদ্ধাংশকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ।

উপস্থিত এই প্রবন্ধে প্রথম অধিকাররূপ মন্ত্রযোগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এবং সাধন নিয়মাদি বর্ণন করা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজের মধ্যে মন্ত্রযোগের সাধননিয়মসমূহের অধিক চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, আমরা প্রথমে এই পরমাবশ্যকীয় মন্ত্রযোগের লক্ষণাদি দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি—

কার্য্যং যত্র বিভাব্যতে কিমপি তৎস্পন্দনং সব্যাপকম্
স্পন্দশ্চাপি তথা জগৎসুবিদিতঃ শব্দাবয়ী সর্ব্বদা।
সৃষ্টিশ্চৈব তস্মাদিয়ম্ কৃতিবিশেষত্বাদভূৎ স্পন্দিনী—
শব্দশ্চোদভবত্তদা প্রণব ইত্যোঙ্কাররূপঃ শিবঃ॥

যে স্থলে কোন কার্য্য হয়, তাহা সর্ব্বদাই স্পন্দ (কম্পন) যুক্ত হইয়া থাকে এবং স্পন্দমাত্রই শব্দযুক্ত, ইহা জগতে বিদিত আছে। আদি সৃষ্টি কার্য্যবিশেষ বলিয়া স্পন্দবিশিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই সময় যে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম মঙ্গলাত্মক প্রণব অথবা ওঁকার।

সাম্যস্থপ্রকৃতের্যথৈব বিদিতঃ শব্দো মহানোমিতি
ব্রহ্মাদিক্রিয়াত্মকস্য পরমং রূপং শিবং ব্রহ্মণঃ।
বৈষম্যে প্রকৃতেস্তথৈব বহুধা শব্দাঃ শ্রুতাঃ কালতঃ
তে মন্ত্রাঃ সমুপাসনার্থম্ অভবন্ বীজানি নাম্না তথা॥

প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় শব্দ যে রূপ ব্রহ্মাদি ত্রিবেদাত্মক এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ ওঁকার উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্রূপ উক্ত প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থায়

কালক্রমে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। উক্ত শব্দ সকল উপাসনার উপযোগীমাত্র হইয়াছে এবং নামতঃ উহাদিগকে বীজমন্ত্র কহে।

জগতি ভবতি সৃষ্টিঃ পঞ্চভূতাত্মিকা যৎ
তদিহ নিখিলসৃষ্টিঃ পঞ্চভাগৈর্বিভক্তা।
শ্রুতিরপি বিধিরূপেণাদিনস্তীহ পঞ্চ
বিবিধবিহিতপূজারীতিভেদান্ জনানাম্॥

জগতের সমস্ত সৃষ্টি পঞ্চভূতাত্মিকা বলিয়া সমুদায় সৃষ্টিকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই হেতু শ্রুতিও লোকদিগের মঙ্গলার্থ পঞ্চবিধ বৈধ পূজার বিধান করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছে। এজন্য সৌর, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর এবং গাণপত্য এই পঞ্চপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বর্ণন সমূহ পাঠ করিলে, পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, পূজ্যপাদ ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ কিরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া এই সর্ব্বজীবহিতকারী মন্ত্রযোগের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাউক, পঞ্চতত্ত্বসম্বন্ধীয় পঞ্চ উপাসনার সহিত পঞ্চপ্রকার সাধকের কিরূপ অধিকার নির্ণীত আছে। এই সম্বন্ধে কাপিল-তন্ত্ররাজে বর্ণিত আছে যে,—

নভসোঽধিপতির্বিষ্ণুরগ্নেশ্চৈব মহেশ্বরী।
বায়োঃ সূর্য্যঃ ক্ষিতেরীশো জীবনস্য গণাধিপঃ॥

বিষ্ণু আকাশের, মহেশ্বরী অগ্নির, সূর্য্য বায়ুর, মহেশ্বর ক্ষিতির এবং গণাধিপ জলের অধিপতি, এইরূপ তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সাধকের প্রকৃতি আকাশতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে বিষ্ণু উপাসনা, যাহার অগ্নিতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে শক্তি উপাসনা, যাহার পৃথিবীতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে শিব উপাসনা, যাহার বায়ুতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে সূর্য্য উপাসনা এবং যাহার প্রকৃতি জলতত্ত্বপ্রধান, তাহাকে গণেশ উপাসনার উপদেশ দেওয়া তন্ত্রশাস্ত্রের অনুমোদিত। উপাসনার এই পঞ্চবিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগের বিস্তৃত অন্তর্বিভাগ থাকা নিবন্ধন, প্রত্যেক দেবতার নানারূপ মূর্ত্তি প্রচলিত আছে। যথা, শাক্তগণের মধ্যে দশমহাবিদ্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে; এবং সাধন অধিকার সম্বন্ধে শাস্ত্রে দুই প্রকার পূজারীতি বর্ণনা আছে;—যথা বহিঃপূজা এবং মানসপূজা। এই প্রকার জপেরও তিন-প্রকার বর্ণনা আছে—যথা বাচনিক, উপাংশু এবং মানস জপ।

প্রকৃতিমিহ জনানাম্ সম্পরীক্ষ্য প্রবৃত্তিং
গুরুরিহ যদি দদ্যাৎ মন্ত্রশিক্ষাং যথাবদ্।
রুচিসমুচিতদেবোপাসনামাদিশেদ্বা
ব্রজতি লঘু স শিষ্যো মোহপারং মুমুক্ষুঃ॥

লোকসমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া শ্রীগুরুদেব যদি যথাশাস্ত্র মন্ত্রশিক্ষা প্রদান করেন এবং প্রবৃত্তি অনুসারে বিশিষ্ট দেব উপাসনার উপদেশ করেন, তাহা হইলে তাহার মোক্ষাভিলাষী শিষ্য অতি শীঘ্রই মোহপারে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকারেরা কোন বিষয়ই ছাড়িয়া দেন নাই। যদি শ্রীগুরুদেবের প্রত্যেক জিজ্ঞাসুর প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি পরীক্ষা করিবার অবসর না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থলে মন্ত্রোদ্ধারের ও দেবতোদ্ধারের অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখন এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শ্রীগুরুদেব কিরূপে শিষ্য-সমূহের প্রকৃতিবৈচিত্র্য পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? এ সম্বন্ধে তন্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়,—

গুহ্যাৎ গুহ্যতরম্ ভেদম্ তত্ত্বজ্ঞানম্ বিশেষতঃ।
অনুকূলং দেবভাবং স্বরজ্ঞানাৎ বিচার্য্যতে॥

পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায়—

যথা প্রজ্ঞানভাষস্তে, যথা নাস্তিঃ স্বরোদয়ঃ।
তথা কুলকুলম্ চক্রম্ সিদ্ধিদায়ি প্রকীর্ত্তিতং॥

অর্থাৎ গুহ্য হইতে অতিগুহ্য বিষয় সকল, বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্ত্বের অনুকূল উপাস্য দেবতার নিরাকরণ স্বরোদয় শাস্ত্রের দ্বারা হইয়া থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ অধিকারীর নিয়ম বর্ণিত আছে যে, যাহার প্রজ্ঞারূপ পূর্ণ এবং অভ্রান্ত জ্ঞান প্রকাশ না পাইয়াছে, একপ গুরু স্বরোদয় শাস্ত্রের গ্রহণ করিবেন এবং যিনি উভয়েতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তিনি অন্যান্য জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় চক্রাদি দ্বারা শিষ্যের উপাসনা সম্বন্ধায় অধিকারের পরীক্ষা করিয়া লইবেন। উক্ত চক্রাদির গণনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। এই চক্রের গণনা দ্বারা সাধক কোন্ দেবতার উপাসনা এবং মন্ত্রজপের উপযুক্ত, তাহা সহজেই জানা যায়।

শিশ্নোদরপরায়ণতা এবং ঘোর প্রমাদপূর্ণ এই বর্ত্তমান কাল প্রভাবে এখন আর কেহ দীক্ষা দিবার জন্য এত পরিশ্রম স্বীকার করেন না। এমন কি,

ভারতের অনেক স্থানে দীক্ষাদি ক্রিয়া একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে, এবং যদিও কোন কোন স্থানে আর্য্যসদাচারের শাসন অথবা সামাজিক শাসন অনুসারে কিছু কিছু দীক্ষাদি গ্রহণ রীতি আছে, তাহাও শিষ্যগণ এক তামসিক ক্রিয়ার ন্যায় মনে করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতনিবন্ধন পৃথিবীর বর্ত্তমান অন্যান্য উপধর্ম্মের রীত্যানুযায়ী নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ভাব প্রচার করণার্থ আপন আপন সাম্প্রদায়িক দেবতা ও মন্ত্রকে সর্ব্বজীবহিতকারী বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং তাঁহাদিগের নিকট কোন জিজ্ঞাসু উপস্থিত হইলে উঁহাদিগকে আপনাদিগের সাম্প্রদায়িক মন্ত্র উপদেশ দিয়া দীক্ষাগুরুর সম্মানার্থে বার্ষিক বা মাসিক একটী করিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া থাকেন। তন্ত্রশিরোমণি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শ্রীভগবান সদাশিব জগন্মাতা পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছেন, হে দেবি! করাল কলিকালে শিষ্যের সন্তাপহারক গুরু দুর্লভ হইবেন। এবং ঐ সময়ের উপদেষ্টাগণ কেবল শিষ্যের বিত্তাপহরণে তৎপর থাকিবেন। ফলতঃ শ্রীভগবানের ঐ আজ্ঞানুসারে আর্য্যজাতির মধ্যে এখন কার্য্যতঃ ঐরূপ উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

হা সনাতন ধর্ম্ম! বর্ত্তমান কালে তোমারও যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, আচার্য্য এবং দীক্ষাগ্রহীতাগণেরও তদ্রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে!!

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা প্রধান আবশ্যকীয় এবং প্রথম অধিকারের সাধনরূপ মন্ত্রযোগ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক লক্ষণাদি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, ভবিষ্যতে অন্যান্য যোগসাধনসম্বন্ধীয় লক্ষণ যথাক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

অভাব।

(শ্রীপার্ব্বতীচরণ মিত্র।)

এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই যেন এক ঘোর অস্থিরতা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইতে নিম্নতম বিকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অস্থিরতা দৃষ্ট হয়। প্রাণীই হউক, অপ্রাণীই হউক, যেন কি এক অস্থিরতা দ্বারা অভিভূত হইয়া সকলেই নিজ নিজ গতিতে চলিতেছে, যেন অস্থিরতাই তাহাদের প্রকৃতি। ব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত

অস্থিরতাই যেন সকলের স্বরূপ। ব্রহ্ম কল্পপ্রারম্ভে কি যেন এক ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সৃজিত হন। যেই বিকাশ, সেই অস্থিরতা, কারণ, যেস্থানে অস্থিরতা নাই, সেস্থানে বিকাশও নাই। বিকাশ থাকিলেও তাহা মানবমনের অগোচর। আমরা যাহা করি, তাহাতেই অস্থিরতা বিদ্যমান। দর্শনকালে দৃশ্য বস্তুর কম্পন দ্বারা নিকটবর্ত্তী অদৃশ্য পদার্থ ইথার (Ether) স্পন্দিত হইয়া, চক্ষুতে আঘাত করে। আঘাত স্নায়ুমণ্ডলিতে এক প্রকার কম্পন সৃজন করিয়া ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও আত্মা পর্য্যন্ত পৌঁছিলে, আমাদের দর্শনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রকার যাহা স্পর্শ করি, কি শ্রবণ করি, কি আঘ্রাণ করি, কিম্বা যাহাই করি না কেন, অস্থিরতাই তাহার মূলে অবস্থিত। ব্রহ্মের অস্থিরতা দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির সৃষ্টি। ব্রহ্মাদির অস্থিরতা হেতু পৃথিব্যাদির উৎপত্তি। আবার পৃথিব্যাদির অস্থিরতার শেষ নাই। চন্দ্র পৃথিবী হইতে, পৃথিবী সূর্য্য হইতে যেন দৌড়াইয়া পলাইতেছে, যেন কি এক অভাবনীয় জ্বালায় জ্বলিতেছে, যেন কোন শীতল সাগরে ডুবিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিবে। সেই রকম বৃক্ষ, লতা, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির অদম্যনীয় অস্থিরতা দেখা যায়। এই যে জগদ্ব্যাপী অস্থিরতা দেখা যায়, ইহার কারণ কি? যে অস্থিরতা আব্রহ্মস্তম্বের যেন স্বরূপ, তাহার মূল কি? ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অভাবই ইহার মূল। যেখানে অভাব, সেখানেই অস্থিরতা। আকাশের কোন অংশ হইতে যন্ত্র দ্বারা বায়ু অপসরণ করিলে অমনি অন্যান্য অংশের বায়ুগুলি হু হু করিয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হয়, জলরাশি হইতে কতক পরিমাণে জল সরাইয়া লইলে তৎক্ষণাৎ অন্য স্থান হইতে জল যেন প্রাণপণে দৌড়াইয়া সেস্থানে যায়, যেন ইহাদের মধ্যে কি এক ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত, যেন সেখানে না গেলেই নয়, সেখানে না গেলে আর প্রাণ বাঁচে না। মানবের মধ্যেও সেরূপ একজনের জন্ম হইলে অমনি সে সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত, অমনি তাহার অস্থিরতা আসিয়া উপস্থিত। জন্ম হওয়া মাত্র শিশু কাঁদিয়া উঠে। সে ত হাসিলেও পারিত, সে কাঁদিয়া উঠিল কেন? কাঁদা কিসের লক্ষণ? অভাব আসিলেই আমরা কাঁদিয়া থাকি। তবে বালকের কিসের অভাব? সে এইমাত্র জন্মিল, তাহার আবার অভাব কি? অভাব বুঝিতে হইলে বুদ্ধির আবশ্যক। তবে কি তাহার জন্মমাত্র বুদ্ধি জন্মিল? তাহা নয়, অভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল, সে যেখানে যায়, অভাব তাহার

সাথে সাথে ছায়ার মত চলিয়া যায়, তাহার বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, অভাব তাহার কাছছাড়া হইবে না। আরও তাহার অভাব দেখা যায়, স্তন মুখে দেওয়া মাত্র সে ঠাণ্ডা হয়, তাহার যেন সমস্ত জ্বালা চলিয়া যায়, সে দুধ টানিতে থাকে। কেন সে ঠাণ্ডা হয় ও দুধ টানে? তাহার অভাব আছে। তখন তাহার অভাব সেইরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় ইহাদের দ্বারা নিবারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিছুকাল পরে স্তনে আর সকল সময়ে তাহার অভাব দূর হয় না, সে কখন হাত নাড়ে, কখন পা নাড়ে, তাহাতেই সে সুখ পায়, না নাড়িতে পারিলে ভয়ানক কষ্ট। ক্রমে কখন খেলানায়, কখন হুড়াহুড়িতে, কখন কথাবার্ত্তা ইত্যাদিতে সে আনন্দ পায়, অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে কখন মাতা পিতাকে, কখন ভাই ভগিকে, কখন স্ত্রীপুত্রকে, কখন এটাকে, কখন ওটাকে, ভালবাসে। কিন্তু কোথাও তাহার শান্তি নাই, কোথাও তাহার জ্বালা নিবারিত হয় না। শান্তি পাইবে কি প্রকারে, গোড়ায় যে অভাব লাগিয়া রহিয়াছে। অভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে দৌড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু কোথাও জ্বালার শেষ নাই, কোথাও তাহার শান্তির উপায় নাই। সে একটী ছাড়িয়া অন্যটী ধরে, মনে করে, এইবার শান্তি পাইবে, সকল জ্বালা নিবিয়া যাইবে। চেষ্টা উদ্যমের শেষ নাই, অবশেষে লাভ হইল, কিন্তু তাহার নিশ্চিন্ততা কোথায়? যে জ্বালা সে জ্বালা রহিয়া গেল। অভাব রূপান্তর ধারণ করিল। আবার তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য একটীর দিকে ধাবিত। কেন সে বিভিন্ন বস্তুর দিকে ধাবিত হয়? যাহাকে এক সময় প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসিতে চেষ্টা করিত, আবার তাহাকে সর্পের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিয়া অন্যের প্রতি কেন সে ধাবিত হয়? কেন তাহার অভিলষিত বস্তু দ্বারা অভাব দূর হয় না? তাহার অভাব আছে সত্য, বিভিন্ন বস্তুও ত আছে, তবে কেন তাহার অভাব দূর হয় না? অভাব দূর হইবে কি প্রকারে? যাহার অভাব, তাহা না পাইলে অভাব দূর হইবে কি করিয়া? তবে কি এই জগতে কিছুই নাই যে, তাহার অভাব দূর করিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে, ইহাই সত্য। জগতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা কাহারও অভাব দূর করিতে পারে; যদিও কোন কোন বস্তু কোন কোন অভাব দূর করিবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবিক এই সকল অভাব আমাদের মোটেই নাই, দূর করিবে কিসে। অভাব যদি থাকিবেই, দূর হয় না কেন? অভাব আমাদের এক বস্তুর, কারণ, যাঁহাদের

অভাব দূর হইয়াছে, যাঁহারা শান্তি পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল এক বস্তু দ্বারাই শান্তি পাইয়াছেন। সুতরাং অভাব একটীর বই দুইটীর হইতে পারে না। যদিও বিভিন্ন বস্তুর অভাব দেখিতে পাই, তথাপি এই সকল আপাততঃ প্রতীয়মান অভাব আমাদের নাই। ইহারা মরীচিকাসদৃশ, আকাশকুসুম তুল্য, অস্তিত্বশূন্য, মায়া মাত্র। তবে আমাদের অভাব কিসের? যদি অভাব একটী বস্তুর হয়, তবে সে বস্তুটী কি? সে বস্তুটী মুক্তি, আমরা যাহা ছিলাম, আবার তাহা হওয়া। আমরা "শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" ছিলাম, এখন মায়া দ্বারা জড়িত হইয়া উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছি, আমরা যাহা ছিলাম, সে অবস্থা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, একটুকু আভাস আমাদের মধ্যে আছে। তাহা দ্বারাই চালিত হইয়া আমরা ভুলক্রমে নানা স্থানে নানা ভাবে নানা সাজে উপস্থিত হইতেছি, আসল বস্তুর সহিত সম্পর্ক নাই। এই আভাস দ্বারা চালিত হইয়া পাপী পুণ্যবান্, পুণ্যবান্ পাপী, গৃহী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী গৃহী, স্বাধীন অধীন, অধীন স্বাধীন হইতেছে, সকলেই দৌড়াদৌড়ী করিতেছে। প্রকৃত বস্তু না জানিতে পারাতেই এত গোল, এত হুড়াহুড়ি, জানিতে পারিলে আর গণ্ডগোল থাকে না, আর অভাব থাকে না, অস্থিরতা চলিয়া যায়। অচেতন পদার্থগুলি অপরিমেয় গতির সহিত দৌড়াইয়া অনন্ত সাগরে পড়িতে চায়, কিন্তু পথভ্রষ্ট হওয়ায় অনন্ত কাল ঘুরিয়া মরিতেছে। প্রাণিগণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া, একজনকে ধরিয়া একজনকে বুকে চাপিয়া, আর একজনকে ছাড়িয়া দিয়া সেই সুখে, সেই সচ্চিদানন্দসাগরে ডুব দিতে চায় কিন্তু তাহার প্রকৃত অভাব কি না জানায় কেবল হুড়াহুড়ি করিতেছে, যে জ্বালা সে জ্বালা রহিয়া যাইতেছে। প্রকৃত অভাব জানিতে পারিলে অবিলম্বে স্বরূপত্ব লাভ হয়। তাহা হইলে আর অভাব থাকে না, আর অস্থিরতা রহে না, দৌড়াদৌড়ি চলিয়া যায়; অচল অটল হিমাদ্রির স্বরূপ হইয়া যায়, নিষ্কম্প সাগরত্ব লাভ হয়।

কয়েকটী অদ্ভুত দেশহিতকর কার্য্য।

বারাণসী দরিদ্রদুঃখপ্রতীকারসমিতি।

প্রবাদ আছে ৺কাশীধামে কেহ উপবাসী থাকে না। একথার মধ্যে যে কতক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তথায় শত শত অন্নসত্রে প্রত্যহ অন্ন বিতরিত হইতেছে। কিন্তু নানা কারণে অনেক

উপযুক্ত ব্যক্তি যে বঞ্চিত হয়, ইহা একটু সামান্ত অন্বেষণ করিলেই জানা যায়। তার পর মানুষের রোগ আছে। অনেকেই এখানে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কোন মতে ভগবানের নাম করিয়া কাটাইবার জন্য আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের দূরদেশস্থ আত্মীয়গণের নিকট হইতে হয়ত যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য আসিয়া থাকে। কিন্তু রুগ্ন হইলে তাহাতে কুলায় না। আবার সেই অবস্থায়—বাড়ীওয়ালারা অতিশয় অত্যাচার করিয়া থাকে। হাঁসপাতালেরও সুবন্দোবস্ত নাই। তার পর মানুষের নানারূপ আপদ বিপদ্ আছে। সাধারণতঃ এখানকার হিন্দুগণ আজকাল সর্ব্বভূতসেবারূপ প্রকৃত ধর্ম্ম ভুলিয়া বাহ্য আচারনিষ্ঠা ও জ্ঞানের কচকচিতে রত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দের দুই জন ব্রহ্মচারী শিষ্য ৺কাশীবাসিগণের দুঃখ যথাসাধ্য প্রতীকার করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েন। প্রথম অতি সামান্ত ভাবে আরব্ধ হইয়া কিরূপে উহা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ইহাতে ১৯০০ সালের জুন মাস হইতে ১৯০১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

প্রথমতঃ, ইহাঁরা কিরূপে আপনাদের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া আতুরগণের রক্ষা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী ঘটনা উল্লিখিত হইল।

১৩ই জুন ১৯০০ সাল হইতে সমিতির কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। নৃত্যকালী দাসী নাম্নী ৮০ বৎসর বয়স্ক, জাতি কায়স্থ, এক বৃদ্ধাকে দেবনাথপুরার পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্ত্রীলোক ১০৮৲ টাকা লইয়া এক যাত্রীতোলা বাড়ীতে উঠিয়াছিল। তাহার ব্যারাম হওয়াতে তাহাকে বাড়ীওয়ালা সর্ব্বস্বান্ত করিয়া গঙ্গার ঘাটে পরিত্যাগ করিয়া যায়। বৃদ্ধা ৪ দিবস অনাহারে ছিল। পরে বুকে হাঁটিয়া আসিয়া ঐস্থানে পড়িয়াছিল। যামিনীরঞ্জন তাহাকে একটি রোয়াকে তুলিয়া রাখিয়া সত্র হইতে ও অন্যান্য ভদ্রলোকের বাটী হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া তাহাকে আহার করান, বৃদ্ধার প্রাণরক্ষা হয়। পরদিন ঐ বৃদ্ধাকে পাঁড়েঘাটের একটি নালার নিকট বিষ্ঠাসংযুক্তগাত্রে পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। তথা হইতে উঠাইয়া পাঁড়েঘাটের গঙ্গার ধারে ধর্ম্মশালায় রাখিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করা হয়, কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় বৃদ্ধার অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার পদদ্বয় ফুলিয়াছিল। ৬দিবস পরে চিকিৎসার জন্য তাহাকে ভেলুপুর হাঁসপাতালে পাঠান হয়। খোরাকী জমা না দিলে এ হাঁসপাতালে রোগীকে রাখা হইবে না জানিতে পারায় ভিক্ষা করিয়া খোরাকী জমা দেওয়া

হয়। ১৪দিন চিকিৎসায় বৃদ্ধার আরোগ্যলাভ হয়। তখন তাহাকে কোথায় রাখা হইবে, এই চিন্তা উপস্থিত হইলে ভিঙ্গা মহারাজের অনাথালয়ে জিজ্ঞাসায় জানা গেল, তাঁহারা অথর্ব্ব রোগীদের স্থান দেন না। তৎকালে সমিতির নিজের কোনরূপ স্থান না থাকায় অগত্যা তাহাকে চৌকাঘাট Poor house এ পাঠান হয়। এই চৌকাঘাট বরুণার পুলের ওপারে অবস্থিত (৬বারাণসীধামের বহির্ভূত) বলিয়া অনেক রোগী তথায় যাইতে অনিচ্ছুক; রাস্তায় মরা তাহারা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

১৬ই জুন। যামিনীরঞ্জন কেদার নামক দ্বাদশবর্ষবয়স্ক এক জলমগ্ন বালকের প্রাণরক্ষা করেন। প্রত্যূষে মাঝ গঙ্গায় ঐ বালক সাঁতার দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া জলমগ্নপ্রায় হইয়াছিল। শীতলাঘাটের পাণ্ডারা বা অপর কেহ তাহার প্রাণরক্ষায় যত্নশীল না হওয়ায় অগত্যা যামিনীরঞ্জন জলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক বালকের নিকট যাইতে না যাইতে সে ডুবিয়া যাইল। শেষে ডুব দিয়া তাহার হস্তধারণে সক্ষম হইলে নিজের পরিধেয় বস্ত্রে পুনরায় পা জড়াইয়া যায়। ভগবৎকৃপায় এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া উলঙ্গ অবস্থায় বালককে বক্ষে লইয়া স্রোতের অনুকূলে ভাসিতে ভাসিতে কিনারায় উপস্থিত হয়। যামিনী-রঞ্জনের শরীর সে সময় অতিশয় দুর্ব্বল ছিল এবং এ কার্য্যে অত্যন্ত অসম-সাহসিকতা প্রকাশ হইয়াছিল।

২৭শে জুন। গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬ বৎসর বয়স, ফরিদপুরে বাটী। এই বালক এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাটী হইতে পলাইয়া আসে। তাহার দেশের পরিচিত একজন বিদ্যার্থী কোন বিখ্যাত সাধুর নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা করিত। গিরীন্দ্র তথায় আশ্রয় লয়। পরে তাহার জ্বর বিকার হইলে সেই সাধু তাহার উপর অতিশয় বিরক্ত হন। চিকিৎসাদি হইতেছে না ও যেখানে আছে, তাহা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া ঐ পাড়ায় একটি ঘরভাড়া করিয়া গিরীন্দ্রকে লইয়া চিকিৎসা করান হয়। পথ্যাদি অপর স্থান হইতে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে দেওয়া হইত এবং ৩। ৪ জন অনবরত সেবা শুশ্রূষা করিত। এই বালক কিছু আরোগ্য হওয়ায় একজন পরিচিত ব্যক্তির বাটীতে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় তাহার পুনরায় পীড়া হয়। বিনামূল্যে ১৫ দিবসকাল রুক্মিণী কবিরাজ মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া চিকিৎসা করিবার পর আরোগ্য হওয়ায় স্বদেশে চলিয়া যায়।

শ্যামাসুন্দরী দাসী, সোনারপুর নিবাসী, কায়স্থ, বয়স ৪০। ইহার রক্ত-

আমাশয় হওয়ায় বাড়ীওয়ালী চাবি বন্ধ করিয়া সমস্ত রাত্রি উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। যামিনীরঞ্জন তাহাকে মুক্ত করিয়া বেলুপুর হাঁসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসার পর সে আরোগ্য হইয়া পুনরায় গৃহে যায়।

অমৃত দাসী, বয়স ৪০, শোথ ও বক্ষস্থলে ক্ষত, বাড়ীওয়ালা পথে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়—ইহাকে চৌকাঘাট হাসপাতালে দেওয়া হয়।

হরিদাসী, বয়স ৩০, পাঁড়েঘাটে পথে পাওয়া যায়, আনরক্ত পীড়াগ্রস্ত, ইহাকে চৌকাঘাটে পাঠান হয়।

হরমণিদাসী, বয়স ৭০, মুনসীঘাট—ইহার মধ্যে মধ্যে পেটের পীড়া হয়—বলিয়া বাড়ীওয়ালা রাস্তায় বসাইয়া দেয়। সপ্তাহে চাউল ও বাজার খরচ দেওয়া হইবে ও বিষ্ঠায় বাড়ী অপরিষ্কার হইলে পরিষ্কার করিতে হইবে, এই করারে বাড়ীওয়ালা পুনরায় বৃদ্ধাকে স্থান দেয়। শেষে এই স্ত্রীলোককে আশ্রমেও রাখিয়া দেওয়া হয়।

দুর্গামণি দাসী – কায়স্থ, বয়স ৬০। এই স্ত্রীলোককে একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধযুক্ত অন্ধকার গৃহে পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কোনরূপ সঙ্গতি নাই। ২।৩ দিন অন্তর আহার জুটিত—প্রথমে বাড়ীওয়ালাকে প্রত্যেক সপ্তাহে চাউল ও বাজারখরচ দেওয়া হইবে, এই বন্দোবস্তে তাহার বাটীতে যাইয়া সেবা শুশ্রূষা করা হইত। পরে সমিতিগৃহে আনা হয়। এখানে মারা যাইলে সমিতি হইতে যথারীতি মণিকর্ণিকায় সংকার করা যায়।

ঈশ্বরী ব্রাহ্মণী, দেবনাথপুরা, বয়স ৪০। এই অনাথা বিধবা স্ত্রীলোক বিনা চিকিৎসায় ১ মাস কাল পড়িয়াছিল। পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা, রুক্মিণী কবিরাজ মহাশয় প্রথমে চিকিৎসা করেন, শেষে ডাক্তার মন্মথনাথ বসু (এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন) আসিয়া বলেন, যকৃতে ফোড়া হইয়াছে, শীঘ্র অস্ত্র করা অত্যন্ত আবশ্যক এবং হাঁসপাতালে লইয়া না গেলে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম। তিনি রোগীকে বুঝাইয়া বলায় সে হাঁসপাতালে যাইতে স্বীকৃতা হয়। অস্ত্র হইবার পর ১৩ দিবস সে হাঁসপাতালে জীবিতা ছিল। মৃত্যুর পর সমিতির খরচে ব্রাহ্মণের দ্বারা যথারীতি সংকার করা হয়।

পঞ্চানন হাজরা, বয়স ৩৫, এই ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া নারদ ঘাটে পতিত ছিলেন। কোন লোক ইঁহাকে জলপর্য্যন্ত দিত না বা কাছে আসিত না। ডাক্তার মন্মথ বাবু নারদঘাটে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সমিতিবাটী হইতে আহার লইয়া প্রত্যেক দিবস প্রাতে ও

রাত্রে দিয়া আসা হইত। মধ্যে ইহার কলেরা হয়, যামিনীরঞ্জন সেবা করিয়াছিলেন; চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ হয়।

বহিমুদ্দীন—বয়স ৪৫—এই অন্ধ মুসলমান আমরক্তপীড়াগ্রস্ত হইয়া পথে পতিত ছিল, ইহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

বিহারী—৫৫—এই হিন্দুস্থানী মণিকর্ণিকা ঘাটে কাশ এবং প্রবল জ্বরগ্রস্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় পড়িয়াছিল। ডুলি করিয়া সমিতিগৃহে আনিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করা হইয়াছিল, শেষে ভেলুপুর হাঁসপাতালে পাঠাইলে আরোগ্যলাভ হয়।

লক্ষ্মীকান্ত রায়—বাস সোণারপুরা, বয়স ৬৩, এই ব্রাহ্মণের আমরক্ত পীড়া হওয়ায় বাড়ীওয়ালা রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। ইহাকে সমিতিগৃহে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা ও কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ কবিরঞ্জনের দ্বারা চিকিৎসা করায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

গিরিবালাদেবী, বয়স ২০—এই স্ত্রীলোক তাহার মাতার সহিত অসুখ অবস্থায় কাশী আসিয়া এক যাত্রীওয়ালা বাড়ীতে আশ্রয় লয়। শীঘ্রই অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় বাড়ীওয়ালা তাড়াইয়া দেয়। অগত্যা গিরিবালার মাতা সেই পল্লীতে একটি দুর্গন্ধযুক্ত অন্ধকার গৃহ ভাড়া করিয়া কন্যাকে তথায় রাখে। গিরিবালা, প্রবল জ্বর, আমরক্ত ও অর্শরোগে দুই বৎসর কাল ভুগিতেছিল। সমিতি হইতে কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি তিন মাসকাল বহুমূল্য ঔষধ সকল বিনা মূল্যে দেন। স্বর্ণপটপটি ব্যবস্থা হওয়ায় খাঁটি দুগ্ধ সমিতি হইতে প্রতিদিন ২ সের ২॥০ সের করিয়া দুই মাসকাল যোগান হইয়াছিল। এই স্ত্রীলোক এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

গৌরীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১৫—ইহার পিতা মাতা অত্যন্ত নিঃস্ব—কলেরারোগগ্রস্ত হইয়া বিকার অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় ছিল—সমিতির যত্নে ডাক্তার মন্মথ বসুর দ্বারা ইহার চিকিৎসা করান হয়।

হেরম্বচন্দ্র বাগ্‌চী, বয়স ৩০, বাড়ী পাংসা—পাছায় হাড়ের ভিতর অত্যন্ত বেদনা, এই ব্রাহ্মণ যুবক অসহায় অবস্থায় শয্যাগত ছিল পার্শ্ব ফিরিবার শক্তি ছিল না। অসহ্য যন্ত্রণা। এক মাসকাল চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা করায় ও পথ্যাদি দেওয়ায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

সবর্ তেওয়ারি—হিন্দুস্থানী বালক, বয়স ১২—জ্বরবিকারগ্রস্ত মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত ছিল, কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ কবিরঞ্জন অত্যন্ত যত্নের সহিত

চিকিৎসা করায় আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ২৪ দিন যাবৎ সাগু বার্লি ও অন্যান্য পথ্য ও ঔষধ সমিতি হইতে লইয়া গিয়া রোগীর বাটীতে দিয়া আসিতে হইত। প্রত্যহ ৬। ৭ বার রাত্রে ১০টা পর্য্যন্ত ঔষধ খাওয়াইতে হইত।

হেমলতাদেব্যা, পক্ষাঘাত—বয়স ৩৫, এই রোগীকে কবিরাজ ভবানী প্রসাদ ২।।০ মাস কাল যাবৎ চিকিৎসা করিতেছেন। মকরধ্বজ প্রভৃতি বহুমূল্য ঔষধাদি দিতেছেন। এবং পথ্যাদির ব্যয় সমস্ত সমিতি হইতে দেওয়া হইতেছে।

পরমেশ্বরী সহায় বা প্রবোধানন্দ সরস্বতী, এই সন্ন্যাসী বহু দিন হইতে হাঁপানি কাশে ভুগিতেছিলেন। সমিতিতে প্রায় ৩ মাস কাল যাবৎ চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কবিরাজ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর চিকিৎসাধীন ছিলেন, কবিরাজ মহাশয় বহুমূল্য ঔষধাদি দিয়াছিলেন।

রাজলক্ষ্মী দেব্যা, বয়স ৪৫, দেবনাথপুরার এক নিম্নতল গৃহে বিনা চিকিৎসায় ছিলেন। রোগ,—ডবল নিউমোনিয়া। ডাক্তার মন্মথ বাবুর চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হইয়াছে। সমিতি হইতে ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয় বহন করা হইয়াছে।

১৩ই জুন (১৯০০) হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর সমিতির জন্য বাড়ীভাড়া হয় নাই। পথ ঘাট ও রোগীদের বাটীতে সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্য করা হইয়াছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর জঙ্গমবাড়া মহল্লায় ৫৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় ১ বাড়ী লওয়া হয়। সমিতির কার্য্যের সহায়তার জন্য স্বর্গীয় বাবু প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুরকে সভাপতি ও মোক্ষদাদাস মিত্র মহাশয়কে সম্পাদক মনোনীত করিবার জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালীটোলা স্কুল ভবনে এক সাধারণ সভা আহূত হয়, সেই সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হয়। পূর্ব্বে ৭। ৮ জন যুবক এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহারাই সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন, ঐ দিন সাধারণকে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা হয়। প্রমদাদাস বাবু যে দিন এই কার্য্যের বিষয় শুনিয়াছেন, সেই দিন হইতে সাহায্য করিয়াছেন।

১৯০০ সালের জুন হইতে ১৯০১ এপ্রিল পর্য্যন্ত সমিতিগৃহে আনিয়া ২৯ জনের সেবা করা হইয়াছে, তাহাদের বাসায় চাউল প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে ১৩৮ জনকে এবং হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে ৪২ জন। হাঁসপাতালে পাঠাইবার খরচ ও তথাকার পথ্যাদির ব্যয় সমিতি হইতে হইয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে আয় হইয়াছে ৬২৪৶৫, খরচ হইয়াছে ৪৮৬৴০, হাতে

ছিল ১৩৮/৫। এতদ্ব্যতীত, মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা অনেক চাউলও সংগৃহীত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল। ১৯০১ এপ্রিল মাসে চাঁদা আদায় হইয়াছিল ৭২।৵০। এককালীন দান ২৪৲ টাকা ও ব্যয় হইয়াছিল ৮১।৶১৫।

সমিতি কি কি কার্য্য করেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

(ক) সমিতি, রাস্তায় নিপতিত পীড়িত নিরাশ্রয় অনাথ অনাথাদিগকে নিজব্যয়ে হাঁসপাতালে প্রেরণ করেন, ও স্থানবিশেষে তাহাদিগের পথ্যাদির ব্যয় বহন করিয়া থাকেন।

(খ) হাঁস্পাতালে যাইতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিবর্গকে, তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী স্থানে বা সমিতির বাটীতে আশ্রয় দিয়া চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।

(গ) যাহারা অনশনে প্রাণত্যাগ বিবেচনা বোধে সাধারণ দানস্থলে যাইতে বিরত হন এবং যাহারা অন্ধ, অথর্ব্ব, রুগ্ন, চলৎশক্তিবিহীন এবং ভিক্ষায় অপারগ, সমিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের অবস্থা অবগত হইয়া, তাহাদিগের ভরণ পোষণের সাহায্য করিয়া থাকেন।

(ঘ) ভিক্ষাজীবী ও কায়িক শ্রমে অতিকষ্টে গ্রাসাচ্ছাদনকারী ব্যক্তিবর্গ অসুস্থ হইলে, সমিতি—ডাক্তার কবিরাজ ও ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা তাহাদের আবাস স্থলে উপস্থিত হইয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।

এই মহৎ লোক-হিতকর কার্য্যে, সর্ব্ব সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব বিবেচনায়, সমিতি, সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছেন যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী সাহায্য দ্বারা সমিতির উন্নতি সাধন করুন।

সমিতির বর্ত্তমান ঠিকানা, রামাপুরা, বেনারসসিটি। যে সকল সহৃদয় মহাত্মা এই মহৎ কার্য্যের জন্য কিছু দিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি উদ্বোধনসম্পাদক, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

উদাসীর ধর্ম্মসূত্র।

উদাসী বন্ধুটিকে এক দিন ধরিয়া বসিলাম, তোমার অমন আবছা আবছা কথায় আর চলিবে না। আজ তোমাকে যা জিজ্ঞাসা কোরবো, তার সব পরিষ্কার জবাব দিতে হবে। বন্ধু একটু হাঁসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, রাজি। আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম,—

আ। সহজে ধর্ম্মলাভ হয় কি না ?

উ। জ্যামিতি শিখিবার রাজপথ নাই।

আ। ঈশ্বর কি এমন নির্দ্দয় যে, তাঁর পুত্র কন্যাগণের মধ্যে কাউকে ধর্ম্ম করতে সক্ষম করেছেন, কাউকে করেন নাই ?

উ। সবার পথ খোলা, যে যেমন করে, তার তেমনি হয়।

আ। তোমার মতে ধর্ম্ম জিনিসটা কি ?

উ। মনকে ধরাই ধর্ম্ম।

আ। ধর্ম্ম এক না বহু ?

উ। ধর্ম্ম এক, উহার প্রকাশ বহু।

আ। ভগবান কি ?

উ। জগতের অতীত অথচ জগৎস্বরূপ সচ্চিদানন্দই ভগবান।

আ। ভগবানকে দেখা যায় কি না ?

উ। তোমরা যাহাকে দেখা বল, সে রকম ভাবে দেখা যায় না, সাক্ষাৎকার কত্তে পারা যায়।

আ। সাক্ষাৎকারের দরকার কি ?

উ। তাঁকে সাক্ষাৎকার কল্লে সব কামনা চরিতার্থ হয়।

আ। কাম্য জিনিসগুলি পাওয়া যায় ? যেমন আমার যদি অর্থকামনা থাকে, তবে ভগবৎসাক্ষাৎকার হলে অর্থ লাভ হয় ?

উ। অর্থলাভের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ আনন্দলাভ, তাহা অনন্ত পরিমাণে হয়; অর্থলাভের প্রয়োজন বোধ থাকে না।

আ। কি উপায়ে লাভ হয় ?

উ। যে চায়—সে পায়।

আ। বৈরাগ্যের লক্ষণ বল।

উ। ভগবান ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই বৈরাগ্য।

আ। বৈরাগ্য হলেই কি সন্ন্যাসী হতে হয় ?

উ। তার কোন মানে নাই।

আ। তবে সন্ন্যাস আশ্রমকে বৈরাগ্য আশ্রম বলে কেন ?

উ। বৈরাগ্যভাব এলে লোকে প্রায় সন্ন্যাসী হয় আর সন্ন্যাস আশ্রমেই বৈরাগ্যভাবের চরিতার্থতার সুবিধা বেশী।

আ। সংসার ও সন্ন্যাস আশ্রমের তুলনা কর।

উ। সংসারে থাকা সাবধানীর কায, সন্ন্যাস অবলম্বন সাহসীর কায। সংসারে উন্নতির সম্ভাবনা কম, সন্ন্যাসীর উন্নতির সম্ভাবনা বেশী। আবার সংসারে পতনের আশঙ্কা কম, সন্ন্যাসে পতনের আশঙ্কা বেশী।

আ। ভক্তি কি?

উ। ভগবানে অত্যন্ত অনুরাগই ভক্তি।

আ। শ্রদ্ধা কাকে বলে?

উ। সদ্গুরুর বাক্যে অথবা সৎশাস্ত্রের কথিত বিষয়ে যে স্বাভাবিক বিশ্বাস, তার নাম শ্রদ্ধা।

আ। প্রেম কি?

উ। ভগবানের অনুরাগে যখন সাধক আত্মহারা হয়ে যায়, যখন তার ঘৃণা লজ্জা ভয় থাকে না, তখনই প্রেম হয়।

আ। নির্ভর কি?

উ। অহংজ্ঞানশূন্যতাই নির্ভর।

আ। ভাল বুঝিলাম না।

উ। প্রথমে লোকে আমি জ্ঞানে কর্ম্ম করে। নানান্ রকম চেষ্টা কত্তে থাকে। সাধন ভজন কর্‌বার সময়ও এই অহংভাব থাকে—মনে হয়, দুই লক্ষ জপ কর্‌বো, আসন, প্রাণায়াম কোর্‌বো, ধ্যান ধারণা কোর্‌বো, তবে তাঁকে পাব। এসব কত্তে কত্তে দেখ্‌তে পায়, যেটাকে আমি বল্‌ছি, সেটার মূলে আর এক মহাশক্তি কায কচ্চে। ঠিক যেমন পুতুলো বাজীর সময় একজন বাজীকর ভেতর থেকে কল টিপে কিন্তু বাহির থেকে দেখ্‌লে পুতুলগুলিকে নিজচেষ্টায় গতিশীল বোধ হয়। এই রকম বোধ হোলে সাধকের কি রকম একটা ঢিলে ভাব আসে—সেটা মহা শান্তির অবস্থা। পরমহংসদেব উদাহরণ দিতেন, যেমন অত্যন্ত পরিশ্রমের পর তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়্গুড়িতে তামাক টানা। এরূপ নির্ভর ও আলস্য আকাশ পাতাল ব্যবধান। একজন সাধক নির্ভর ও সাধন তত্ত্বের সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য বল্‌তেন, তাঁকে সাধন কল্লেও পাওয়া যায় না আবার সাধন না কল্লেও পাওয়া যায় না।

আ। যোগ ব্যাপারটা কি?

উ। কোন অবলম্বনে অথবা বিনা অবলম্বনে চিত্ত স্থির করার নাম যোগ।

আ। জ্ঞান কি?

উ। সর্ব্বত্রে ঐক্যানুভূতিই জ্ঞান।

আ। মায়া বল কারে?

উ। যা সর্ব্বদা একরূপ থাকে না, আর জ্ঞান উদয় হোলে যা একেবারে লোপ হয়, তার নাম মায়া।

আ। মায়া সত্য কি মিথ্যা?

উ। অজ্ঞানীর কাছে সত্য, জ্ঞানীর কাছে মিথ্যা।

আ। সাধু কাকে বলে?

উ। যাঁর মন সর্ব্বদাই ভগবানে তদ্গত, তিনিই সাধু।

আ। সাধুসঙ্গে ফল আছে?

উ। আছে।

আ। কি রকম?

উ। সাধুর কার্য্যকলাপ দেখে, সাধুর বাক্য শুনে, আর প্রধানতঃ সাধুর আন্তরিক চিন্তার প্রভাবে সংসারী লোকের মনে অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য ঈশ্বরীয় উদ্দীপনা উপস্থিত হয়।

আ। গুরু কাকে বলে?

উ। যাঁর কাছ থেকে যে কিছু শিক্ষা পাই, তাঁকেই গুরু বলি। তবে ধর্ম্মজগতে যাঁর বিশেষ উপদেশ ও সহায়তায় আমাদের ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, তাঁহাকেই প্রকৃত গুরু বলি।

আ। কুলগুরু কি ত্যাগ করা উচিত?

• উ। প্রকৃত ধর্ম্ম বা ঈশ্বরলাভ একটা সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। যদি কুলগুরুর উপদেশে ভগবৎপ্রাপ্তির সাহায্য পাও, তবে তাঁহাকে খামকা কেন ত্যাগ কোত্তে যাবে? সাহায্য না হোলে কাযেই অপর গুরুর আবশ্যক হয়।

আ। গুরুর সহায়তা ব্যতীত ধর্ম্ম লাভ অসম্ভব কি না?

উ। অনেক স্থলেই অসম্ভব।

আ। গুরু কি এক হওয়া উচিত কি অনেক হইতে পারে?

উ। অনেক হইতে পারে, তবে এক গুরু হইলে বিশেষ সুবিধা।

আ। গুরুতে ভগবান ভাবা দোষ কি?

উ। না, দোষ নয়। যখন সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কোত্তে হবে, তখন গুরুতে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কোত্তে না পারে, তাহার ধর্ম্মলাভ বহুদূর। যারা ধর্ম্ম বাস্তবিক সাক্ষাৎকার কোত্তে চায় না, কেবল বাজে বকিয়া বেড়ায়,

তাহারাই গুরুতে ব্রহ্মবুদ্ধি কোত্তে নারাজ। আর এক কথা, প্রকৃত সদ্গুরু লাভ হইলে আর জোর কোরে তাঁতে ব্রহ্মবুদ্ধি কোত্তে হয় না, কারণ, তিনি ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মস্বরূপ হোয়েছেন।

আ। অবতার কাকে বলে?

উ। সমুদায় জগতই ভগবানের অবতার। যেখানে বিশেষ প্রকাশ, সেই খানেই বিশেষ ভাবে অবতার সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয়। আমার মনের ভাব এই। এ সম্বন্ধে অনেক মত আছে।

আ। বন্ধন কাকে বলে?

উ। আমি ছাড়া অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভর করাকেই বন্ধন বলে।

আ। যেমন?

উ। যেমন কাপড় খানা না হোলে আমার চোল্‌ছে না, ছাতাটা না হোলে আমার চোল্‌ছে না, ইত্যাদি। মোট কথা, যতক্ষণ অভাব বোধ আছে, ততক্ষণ বন্ধন।

আ। তা হোলে কাকে মুক্ত বল, তাও বুঝ্‌তে পেরেছি। যার অভাব বোধ নাই, সে মুক্ত।

উ। তবে ত গাছ পাথরের অভাব বোধ নাই।

আ। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) তাইত!

উ। শুধু অভাব বোধ নাই বোল্‌লে মুক্তের স্বরূপ ঠিক বোঝা যায় না। যিনি আপনার আনন্দে আপনি বিভোর হয়ে কোন অভাব বোধ করেন না, যিনি নির্ভীক, অসহায় হইয়াও মহাবল, নির্ধন হইয়াও সদাতুষ্ট, তিনিই মুক্ত।

আ। আত্মা কাকে বলা যায়?

উ। আত্মার স্বরূপ নিত্যচৈতন্য ও আনন্দ।

আ। তবে ঈশ্বর ও আত্মায় কি তফাৎ রইল?

উ। তফাৎ ত কিছু নেই, কেবল অজ্ঞানীই তফাৎ বোধ করে।

আ। তবে আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানই মুক্তি?

উ। ঠিক বোলেছ। আচ্ছা বল দেখি, আত্মা এক না বহু?

আ। আপাততঃ ত বহু দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষে এক।

উ। হাঁ তাই। তবে বল দেখি, মুক্তি কার হয়?

আ। (অনেকক্ষণ ভাবিয়া) তাইত বিষম সমস্যা যে! গোলক ধাঁধাঁয় ফেল্লে যে!

উ। শোন, আত্মা বাস্তবিক সদামুক্ত, সদাব্রহ্মস্বরূপ, তবে অজ্ঞানীর সেটী বোধ হোচ্চে না। বোধ হোলেই অনুভব হয়, আমার মুক্তিও নাই, বন্ধনও নাই।

আ। তুমি কি অদ্বৈতবাদী নাকি!

উ। এখনও দ্বৈতবাদী আছি। ভগবৎকৃপায় আশা করি, একদিন অদ্বৈতবাদী হইব। সকলেই প্রথমে দ্বৈতবাদী থাকে, যতক্ষণ ভগবান ও আমি পৃথক বোধ থাকে। এক বোধ হইয়া গেলেই, তন্ময় হইয়া গেলেই সকলেই অদ্বৈতবাদী।

আ। আচ্ছা, বিবাহ করাটা ভাল কি মন্দ, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি খুলে বল।

উ। বিবাহ না কোরে যদি ভগবৎসাধনা কোরে পবিত্রভাবে জীবন কাটাতে পারা যায়, তবে সেই শ্রেষ্ঠ। তবে যে না পারে, তাকে কাযেই বিবাহ কত্তে হয়। শুধু বিবাহ না কোরে মনে দিন রাত অশান্তির আগুন জ্বেলে রাখার চেয়ে বিবাহ করাই ভাল। তবে এটা ভোলা উচিত নয় যে, আমি শ্রেষ্ঠ জিনিসটা কোত্তে পারচি না বলেই এইটে কোত্তে বাধ্য হোয়েছি।

আ। কিন্তু সকলেই যদি বিবাহ না করে, তবেত সৃষ্টিলোপ—

উ। আজ আর থাক্।

আ। আচ্ছা। আজ তোমায় ঢের বকান গেল। কিন্তু কি করি বল? রাত্রের ট্রেনেই বাঁকিপুর যেতে হবে, তাত জান? এখন কদ্দিনে ফিরি, ঠিক নেই। এখন তোমার কথাগুলি নিয়ে যথেষ্ট ভাব্‌বার সময় পাব, কিন্তু ভাই, আমি তোমাকে মাঝে মাঝে এক একটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন কোরে সন্দেহ তুলে চিঠি লিখে বিরক্ত কোর্‌বো, তোমায় কিন্তু জবাব দিতে হবে।

উ। আচ্ছা, তা তখন দেখা যাবে।

বন্ধুর নিকট বিদায় হইয়া বাড়ী গিয়া সব কথাগুলি পকেট বুকে নোট করিয়া লইলাম। উদাসী বন্ধুকে ভারি শ্রদ্ধা করিতাম, পাঠক মহাশয় জানেন ত।

ইতি সংসারী।

আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র। আজ কাল আমরা যে সকল চিকিৎসাবিজ্ঞান ও পদ্ধতি প্রচলিত দেখিতেছি, প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে

হইলে তৎসমুদয় চিকিৎসা বিজ্ঞান বা পদ্ধতির আদি ও মূলই একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ। এক সময়ে এই সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া কোন প্রকার চিকিৎসাবিজ্ঞান বা চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল না, এমন কি, ভারতবর্ষবাসী মানবগণ একদিন চিকিৎসাবিজ্ঞানের নাম কিম্বা চিকিৎসাপদ্ধতির রীতি নীতি পর্য্যন্ত জানিত না।

অতি প্রাচীনতম কালে অর্থাৎ মানবসংস্থিতির প্রারম্ভ বা প্রথমাবস্থায় এই ভারতবর্ষের বায়ু, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি অতি বিশুদ্ধ ছিল, এবং এই বিশুদ্ধ বায়ু, জল ও মৃত্তিকার জন্য ভারতবর্ষ যে অতি বিখ্যাত ছিল, তাহা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং তৎকালে একমাত্র স্বাভাবিক ব্যাধি জরা মৃত্যু প্রভৃতি ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অস্বাভাবিক ব্যাধি এককালেই উৎপন্ন হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং সেইজন্য তৎকালে কোন প্রকার চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও আবশ্যকতা ছিল না। কালসহকারে মানব ও অন্যান্য প্রাণিগণের নিয়ত অধিবাস জন্য শরীর-নিঃসৃত মলসমূহের দ্বারা এই বিশুদ্ধ বায়ু, জল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রদূষিত হইয়া রোগসমূহ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মহানিও এই রোগোৎপাদনের অন্যতম কারণ।

যৎকালে ভারতবর্ষবাসী মানবগণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ রোগ সমূহের ভীষণ যন্ত্রণায় উৎপীড়িত এবং অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে লাগিল,—প্রদূষিত জল, বায়ু ও মৃত্তিকা কালবিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হইয়া জনপদ সকল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, সেই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, অমিততেজা, তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন, অনসাধ্যকর্ম্মা, উদারচেতাঃ আত্রেয়প্রমুখ আচার্য্য মহর্ষি-মণ্ডলী, স্নিগ্ধচ্ছায়পাদপবাজিপরিশোভিত, শান্তিপূর্ণ হিমালয়প্রদেশবিশেষে সমবেত হইয়া তত্রত্য প্রাণিসমূহের প্রতি দয়াবশতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগোপনাশ জন্য আয়ুর্বিজ্ঞানালোচনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তদবধি অমানুষশক্তি-সম্পন্ন, যমনিয়মশীল জগতের একমাত্র মঙ্গলব্রতে ব্রতী কত শত মহর্ষি দৃঢ় অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে, আয়ুর্বিজ্ঞান, শরীরতত্ত্ব, দ্রব্যসমূহের নাম, রূপ, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব প্রভৃতি নিরূপণার্থ, আপনাদের নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিয়া এই মর জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ আমি যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তৎকালে এই সমস্ত বিষয় এখনকার ন্যায় গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিবার পদ্ধতি কিম্বা

লিখিবার উপাদানাদিও ছিল না। তখন দৃঢ়াধ্যবসায় ও প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষি-মণ্ডলীর অসাধারণ মেধা ও স্মৃতি বিশিষ্ট হৃদয়ই গ্রন্থবিশেষ ছিল, সুতরাং প্রথমাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদেরও গ্রন্থাদি ছিল না। মহর্ষিভরদ্বাজশিষ্য অগ্নিবেশ ঋষিই প্রথমে এই সকল বিষয় গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করেন, সুতরাং অগ্নিবেশ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থই আয়ুর্ব্বেদের আদি গ্রন্থ। ঋষিপ্রণীত গ্রন্থমাত্রেই সংহিতা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আজি যে আমরা চরকসংহিতা নামক গ্রন্থ দেখিতে পাইতেছি, তাহা সেই প্রাচীন গ্রন্থের নানা জন কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ মাত্র। অগ্নিবেশ ঋষির গ্রন্থপ্রণয়নানন্তর হারীত, পরাশর প্রভৃতি অনেকানেক ঋষি আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থ আজ, কালের অনন্ত ক্রোড়ে লীন হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর মহৎ দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? আজি যে আমরা কণামাত্রও দেখিতে পাইতেছি, সে কেবল ঐ মহাত্মাদের কৃপায়,নতুবা এতদিন হয়ত আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইত।

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি অর্থাৎ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিতামৃত। সম্পূর্ণ। শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন প্রণীত। ১১৫।২, গ্রেষ্ট্রীট, বসুমতী আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য আড়াই টাকা। এই গ্রন্থখানিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সাধন ভজন, ধর্ম্মপ্রচার এবং নানাভক্তের সহিত সম্মিলন কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের মত অতি সরল কবিতাকারে বর্ণিত আছে। পরমহংসদেবের যতগুলি জীবনী এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে তাঁহার জীবনের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেক ঘটনা এবং তাঁহার অনেক উপদেশও জানিতে পারা যায়। শুষ্ক ইতিহাসচ্ছলে লিখিত না হইয়া সরস কবিতাকারে লিখিত হওয়াতে ইহা বঙ্গদেশের আপামর সাধারণের উপযোগী হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এ পুস্তক পণ্ডিতেরও উপেক্ষণীয় নহে। কারণ, মহাপুরুষের জীবনচরিতে ভাষার দিকে লক্ষ্য না থাকিয়া সেই জীবনের গভীর ভাবগুলির প্রতি লক্ষ্য থাকা উচিত। সাধকগণের যে এ গ্রন্থ পরম আদরণীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের যতই প্রচার হয়,ততই আনন্দের বিষয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—উরণ র পরে চ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'উরণ্ র পরঃ' সূত্রপ্রযুক্ত, 'ঋ' স্থানে 'র' পরবিশিষ্ট 'অণ্' কার্য্যেও 'ঋ'কারের সর্ব্বত্রই নিবৃত্তি হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—উরণ্ পরে চ সর্বেষামৃকারাণাং নিবৃত্তিঃ প্রাপ্নোতি। অন্যাপি প্রাপ্নোতি। কর্তৃ। হর্তৃ॥

ভাষ্যানুবাদ।—'ঋ' স্থানে 'র' পর বিশিষ্ট 'অণ্' কর্ত্তব্য হইলে, তাহার কোন বিশেষ না বলাতে, যাবতীয় 'ঋ'কারের ই নিবৃত্তি হইয়া, 'র' পর বিশিষ্ট 'অণ্' প্রাপ্তি হইবে। অতএব 'কর্ত্তৃ' শব্দ এবং 'হর্ত্তৃ' শব্দের অন্ত্যস্থিত 'ঋ'কারেরও নিবৃত্তি হইয়া অর্ বা আর্ প্রাপ্তি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধন্তু ষষ্ঠ্যধিকারে বচনাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ষষ্ঠী বিভক্তির অধিকারে, এই (সূত্র) বচন করাতে, ইহা সিদ্ধই আছে। *

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ। কথম্। ষষ্ঠ্যধিকারে ইমে যোগাঃ কর্ত্তব্যাঃ। একস্তাবৎ ক্রিয়তে। তত্রৈবেমাবপি যোগৌ ষষ্ঠ্যধিকারমনুবর্ত্তিষ্যেতে। অথবা ষষ্ঠ্যধিকারে ইমৌ যোগাবপেক্ষিষ্যামহে॥ অথবেদং তাবদয়ং প্রষ্টব্যঃ। সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োর্গুণো ভবতীতি। ইহ কস্মান্ন ভবতি। যাতা। বাতা। ইদং তত্রাপেক্ষিষ্যতে। ইকো গুণবৃদ্ধী ইতি॥ যথৈব তর্হি ইদং তত্রাপেক্ষিষ্যতে। এবমিহাপি তদপেক্ষিষ্যামহে। সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োরিকো গুণবৃদ্ধী ইতি॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবৎপতঞ্জলি-বিরচিতে ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে
প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে তৃতীয়মাহ্নিকম্॥

ভাষ্যানুবাদ।—'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্র করিলেও এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। কিরূপে?

এই যোগ অর্থাৎ সূত্রসমূহ ষষ্ঠীবিভক্তির অধিকারে করা হইবে। একটী ('উরণ-রপরঃ' সূত্র) ত 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' সূত্রের অধিকারে করাই হইয়াছে। সেই স্থলে এই যোগ অর্থাৎ সূত্র ('ইকো গুণবৃদ্ধী' এবং 'ইগ্ যণঃ সংপ্রসারণম্') দুইটীও করিয়া ষষ্ঠীর অধিকারকে অনুবৃত্তি করা হইবে। অথবা সেই 'ষষ্ঠী স্থানে

যোগা' সূত্রের ষষ্ঠীর অধিকারে আমরা, এই সূত্রদ্বয়েরও ব্যাখ্যা করিবার জন্য, অপেক্ষা করিব। তাহা হইলে কুত্রাপি কোনও দোষ হইবে না (১)।

অথবা এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,—'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে যে গুণ হয়, তাহা 'যাতা' 'বাতা' প্রভৃতি স্থলে, 'যা' ধাতু এবং 'বা' ধাতুর পরে আর্ধ ধাতু বর্ত্তমান সত্ত্বেও কেন 'আ'কারের গুণ হয় না ?

ইহার উত্তর এই যে,—সেই স্থলে ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রে), 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রের অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলেই 'যাতা' 'বাতা' ইত্যাদি স্থলে, 'যা' এবং 'বা' ধাতু ইগন্ত না হওয়ায় গুণও প্রাপ্তি হইবে না। অতএব কোন দোষও হইবে না।

তবে যেমন নাকি সেখানে ইহার ('ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রের) অপেক্ষা করা হইবে, সেইরূপ, এখানেও তাহার ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রের) অপেক্ষা করা হইবে। অতএব উভয় সূত্র একত্র মিলিয়া এইরূপই অর্থ হইবে যে, সার্বধাতুক বা আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, যদি কোথাও গুণ হয়, তবে তাহা 'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রের সহিত মিলিত হইয়াই হয়।

শ্রীমৎভগবৎপতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের
প্রথমপাদের তৃতীয় আহ্নিকানুবাদ সমাপ্ত।

---

(১) 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের উনপঞ্চাশৎ সংখ্যক সূত্র, আর 'উরণ্রপরঃ' তাহার দুই সূত্র পরে অর্থাৎ একপঞ্চাশৎ সূত্র বলিয়া, উহার অধিকারে পড়িয়াছে ; কিন্তু 'ইকো গুণবৃদ্ধী' তৃতীয় সূত্র বলিয়া অনেক পূর্ব্বে, আর 'ইগ্‌যণঃ সংপ্রসারণম্' সূত্র, উহার চারি সূত্র পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চচত্বারিংশ সূত্র হইলেও অর্থ করিবার সময়, এই সকল সূত্র, 'ষষ্ঠী স্থানে যোগা' সূত্রের অধিকারে লইয়া গিয়া অর্থ করিব, তাহা হইলেই কোনও দোষ থাকিবে না। কারণ; এক্ষণে সূত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে ;—'ইকো গুণবৃদ্ধী' সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। 'ইগ্‌যণঃ সংপ্রসারণম্' ১।১।৪৫. (যণের স্থানে যে ইক তাহার সংপ্রসারণ সংজ্ঞা হয়)। 'উরণ্‌ রপরঃ' ১।১।৫২ ('ঋ' স্থানে যে 'অণ্' তাহা 'র' পর বিশিষ্ট হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়।)

অথ চতুর্থ আহ্নিকঃ।

ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে ।১।১।৪।

ন ।১°। ধাতুলোপে ।৭°। আর্ধধাতুকে ।৭°।

ধাতুর অংশের লোপনিমিত্তক-আর্ধধাতুক পরে থাকিলে, 'ইক্'এর গুণও হয় না এবং বৃদ্ধিও হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—ধাতুগ্রহণং কিমর্থম্। ইহমাভূৎ। লূঞ্। লবিতা। লবিতুম্। পূঞ্। পবিতা। পবিতুম্।

আর্ধধাতুক ইতি কিমর্থম্। ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি।

কিং পুনরিদমার্দ্ধধাতুকগ্রহণং লোপবিশেষণম্। আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে সতি যে গুণবৃদ্ধী প্রাপ্নুতস্তে ন ভবত ইতি। আহোস্বিদ্‌গুণবৃদ্ধিবিশেষণ-মার্ধধাতুকগ্রহণং ধাতুলোপে সত্যার্ধাতুকনিমিত্তে যে গুণবৃদ্ধি প্রাপ্নুত স্তে ন ভবত ইতি।

কিং চাতঃ। যদিলোপবিশেষণম্। উপেদ্ধঃ। প্রেদ্ধঃ। অত্রাপি প্রাপ্নোতি। অথ গুণবৃদ্ধিবিশেষণম্। ক্নোপযতীত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে' এই সূত্রে, 'ধাতু' এই শব্দটি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? যদি 'ধাতু' গ্রহণ না করা যাইত, তবে ধাতুর লোপ ভিন্ন যে কোন প্রকারের লোপ হইলেই গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না; সুতরাং 'লূঞ্' ধাতুর, কেবল উভয়পদী-সম্পাদনার্থ যে 'ঞ' অনুবন্ধ করা হইয়াছে, সেই 'ঞ'র লোপ হইলেই গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, অতএব 'লূ' ধাতুর উকারের গুণ হইয়া 'লবিতা' 'লবিতুম্' ইত্যাদি প্রয়োগও সিদ্ধ হইত না। অথবা 'পূঞ্' ধাতুরও 'পবিতা,' পবিতুম্' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইত না।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রে 'আর্ধকধাতুক' শব্দ কি জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে?

'ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি' (তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া বৃষভ, অতিশয় ধ্বনি করিয়া থাকে) এই স্থানে, 'রোরবীতি' শব্দে, 'রু' ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় করিলে, 'যঙন্ত রুরুয় ধাতুর 'য'কার লোপ প্রযুক্ত, ধাত্বংশ লোপ হইলেও, আর্ধধাতুক-নিমিত্তক-লোপ না হওয়াতে এবং তদনন্তর-বিধেয় 'তিপ্' প্রত্যয়, 'আর্ধধাতুক' না হইয়া সার্বধাতুক হওয়াতে; তন্নিমিত্তক (সার্বধাতুক গুণ

হইলেও আর্ধধাতুক নিমিত্তক) গুণ না হওয়াতে, এই স্থলে, গুণের বা বৃদ্ধির নিষেধ হইল না, অর্থাৎ 'রু'র গুণই হইয়া 'রোরবীতি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইল।

পুনঃ জিজ্ঞাসা এই যে,—এই সূত্রে যে 'আর্ধধাতুক' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা কি লোপেরই বিশেষণ হইবে? অর্থাৎ এইরূপ অর্থ হইবে যে, আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলে, যেখানে যে গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্তি আছে, তাহা হইবে না?

অথবা গুণবৃদ্ধির বিশেষণবিশিষ্ট আর্ধধাতুক গ্রহণ করিব? অর্থাৎ যে কোন কারণে ধাত্বংশের লোপ হইলেই, আর্ধধাতুক-নিমিত্তক যে গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্তি হইত, তাহা হইবে না?

আচ্ছা, যদি লোপেরই বিশেষণ করি, তাহাতেই বা কি হইবে?

উপ পূর্বক এবং প্র পূর্বক 'ইন্ধী' ধাতুর 'ক্ত' প্রত্যয় করিলে, ক্ত প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎ হইলে, 'অনিদিতাং হল উপধায়া ক্ঙিতি চ।৬।৪।২৪ (হলন্ত ইকার ইৎ বিহীন যে অঙ্গ, তাহার উপধাভূত 'ন'কারের লোপ হয়, ককার বা ঙকার ইৎ পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে 'ন' কারের লোপ হইলে, আর্ধধাতুক নিমিত্ত গুণ না হওয়াতে গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ হইবে না।

অনন্তর গুণবৃদ্ধিরই বিশেষণ করিব?

তাহা হইলেও 'ক্নূঞ' ধাতুর উত্তর 'ণিচ্' প্রত্যয় করিলে, তৎস্থানে 'পুক্' আগম হইলে, 'পুক্' অন্তের ধাতু সংজ্ঞা হওয়াতে, 'পূ' র উকার ধাত্বংশ লোপ হওয়াতে, 'ক্নূ' উকারের 'গুণ' হইবে না; সুতরাং 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না। গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—যথেচ্ছসি তথাস্তু॥ অস্তু লোপবিশেষণম্॥ কথম্ উপেদ্ধঃ প্রেদ্ধঃ ইতি॥

বহিরঙ্গো গুণোঽন্তরঙ্গঃ প্রতিষেধঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

যদ্যেবং, নার্থো ধাতুগ্রহণেন। ইহ কস্মান্ন ভবতি। লূঞ্। লবিতা। লবিতুম্।

আর্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। ন চৈষ আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তো লোপঃ।

বঙ্গানুবাদ।—যেমন ইচ্ছা কর, তেমনই হউক্। হউক্ তবে লোপেরই বিশেষণ?

তবে 'ইন্ধী' ধাতুর 'ন'কার লোপ হইয়া 'ইদ্ধঃ' হইলে, 'উপ' উপসর্গের সহিত

মিলিত হইলে,'আদ্‌গুণঃ' সূত্রানুসারে, 'উপ' এবং 'প্র' উপসর্গের 'অ'কারের পরে 'ইন্ধ'র ইকার থাকাতে, কিরূপে 'গুণ' হইবে এবং 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে? এই স্থলে দোষ হইবে না ; যেহেতু,—যখন 'ইন্ধ' ধাতুর 'ন'কারের লোপ হইয়া 'ক্ত' প্রত্যয় যোগ হইবে, তখন, 'উপ' বা 'প্র' উপসর্গ সংযোগ না হওয়াতে, 'আদ্‌গুণঃ' ৬।১।৮৭। (অ বর্ণের পরে 'অচ্' থাকিলে, পূর্ব্বাপরের স্থানে গুণ-রূপ এক আদেশ হয়, সংহিতা-বিষয়ে) সূত্রানুসারে গুণ-কার্য্য বহিরঙ্গ এবং গুণবৃদ্ধির নিষেধকার্য্য অন্তরঙ্গ হইবে। এক্ষণে, 'অন্তরঙ্গ-কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গকার্য্য অসিদ্ধ হয়,' এই পরিভাষানুসারে, বহিরঙ্গগুণ-কার্য্য অসিদ্ধ হইবে। সুতরাং যখন অন্তরঙ্গ নিষেধ বহিরঙ্গগুণ-কার্য্যকে দেখিতেই পাইবে না। অতএব পরে গুণও হইয়া যাইবে। 'উপেদ্ধঃ' 'প্রেদ্ধঃ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

যদি এইরূপই হয়, তবে 'ন ধাতু লোপ আর্দ্ধধাতুকে' সূত্রে, 'ধাতু' শব্দ গ্রহণের কোনও প্রয়োজন নাই?

যদি বল যে, 'ধাতু' গ্রহণ না করিলে,'লূঞ' ধাতুর 'ঞ'কার ধাত্বংশ না হইলেও ত তাহার লোপ হওয়াতে, 'লূ' ধাতুর ঊকারের গুণও হইবে না, 'অব্' আদেশ হইয়া 'লবিতা' 'লবিতুম্' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না?

এই স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলেই, গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু এই স্থলে, 'ঞ' লোপ, আর্দ্ধধাতুক-নিমিত্তক হয় নাই। অতএব কোন দোষও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা পুনরস্তু গুণবৃদ্ধিবিশেষণম্। ননু চ ক্নোপয়তীত্যত্রাপি প্রাপ্নোতীতি। নৈষ দোষঃ। নিপাতনাৎ সিদ্ধম্॥ কিং নিপাতনম্? *চেলে ক্নোপেরিতি পরিগণনং কর্ত্তব্যম্।*

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা 'আর্দ্ধধাতুক' শব্দ, পুনশ্চ গুণবৃদ্ধিরই বিশেষণ হউক। যদি চ পূর্ব্বোক্ত 'ক্নোপয়তি' শব্দে, 'পুক্'এর 'উ'কার লোপনিমিত্তক, 'ক্নূ'র 'উ'কারের গুণ নিষেধ হইয়া, 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না, এইরূপ দোষ বল, তবে তাহাতেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, তাহাও নিপাতনেই সিদ্ধ হইবে।

কি সেই নিপাতন?

'চেলে ক্নোপেঃ' ৩।৪।৩৩। এই সূত্রে যে হেতু সূত্রকার 'ক্নোপ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই জ্ঞাপকানুসারেই এইরূপ জানিতে হইবে যে, 'ক্নূঞ্' ধাতুর 'উ'কারের গুণ নিপাতনেই সিদ্ধ হইবে। তবেই 'ক্নোপয়তি' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

এক্ষণে, কোন্ কোন্ স্থলে গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয়, তাহার গণনা করা কর্তব্য।

বার্ত্তিকামূলম্।—যঙ্‌যক্‌ক্যবলোপে প্রতিষেধঃ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—যঙ্, যক্, ক্যপ্ এবং বকার লোপবিষয়ে, গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়া থাকে। *

ভাষ্যমূলম্।—যঙ্‌যক্‌ক্যবলোপে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। যঙ্। বেভিদিতা। মরীমৃজঃ॥ যক্। কুসুভিতা। মগধকঃ॥ ক্য। সমিধিতা। দৃষদকঃ॥ বলোপে। জীরদানুঃ॥ কিং প্রয়োজনম্॥

বঙ্গানুবাদ।—যঙ্, যক্, ক্যপ্ এবং বলোপবিষয়ে, গুণবৃদ্ধির প্রতিষেধ বলিতে হইবে।

যঙন্তের দৃষ্টান্ত যথা ;—'ভিদির' বিদারণে ধাতু। তদুত্তর যঙ্ প্রত্যয় করিলে বেভিদ্য হইলে পরে, 'তৃচ্' প্রত্যয় করিব। এক্ষণে 'যস্য হলঃ' ।৬।৪।৪৯। (হল্ এর পরস্থিত 'য'কারের লোপ হয়, আর্দ্ধধাতুক পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে 'য'কারের লোপ হইলে, সেই ধাত্বংশ 'য'কারের লোপ নিমিত্ত 'ভিদ্'এর 'ই'কারের গুণ নিষেধ হইল। এইরূপ 'মৃজ্' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'মরিমৃজঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। ইহা, 'যঙোচিচ' ।২।৪।৭৪। (অচ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে, 'যঙ্'এর লুক্ হয়, এই সূত্রে 'চ'কার গ্রহণ করাতে তাহা বিনাও লুক্ হয়) সূত্রানুসারে, 'যঙ্'এর লুক্ হইয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।

'যক্' লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'কুসুভ' ও 'মগধ' ধাতু কণ্ড্বাদিগণ-পঠিত। কণ্ড্বাদিভ্যো যক্ ।৩।১।২৭। এই সূত্রানুসারে, কণ্ড্বাদিগণ-পঠিত, 'কুসুভ'ও 'মগধ' ধাতুর উত্তর, 'যক্' প্রত্যয় করিয়া, 'সনাদ্যন্তাধাতবঃ' ।৩।১।৩২। (সন্ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, 'কমের্ণিঙ্' স্থিত ণিঙন্ত প্রত্যয় অন্তে আছে যাহাদের, তাহাদের ধাতু সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে, ধাতু সংজ্ঞা হইলে, তদুত্তর 'ণ্বুল্‌তৃচৌ' সূত্রানুসারে 'তৃচ্' এবং 'ণ্বুল্' প্রত্যয় করিব। এক্ষণে 'যস্য হলঃ' সূত্রানুসারে 'য'কারের লোপ হইলে, ধাত্বংশলোপনিমিত্তক গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না, সুতরাং 'তৃচ্' প্রত্যয়ে 'কুসুভিতা' এবং 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে, 'মগধকঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ক্য লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—সমিধ এবং দৃষদ শব্দের উত্তর 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্'। (১) সূত্রানুসারে, ইচ্ছার্থে 'ক্যচ্' প্রত্যয় করিলে, তাহার ধাতু সংজ্ঞা করিবার

(১) ৩।১।৮ সূত্র। যদি ইচ্ছার্থক কর্ম্ম পদ; ইচ্ছার্থ কর্ত্তার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া সুবন্ত অর্থাৎ নাম হয়, তবে তাহার উত্তর ইচ্ছার্থে ক্যচ্ প্রত্যয় হয়।

পরে, 'ক্ষ্যস্যবিভাষা'। (১) সূত্রানুসারে 'য'কারের লোপ করিলে, ধাত্বংশলোপ-নিমিত্তক গুণ-বৃদ্ধি না হইয়া 'তৃচ্' প্রত্যয়ে 'সমিধিতা' এবং 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে, 'সমিধক' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

ব লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'জীব' ধাতুর উত্তর উণাদিবিহিত 'রদানুক্' প্রত্যয় করিলে, 'লোপোব্যোর্বলি'। (২) সূত্রানুসারে, 'ব'কারের লোপ হইলে, সেই ধাত্বংশ 'ব'কারের লোপনিমিত্তক, (আর্ধধাতুক পরে থাকিলেও) গুণ হইবে না ; সুতরাং 'জীরদানু' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

ধাত্বংশ লোপ হইলে কোন্ কোন্ স্থলে, আর্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হয় না, তাহার গণনা করিবার প্রয়োজন কি? অর্থাৎ যাবতীয় স্থলেই কেন ধাত্বংশ লোপে, গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয় না?

তাহা হইলে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে দোষ ঘটিবে। —

বার্ত্তিকমূলম্।—শ্নম্লোপসিব্যনুবন্ধলোপেষু প্রতিষেধার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—শ্নম্ লোপে, স্রিব্ ধাতুর অংশ লোপে এবং অনুবন্ধলোপে গুণবৃদ্ধি নিষেধের প্রতিষেধ হইবার জন্য, পরিগণন করা কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—শ্নম্লোপে স্রিব্যনুবন্ধলোপে চ প্রতিষেধো ন ভবতীতি।

শ্নম্লোপে। অভাজি। রাগঃ। উপবর্হণম্। স্রিবেঃ। আস্রেমাণম্।

অনুবন্ধলোপে। লূঞ্। লবিতা। লবিতুম্।

ভাষ্যানুবাদ।—শ্নম্ লোপে, স্রিব্ ধাতুর অংশ লোপে এবং অনুবন্ধ লোপে, যাহাতে গুণবৃদ্ধির প্রতিষেধ না হয়, অর্থাৎ গুণবৃদ্ধিই হয়, সেই জন্য পরিগণন করা কর্ত্তব্য।

'শ্নম্' লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'ভন্জ' ধাতুর 'ন'কার, অর্থাৎ 'শ্নম্'এর লোপ হইলেও, অকারের বৃদ্ধি হইয়া আকার হয়, এইরূপে 'অভাজি' প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। 'রন্জ' ধাতুর 'শ্নম্' (নকার) লোপ হইলেও 'রাগ', প্রয়োগ 'অ'কারের বৃদ্ধি হওয়াতেই হইবে।

'উপ' পূর্ব্বক 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিলে, 'ইদিতো নুম্ ধাতোঃ'

---

(১) ৬।৪।৫০। সূত্র। হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের পরস্থিত ক্যচ্ এবং ক্যঙের লোপ হয় বিকল্পে, আর্ধধাতুক পরে থাকিলে।

(২) মকার এবং বকারের লোপ হয়, 'বল্' প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে থাকিলে।

৭।৪।৪৮ সূত্রানুসারে, ইকারের স্থানে 'শ্নম্' হইলে, 'অচ্যনিটি' (অচ্ পরে থাকিলে 'ইট্' বিশিষ্ট ভিন্ন, অন্য কোন ধাতুর 'শ্নম্'এর লোপ হয় ;) কিন্তু তথাপি 'ঋ' কারের গুণ হইয়া 'উপবর্হণম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

'স্রিব ধাতুর দৃষ্টান্ত যথা ;—'আস্রেমাণম্' শব্দ বেদে পঠিত হইয়াছে। 'নঞ্' পূর্ব্বক 'স্রিব' ধাতু 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া, 'ব'কারের লোপ হইলেও ধাত্বংশ লোপ-নিমিত্তক গুণনিষেধ না হইয়া 'ই'কারের গুণ হওয়াতে, 'আস্রেমাণম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

অনুবন্ধ লোপের দৃষ্টান্ত যথা ;—'লূঞ্' ধাতুর 'ঞ্'ধাত্বংশ লোপ হইলেও উকারের গুণ হইয়া, 'লবিতা,' 'লবিতুম্' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। পরিগণন না করিলে, এই সকল দোষ হইত।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পরিগণনং ক্রিয়তে। স্যদঃ। প্রশ্রথঃ হিমশ্রথ ইত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি।

বক্ষ্যত্যেতৎ। নিপাতনাৎস্যদাদিষ্বিতি। ততর্হি পরিগণনং কর্ত্তব্যম্।

ন কর্ত্তব্যম্।

ইগ্লোপে কস্মান্নভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পরিগণন করা যায়,তবেও ত 'স্যদঃ,' 'প্রশ্রথঃ,' 'হিমশ্রথঃ' (১) ইত্যাদি স্থলেও, গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না।

এই সকল স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, স্যদাদিতে, নিপাতনের দ্বারা প্রয়োগসিদ্ধি বলা হইবে।

তাহা হইলে তবে, পরিগণন করাই কর্ত্তব্য ?

তাহাও কর্ত্তব্য নহে।

তবে 'শ্নম্'এর লোপ হইলে, কেন 'গুণ' বা 'বৃদ্ধির নিষেধপ্রাপ্তি হইবে না ?

বার্ত্তিকমূলম্।—ইক্প্রকরণান্মূলোপে বৃদ্ধিঃ।

---

(১) স্যন্দূ (প্রস্রবণে) ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া, শ্নম্ (নকারের) লোপ করিলে, 'স্যদঃ' এবং 'প্র' পূর্ব্বক শ্রন্থ (শ্রন্থগ্রন্থ সন্দর্ভে) ধাতু আর 'হিম' শব্দ পূর্ব্বক 'শ্রন্থ' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় করিলে (শ্নম্ লোপ হইয়া) 'প্রশ্রথঃ' 'হিমশ্রথঃ' প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ইহারা 'ধত্ত' লোপাদি গণনার মধ্যে পতিত না হওয়াতে, গুণবৃদ্ধির নিষেধও প্রাপ্তি হইবে না।

গুরুর প্রয়োজন

(শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ)

পরকাল চিন্তা করে না, এমন মনুষ্য নাই। মৃত্যুর পর [illegible] চিন্তা সকলকেই ব্যাকুল করে। পরকাল নাই, এ কথা দৃঢ়রূপে বলিতে কেহ পারে না এবং পরকাল আছে, ইহা ঠিক ধারণা করা অতি অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটে। প্রায়ই সন্দেহ একেবারে দূর হয় না। পরকাল চিন্তা করিতে ঈশ্বর চিন্তা আসে, ঈশ্বর আছেন কি না—এ সম্বন্ধে নানা বাদানুবাদ মনে উঠিতে থাকে। একেবারে নাস্তিক প্রায় কেহ হয় না এবং ঠিক আস্তিকও অতি বিরল। এখানেও সন্দেহ। নাস্তিকেরা বলেন, ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ পাই না। বিষয় দুজ্ঞেয়, কালে কেহ প্রমাণ পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রমাণ নাই বলিয়া, নিশ্চিন্ত হওয়াও কঠিন। যিনি প্রমাণাভাব বলেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, একবার কল্পনা করুন, কিরূপ প্রমাণ পাইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন, তিনি সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না। অনেকেই চিন্তা না করিয়া বলিয়া দেন, যেমন চুণে হলুদে মিশাইলে লাল হয়, তাহা মিশাইয়া প্রমাণ করা যায়, আগুনে পোড়ে, এরূপ যদি প্রমাণ পাই, তাহা হইলে বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিলেই জড় হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বুঝায়, জড় পরীক্ষায়, জড় সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ পায়, সে প্রমাণে যাহা চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করি, তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না। জড় সম্বন্ধে কোন সত্যের প্রমাণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর নয়। দেখিলাম, বৈদ্যুতিক শক্তি বলে সূচিকা নড়িল। বুঝিলাম বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা সূচিকা নড়ে। সূচিকা কি, জানি,—বৈদ্যুতিক শক্তি কি, তাহাও কতক বুঝিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন কিছু জানা নাই। যদি বলেন, ঈশ্বরকে দেখিলে বিশ্বাস করি, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, দেখা কাহাকে বলে? চোখে দেখিয়া? স্পর্শে? বা কিরূপ দেখিলে তিনি বিশ্বাস করেন? এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত আছে, চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত। কিন্তু ঈশ্বর যদি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তিনি কিরূপে বুঝিবেন,—তিনি ঈশ্বর? কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার ঠিক ধারণা হইবে?

[illegible] অসীম, অনন্ত বলিয়া ঈশ্বরের উপাধি দিয়া থাকি। যাহা অনন্ত তাহা চক্ষু বা স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধি হইবে, এ কথা যুক্তিতে [illegible] বিরুদ্ধ। তবে [illegible] রূপ প্রমাণ আবশ্যক ? যদি কল্পনা করেন যে, কল্য টেলিগ্রাফ আসুক যে, তাঁহার পুত্রকে রুষেরা "জার" (Czar) পদে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর মানিবেন। এরূপ অসম্ভব ঘটনা সংঘটন হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হইল না। কার্য্যকারণশৃঙ্খলে এরূপ ঘটনা সংবদ্ধ ছিল, তাহা অনায়াসে যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ হইবে। যেহেতু অকারণে রুষেরা তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবে না, কার্য্য হইলেই তাহার কারণ থাকিবে। মৃত ব্যক্তি জীবিত হইয়া আসিলেও, প্রথমতঃ সে সত্য মরিয়াছিল কি না, তাহার প্রতি সন্দেহ, যাহারা তাহাকে মরিতে দেখিয়াছিল, তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস, স্বয়ং যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, যে, এক ব্যক্তি মরিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, তখনও তাহার মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে যে, হয় তো মরে নাই। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যাহাকে মৃত বলিয়া সকলে জানিয়াছিল, যাহাকে গোর দিতে অনেকে দেখিয়াছিল, শেষ প্রমাণ হইল যে, সে মরে নাই। চট্টক নভেলে পিতামাতা আত্মীয় সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা অনেক আছে। পুরাবৃত্তে হঠাৎ একজনকে রাজা নির্ব্বাচন করার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঈশ্বরসাহায্য ব্যতীত রাজা হওয়াও অনেক স্থলে কল্পিত হইয়াছে। যেমন আরব্যোপন্যাসে "আবুহাসেন" একদিন বাদসাহ হইয়াছিল।

এইরূপ শত শত অসম্ভব কল্পনা ফলবতী হইলেও, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হইল না। যাত, ভেল্কী, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি যুক্তি আসিয়া, যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব অনুমিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভব করিয়া দিবে। শুনা যায়, একবার না কি জাহ্নবী জলশূন্য হইয়াছিল। এ ঘটনা ইতিহাসমূলক,—এ ঘটনার সম্বন্ধেও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। যদিও কোন্ নিয়মে ইহা হইয়াছিল, তাহা কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তথাপি যে, এই ঘটনায় "ঈশ্বরইচ্ছাই কারণ" এ কথা কেহ বলেন নাই। অজানিত প্রাকৃতিক ঘটনায় ইহা ঘটিয়াছে—ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত। যত প্রকার অলৌকিক কার্য্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হউক না, সকলেরই কারণ অনুসন্ধান করি। অদ্ভুত কোন স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইলে আমরা বলি, কোটী কোটী স্বপ্ন দেখি, তাহার মধ্যে একটা মিলিয়াছে, এই মাত্র। অসাধ্য রোগের আরোগ্য হেতু

বিশ্বাস, কোন অলৌকিক দর্শনের হেতু মস্তিষ্কের বিকার। এই বৈজ্ঞানিক সময়ে বৈজ্ঞানিক কারণে এই সকল কার্য্য হইয়াছে, ইহাই স্থির করা যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সন্দেহ ছিল, সেইরূপ সন্দেহই থাকে।

তার পর একরূপ প্রমাণ চাওয়া অসঙ্গত। ঈশ্বর তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল নন। যদি একরূপ প্রমাণ দিতে তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর নন। বরং যাঁহাদের কাছে তিনি একরূপ প্রমাণ দেন, তাঁহারা তাঁর ঈশ্বর। মোট কথা এই, বুদ্ধি দ্বারা একরূপ প্রমাণ কল্পিত হইতে পারে না, যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহা অসিদ্ধ, তাহা মানিব কেন? শাস্ত্র বলেন যে, মনোবুদ্ধির অগোচর ঈশ্বর, ভক্তের গোচর হন। শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করিয়া যে মহা-পুরুষ শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান করিয়াছেন,—তিনি বলেন, আমি ঈশ্বর পাইয়াছি। কেবল তিনি পাইয়াছেন, তাহা নয়, তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর-লুব্ধ ব্যক্তি মাত্রেই, নিঃসন্দেহ ঈশ্বরলাভ করিবে। দেখা যায়, সে মহাপুরুষ নিষ্কাম, অথচ সাধারণ সকাম ব্যক্তির ন্যায় দ্বারে দ্বারে এ কথা প্রচার করিয়া থাকেন। তর্কের নিমিত্ত, ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিলে, যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি অতি নির্ম্মল হইবেন, কল্পনা করা যায়। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে, যিনি ঈশ্বর আছেন, প্রচার করেন, তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। যাহার ঈশ্বরলাভ হইয়াছে, তাহার সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত। বাস্তবিক প্রচারকও সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়, ইহা শত পরীক্ষায় দেখা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই, এই মহাপুরুষ সমাধিস্থ হইয়া, সেই ভূত ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অনায়াসে জানিতে পারেন। ইহারও শত পরীক্ষায় শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরলব্ধ ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ আছে, সেই সকল লক্ষণ এই মহাপুরুষে প্রকাশ। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রমাণ পাইলাম, কিন্তু ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহা সাব্যস্ত করিবার বিশেষ বাধা জন্মিল। এক্ষণে সন্দিহানচিত্ত মনুষ্যের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? ঈশ্বর আছেন কি না, যাঁহার জানিবার সাধ, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? সদ্যুক্তি অবশ্য বলিবে, এই মহাপুরুষের আশ্রিত হও। যদি ঈশ্বর চাও, এই গুরুর আনুগত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। তিনি যাহা বলেন, তাহাই করো। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি কোন নীতিবিরুদ্ধ কথা বলেন না। যে সকল আচার অবলম্বন করিতে তিনি আদেশ দেন,

তাহাতে মানবহৃদয় অতি উচ্চ হয়। তিনি সত্যবাদী হতে বলেন, জিতেন্দ্রিয় হতে বলেন, হিংসাদ্বেষাদি পরিহার করিতে বলেন, নির্ম্মলচরিত্র ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বলেন, এবং দৃঢ় করিয়া বলেন, এই সকল অনুষ্ঠানে, নিশ্চয় ঈশ্বর লাভ হইবে। সত্য যিনি ঈশ্বর লাভ করিতে চান, তিনি এই গুরুকে শত প্রণাম করিয়া তাঁহার উপদেশমত ব্রতী হইবেন নিশ্চয়। গুরু বলেন, এইরূপ অনুষ্ঠানে তোমার সন্দেহ দূর হইবে, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন। গুরু বলেন, "আমার সন্দেহ তিনি দূর করিয়াছেন।"

সন্দিহানচিত্ত আপত্তি করিতে পারে, এ মহাপুরুষ অতি উচ্চ ব্যক্তি সত্য, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে ইনি তো ভ্রমে পড়েন নি? যেমন কি-না-কি একটা দেখিয়া লোকে বলে, ভূত দেখিয়াছে,—ইঁহার তো সে অবস্থা নয়? এ আপত্তির উত্তর একটী আছে,—মনোবুদ্ধির অগোচর পরমাত্মাকে আত্মার দ্বারা উপলব্ধি করাই সম্ভব। এই মহাত্মা আত্মাতে পরমাত্মা অনুভব করিয়াছেন। আমাদের অন্তরে যাহা হইতেছে, তাহা আমরা অনুভব করি এবং তাহা ভুল নয়। ক্রোধ হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি—ভুল নয়। দয়ার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি—ভুল নয়! তবে যে, গুরু বলিতেছেন, অসীম অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত, তিনি অনুভব করিয়াছেন, সত্য-সেবী মহাপুরুষের কি সেইটী ভুল? সন্দেহ নির্ম্মূল না হইতে পারে, কিন্তু এরূপ চিন্তায় সন্দেহের বেশী জোর থাকে না, ইচ্ছা আপনি উদয় হয়, এই মহাপুরুষের অনুসরণ করি। শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর লাভ হয়। ইনি বলেন, লাভ করিয়াছি। শাস্ত্র কত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রবাক্য ইঁহার জীবনে পরীক্ষিত। অতএব নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি বুঝিবে যে, গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত, আমার আর উপায় নাই।

ধ্রুবচরিত্র।

তৃতীয় অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(অমাত্যগণবেষ্টিত উত্তানপাদ আসীন)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। মহারাজ! মুনিপুত্রগণ

দাঁড়ায়ে দুয়ারে রাজদরশন হেতু।
রাজাজ্ঞা হইলে
আনয়ন করি হেথা।

উ। আন ত্বরা সম্মুখে আমার।

প্র। যথা আজ্ঞা, মহারাজ!

(প্রস্থান)

(ধ্রুব ও মুনিবালকগণের প্রবেশ)

১ম বা। জয় হোক! মহারাজের জয় হোক।

উত্তান। কহ হে বালকগণ!
কি হেতু আসিলে আজি রাজসভা মাঝে?

১ম বা। রাজ দরশন হেতু মহারাজ!

উত্তান। (স্বগতঃ) পাংশু আচ্ছাদিত অনল সদৃশ
কেবা এই শিশু শিশুদের মধ্যস্থলে?
যত কাছে আসে
তত প্রাণ করে আকর্ষণ।
নিরখি শিশুরে
নাহি জানি কেন প্রাণের ভিতরে
স্নেহের আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল।
ছায়াসম যেন কার মুখ পড়ে মনে;
কার মুখপ্রতিবিম্ব ইহা?
ঢল ঢল উজ্জ্বল নয়ন হেরি
যেন কার চক্ষু পড়ে মনে!
কার—ভাল মনে নাহি আসে।
আপনা আপনি ধায় বাহুদ্বয়
ধরিতে উহারে অঙ্কে
প্রাণ চাহে সম্ভাষিতে পুত্র বলি।
নাহি জানি কাহার কুমার এই শিশু।
(প্রকাশ্যে) কহ শিশু কিবা তব নাম?

ধ্রুব। ধ্রুব মম নাম।

উত্তান। (স্বগতঃ) শুনিয়াছি বীণার ঝঙ্কার,

নূপুর নিক্কণ;
কিন্তু শুনি নাই কভু
শিশুকণ্ঠে হেন সুমধুর ধ্বনি।
কহ শিশু, কিবা তব পিতৃনাম?

ধ্রুব। উত্তানপাদ।

উত্তান। কি কহিলে?—উত্তানপাদ! উত্তানপাদ।
কহ পুনঃ, না মানে প্রত্যয় মন—
কিবা তব পিতৃনাম?

ধ্রুব। সত্য মহারাজ! উত্তানপাদ মম পিতৃনাম।

উত্তান। (স্বগতঃ) আমিই কি তবে জনক ইহার?
না—না,—এও কি সম্ভবে।—
এক নামে দুই জন থাকিতে ত পারে!
অন্য প্রশ্ন করি,
সুধাই ইহার প্রসূতির নাম।
(প্রকাশ্যে) কহ শিশু! কিবা তব মাতৃনাম।

ধ্রুব। মা!

উত্তান। তাই ব'লে ডাক তাঁরে তুমি,
কিন্তু নাম কি তাঁহার?

ধ্রুব। "মা" "মা" ব'লে মাকে ডাকি;
"মা"ই আমার মায়ের নাম,
অন্য নাম নাহি জানি মার।

উত্তান। (স্বগতঃ) অতীব সরল শিশু!
সুধাই অন্য বালকেরে।
(প্রকাশ্যে) কহ শিশু, ধ্রুবের জননী নাম।

১ম বা। সুনীতি।

উত্তান। (স্বগতঃ) সুনীতি! সুনীতি!
আমার সেই নির্ব্বাসিতা, পতিব্রতা
সাধ্বী সুনীতিই জননী ইহার!
পড়ে মনে—পঞ্চবর্ষ আজি হইল বিগত
মৃগয়ায় গিয়াছিনু একদিন;

রজনীর সেই দারুণ দুর্যোগে
দেখা হ'ল সুনীতির সনে ;
যাপিনু যামিনী কুটীরে তাহার ;
এই সে সুন্দর শিশু ঔরসে আমার !
(প্রকাশ্যে) বৎস ! পিতা আমি তব ;
কোলে এস আনন্দ আমার,
কোলে এস প্রতিবিম্ব মোর,
চুমি তব ও চাঁদ বদন !

(ধ্রুবকে কোলে ধারণ)

(অন্তরাল হইতে সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। একি রাজা !
কাহার সন্তান কোলে ?
ধ্রুব নাকি এর নাম ?
(কিয়ৎক্ষণ পরে) কি দেখিছ রাজা
মুখপানে চাহি স্তম্ভিত নয়নে ?
অন্তরালে থাকি শুনিয়াছি সব।
নির্বাসিতা দাসী পুত্র আজি রাজ অঙ্কে ?
সোণার উত্তমে ফেলি
স্থাপিয়াছ অঙ্কে কি না দাসীর সন্তানে ?
রাজ অঙ্ক আজি করিলে ঘৃণিত ?
ছি ছি ! রাজা ! উত্তমে আমার
না করিও কোলে আর !

(রাজার ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া দেওন)

ধ্রুব। একি পিতা !
কোল থেকে কেন নামাইলে ?
এই পুত্র বলি লইলে যে কোলে—
আবার নামালে কেন ?

সুরু। ও রে রে নির্ব্বোধ শিশু !
ফিরে চা আমার পানে।
চেয়ে দেখ — কে আমি সম্মুখে তোর।

রাজ অঙ্কে চাহ বসিবারে ?
লালসা তোমার রাজসিংহাসনে ?
কেবা আমি নাহি জান তুমি ?

ধ্রুব। ও গো, নাহি জানি কেবা তুমি।

সুরু। নাহি জান কেবা আমি ?
শুন শিশু—রাণী আমি রাজ্যেশ্বরী ;
রাজা না থাকিলে,
এ রাজ্য আমার সন্তান পাবে।

ধ্রুব। পাব না কি পিতৃকোলে বসিতে গো তবে ?

সুরু। ওরে মূর্খ !
নাহি জান কার গর্ভে ধোরেছ জনম ?
নাহি জান কে তোমার মা ?

ধ্রুব। মা—মা।

সুরু। ওরে মূর্খ শিশু।
মা তোর নির্ব্বাসিতা পাপিষ্ঠা সুনীতি,
রাজা যারে দিয়াছেন বনবাস।
নির্ব্বাসিতা দাসী পুত্র তুই,
নাহি অধিকার তোর রাজসিংহাসনে,
বুঝিলি এখন ?

উ। ক্ষান্ত হও রাণী।

সুরু। ক্ষান্ত হও রাজা !
বুঝাইয়া দিই অগ্রে নির্ব্বোধ বালকে।
তাই বলি, ওরে শিশু,
ফিরে যা আপন কুটীরে।

ধ্রুব। ভাই। তোরা আমাকে কোথা নিয়ে এলি ? ভাই। আমি কি দোষ কোরেছি ? রাণী আমাকে বোক্‌ছে কেন ? ভাই ! আমার মাথা ঘুরছে ; আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না, আমার কি হোচ্ছে। আমি কোথায় এসেছি। মা ! মা ! ভাই ! আমার মা কোথা ? মা কোথা ? আমি আর দাঁড়াতে পাচ্চি না, আমার বুকের ভেতর কেমন কোচ্চে। আমার বুক যেন ভেঙ্গে গেল।

(বক্ষে হস্ত দিয়া উপবেশন)

১ম বা। ধ্রুব। চোলে এস ভাই, আমরা বাড়ী যাই; আর এখানে থাক্‌বো না।

সুরু। ওরে দুষ্ট শিশু।
মায়ার রোদন কেন করিতেছ
ছল করি বসিয়া পড়িলে?
সিংহাসনে এতই লালসা?
উঠে যা—উঠে যা ত্বরা।

উ। কি কব—কি কব বাণি!
এত অপমান
নাহি কর সরল বালকে
মিষ্টভাবে বুঝাও উহারে।

সুরু। নীরবে তিষ্ঠহ রাজা।
ওরে ধ্রুব! শোন মন দিয়া—
যদি সিংহাসনে তোর এতই লালসা
বনে বনে কান্তারে কান্তারে,
মরুভূমিমাঝে কিম্বা পর্ব্বতকন্দরে,
দিবানিশি অনাহারে অনিদ্রায়
হরির সাধনা কর।
তুষ্ট যদি হন হরি সাধনায় তোর
আসিয়া দিবেন দেখা,
এই বর চাহিবি তখন—
"হরি ইহ জন্ম ঘুচাও আমার,
জন্ম দেহ সুরুচি জঠরে।"
জন্ম যদি নিতে পার জঠরে আমার,
আকাঙ্ক্ষা করিও তবে রাজসিংহাসনে
উত্তমের পার্শ্বে স্থান পাইবি তখন,
নতুবা মনের আশা মিশাও মনেতে।

উ। ছি ছি রাণি!
কলঙ্ক রাখিলে আজি জগৎ ভিতরে!
কলঙ্ক নিজের নামে

কলঙ্ক আমার নামে,
কলঙ্কে পুরিল দেশ,
বিমাতা আদর্শ করিলে নিজেরে।

সুরু। কেন বৃথা কথা কও রাজা। উন্মাদের প্রায়?

উ। হায়! কত কাল সব
রমণীর তিরস্কার!
(কিয়ৎক্ষণ পরে) কাহারও নাহিক দোষ
দোষ আপনার।
নিজে স্ত্রৈণ আমি;
ইচ্ছা হয় নিবারি রাণীরে
কিন্তু নাহি পারি,
কি এক আশঙ্কা হয় অন্তরে উদয়।
শিশু প্রতি হেন কঠোরতা
না পারি দেখিতে,—
না পারি তিষ্ঠিতে আর হেথা।

(বেগে প্রস্থান)

ধ্রুব। পিতা! পিতা!
কোথা যাও—কোথা যাও?
আমি যাব।

(গমনোদ্যত)

সুরু। (বাধা দিয়া) কোথা যাও—
কোথা যাও দুষ্ট শিশু?
যাও ত্বরা আপন আলয়ে।

১ম বা। ধ্রুব! আয় ভাই—আয় আমরা বাড়ী যাই। আমরা তোকে তোর মার কাছে নিয়ে যাই।

ধ্রুব। ফিরে যা ফিরে যা তোরা, আমি যাব নারে ভাই।
মাকে তোরা বলিস্ গিয়ে ধ্রুব তোমার বেঁচে নাই॥
মা যখন কাঁদ্‌বে ধ্রুব বোলে,
ভাস্‌বে যখন নয়নজলে,

মুছিয়ে দিও মার মুখ অঞ্চলে, কাঁদিতে দিওনা মাকে ভাই,
বোলো মাকে হরি সাধনায় যাই ॥

(বালকগণ সহ ধ্রুবের প্রস্থান)

সুরু। (স্বগতঃ) আরে রে নির্ব্বোধ।
সিংহাসনে চাও বসিবারে ?
রাজসিংহাসনে তুই বসিবি যদ্যাপি,
মা তোর নির্ব্বাসিতা কেন হোল তবে ?
দাসীপুত্রে নাহি শোভে রাজসিংহাসন।
পুত্রস্নেহে রাজা বিগলিত হৃদি,
হইয়াছে কিছু ক্ষুণ্ণ মোর প্রীতি,
কিন্তু, কতক্ষণ রবে সেই ভাব ?
কাষ্ঠপুত্তলিকাসম রাজা হস্তে মোর। –
ইঙ্গিতে ফিরাই তারে !
বসাইব সিংহাসনে উত্তমে আমার,
সেই হবে রাজা, আমি রাজমাতা।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর।

সুনী। রবি অস্ত যায,
রজনীর ছায়া নামে ধীরে ধীরে,
একটী দুইটী ফুটিযাছে তারা,
এখনও ধ্রুব তারা মোর
কেন নাহি এল ফিরে ?
ব্যাকুল হইল প্রাণ,
স্থির না থাকিতে পারি,
যাই—অগ্রসর হোয়ে দেখি,
ধ্রুব চাঁদ আসে কি না আসে।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর).

ওকি ! দূর তরুতলে
শিশুগণ আসে ধ্রুবে ধরাধরি করি ;
হেন দশা কেন হইল বাছার ?
কেহ কি মেরেছে বাছায় ?
যাই কোলে কোরে লয়ে আসি।

(প্রস্থান)

(ধ্রুবকে কোলে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সুনী। বাবা ধ্রুব ! কথা কওনা বাবা ! আজ মুখ খানি এত ভারি হোয়েছে কেন ? চোক দিয়ে জল পোড়্‌ছে কেন ? হ্যাঁ বাছা, তোরা বোলতে পারিস্, ধ্রুব আমার অমন কোরে আছে কেন ?

১মবা। ওগো, ধ্রুব আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় গিয়েছিল।

সুনী। কোথায় ?

১মবা। রাজসভায়।

সুনী। কোন্ রাজসভায় ?

১মবা। মহারাজ উত্তানপাদের রাজসভায়।

সুনী। কি ! মহারাজ উত্তানপাদের রাজসভায় ! তারপর ?

১মবা। একজন মেয়ে মানুষ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে আর ধ্রুবকে খুব বকতে লাগল, রাজা ধ্রুবকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন।

সুনী। তারপর ?

১মবা। ধ্রুব সেই অপমানে কাঁদতে লাগলো, আস্‌তে চায় না, আমরা কত কোরে ধরাধরি কোরে এনেছি।

(বালকগণের প্রস্থান)

সুনী। বাবা ! কেন তুই আমাকে না বোলে সেখানে গিয়েছিলি বল্ দেখি ? সেখানে আর কখনও যেও না বাবা ! তুমি দুঃখিনীর ছেলে, তুমি রাজসভায় কি জন্যে যাও ? ধ্রুব ! এখন কিছু খাও বাবা ! নইলে না খেয়ে ঘুমিয়ে পোড়বে, আর খাওয়া হবে না।

ধ্রুব। হাঁ মা ! আমি কি রাজার ছেলে ?

সুনী। হাঁ বাবা ! এখন কিছু খাও।

ধ্রুব। মা ! আমি যদি রাজার ছেলে ! হাঁ মা ! আমরা তবে এদিন বনে থাকবো ?

সুনী। যতদিন বাঁচ্‌বো।

ধ্রুব। কেন মা? বাবা কি আমাদের বন থেকে নিয়ে যাবে না?

সুনী। হরি যে দিন ইচ্ছা কোরবেন, সেই দিন নিয়ে যাবেন।

ধ্রুব। হরি কে মা?

সুনী। তা আমি জানি না, তিনি আছেন এইমাত্র জানি।

ধ্রুব। হ্যাঁ মা! হরিকে ডাক্‌লে নাকি রাজা হওয়া যায়?

সুনী। হরি সবই কোত্তে পারেন।

ধ্রুব। মা! তবে আমি হরিকে ডাকবো;—রাজা হব, কেমন মা?

সুনী। হ্যাঁ বাবা! হরিকে ডেকো, তাঁর পূজা কোরো।

ধ্রুব। হ্যাঁ মা, হরি কোথায় থাকে মা?

সুনী। তিনি সকল স্থানেই থাকেন।

ধ্রুব। কৈ?—আমি ত দেখ্‌তে পাচ্চিনি, মা! হরি দেখ্‌তে কি রকম?

সুনী। যে যেরূপে তাঁকে পূজা করে, তিনি তাকে সেইরূপে দেখা দেন। তিনি পদ্মপলাশলোচন, আমি তাঁকে এইরূপে পূজা করি।

ধ্রুব। মা! হরি কোথা থাকে মা—ঠিক কোরে বল না। আমি শুনেছি, হরি নাকি বনে থাকে। আমি বনে যাব।

সুনী। না বাবা, বনে যেও না, সেখানে বাঘ আছে, সাপ আছে, তোমাকে ধোরে নিয়ে যাবে। তুমিও আমাকে আর দেখ্‌তে পাবে না, আমিও তোমাকে দেখ্‌তে পাব না, সেখানে যেও না বাবা। এখন ঘুমোও, রাত হোয়েছে, কাল সকালে মাটীর হরি ঠাকুর গোড়ে দোব, তাই পূজা কোরো। এখন ঘুমোবে চল।

(কুটীর মধ্যে প্রবেশ ও শয়ন)

ধ্রুব। মা! ঘুম আস্‌ছে না যে!

সুনী। আচ্ছা, আমি ঘুম পাড়াই, ঘুমোও।

ধ্রুব। (কিয়ৎক্ষণ পরে) হরি! হরি! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি!

সুনী। ওকি বাবা! ঘুমের ঘোরে চোম্‌কে উঠলে কেন? ঘুমোও, আমি ঘুম পাড়াই। (ঘুম পাড়ান)

(গাইতে গাইতে নিশির প্রবেশ)

নিশি। আমি ঘোরা নিশাথিনী।

নিথর আকাশ, নিথর বাতাস,
নিথর নীরদ, নিথর মেদিনী।
শিরে চন্দ্র শোভে মুকুট আমার,
কটি তটে ছায়াপথ চন্দ্রহার,
তারকা জড়িত বসন আঁধার,
পায়ে বাজে ঝিল্লি রবে নুপুর ধ্বনি।
শ্বাপদ পেচক নিশাচরগণ,
কোলেতে আমার করিছে ভ্রমণ,
নরঘাতী চোরে, ঘোর অন্ধকারে,
ঘোরে চারি ধারে,
আয় লো সজনি, নিদ্রা বিনোদিনী
ঢাল ঢাল ঘুম প্রাণীর নয়নে।

নিদ্রা। (প্রবেশ করিতে করিতে)
যাই লো সজনি, জীবন সঙ্গিনী।

নিশি। হের লো আঁধারে ঢেকেছি কাননে,
ঢেকেছি ধরণী শান্তি আবরণে,

নিদ্রা। ঘুম আয় আয়, নিশি বোয়ে যায়,
প্রাণি কুল ঢোলে পড় মোর কোলে,
ঘুমাও প্রকৃতি, ঘুমাও প্রসূতি,
ঘুমাও সন্তান মায়েরে ভুলে।

উভয়ে। আয় সহচরি, গলে গলে ধরি,
আকাশ পাতাল দুঁহু গোনে যাই,
নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
চুপি চুপি ঘুম চললো বিলাই।

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

ধ্রুব। (নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া) মা! মা! মা ঘুমিয়েছে, আর সাড়া নেই। এখন খালি মায়ের নিশ্বেস বইছে। জেগে আছে কি না দেখি। আবার ডাকি। মা! মা! খুব ঘুমিয়েছে। (জানু পাতিয়া বসিয়া) হরি! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথা তুমি? কোথা তুমি? কোথা তুমি? দেখা দাও। বাহিরে যাই (বহির্গমন) এই ত বাইরে এলুম, হরি কোথা?

কোথায় যাচ্ছি? অন্ধকার ঘোর অন্ধকার, এই অন্ধকারে আমার হরি আছে। হরি। হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি! কোথা তুমি—দেখা দাও। কেন লুকিয়ে আছ—দেখা দাও না। (কিয়ৎক্ষণ পরে) আমার সুমুখে কে? এ পাশে কে? ও পাশে কে? কে তুমি? কাল ছায়ার মত কে তুমি? যাওনা—চোলে যাওনা, আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছ কেন? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) আবার আস্‌ছো? বল্‌ছি, শুন্‌ছো না,—ফের আস্‌ছো? কে তুমি? আমি যাচ্ছি, তুমি কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছো? বারণ কোচ্ছি, শুন্‌ছো না? অমন কোল্লে মাকে এখনই ডাক্‌বো। দাঁড়াও, মাকে ডাকি। ওমা! কেমন? এখন পালাও। তাই ত, মাকে ফেলে কোথা যাচ্ছি? আমার হরিকে খুঁজ্‌তে। মা যে আমাকে খুঁজ্‌বে,—মা যে আমাকে দেখ্‌তে না পেলে বড় কাঁদ্‌বে। না—ফিরে যাই—শুই গে। মা! মা! মা! এখনও ঘুমুচ্ছে, এই বেলা চুপি চুপি শুইগে, আর যাব না, ঘুমুই। (কুটীরে প্রবেশ ও শয়ন ও কিয়ৎক্ষণ পরে) না—শোব না, আর থাক্‌বো না, যাই। (বহির্গমন) হরিকে ডাক্‌লে রাজা হব, বাবার কোলে বস্‌তে পাব; হরি! আমাকে রাজা কর। হরি কোথায় থাকে?—সেই যে রাণী বোলেছে "বনে বনে কান্তারে কান্তারে", হরি বনে থাকে, মাও বোলেছে, আমি বনে যাব। না—মা কাঁদ্‌বে, আমাকে আর দেখ্‌তে পাবে না, ডাক্‌বে, খুঁজ্‌বে, পাবে না, কাঁদ্‌বে। ফিরে যাই, যাব না, শুইগে। (কুটীর দ্বারে যাইয়া ডাকিয়া) মা! মা! মা! এখনও ঘুমুচ্ছে; বেশ সুবিধা। এমন সুবিধা আর হবে না। এখন না গেলে আর হরিকে পাব না। এখনই পালাই; মা কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। মা যে আমাকে বড় ভালবাসে, আমি ভিন্ন মায়ের কেউ নাই যে! আমি গেলে মায়ের কাছে থাক্‌বে কে? না, আমি যাব না; আমি গেলে মা বড় কাঁদ্‌বে, না, না, আমি যাব, আমি রাজা হব, মাকে বন থেকে নিয়ে যাব, মায়ের দুঃখ ঘুচ্‌বে। হরি! আমার মা রইল। দেখো, মা আমার জন্যে কাঁদ্‌বে; হরি! তুমি মাকে সান্ত্বনা কোরো আর বোলো, তোমার ধ্রুব বনে পদ্মপলাশলোচন হরিকে খুঁজ্‌তে গেছে।

(প্রস্থান)

সুনী। (জাগরিত হইয়া) ধ্রুব। ধ্রুব। বাবা ধ্রুব! ধ্রুব।। (শয্যা-অন্বেষণ) কোথা গেল? এই যে ঘুমিয়েছিল। ধ্রুব। ধ্রুব! তুই বড় দুষ্টু হোয়েছিস্, এত রাত্রে কোথায় লুকিয়ে রইলি? ঘরের ভেতর ভাল

কোরে খুঁজে দেখি (অন্বেষণ) কৈ? নেই ত। কোথায় গেল? (অল্প কাঁদ কাঁদ স্বরে) ধ্রুব! ধ্রুব! বাবা, কোথায় লুকিয়ে রইলি, দেখা দেনা বাবা, আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছিস? দেখা দে। বাহিরে এসেছে কি? (বহির্গমন) বাহিরে ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টি চলে না, সে ত এত অন্ধকারে আস্‌তে পারবে না। তবে কোথা গেল? বাবা! কোথা গেলি, দেখা দেনা বাবা। দেখি, যদি এই বনের ভেতর লুকিয়ে থাকে। (বন অন্বেষণ) কৈ? এখানে নেই ত। তবে এই ঘোর রাত্রে কোথায় গেল? সে যে আমা ছাড়া এক দণ্ড থাকতে পারে না। কোথায় গেল? কে বোলে দেবে, কোথায় গেল। তরু লতা! তোমরা কি আমার ধ্রুবকে দেখেছ। দেখে থাক যদি বোলে দাও আমার ধ্রুব কোথায়। তারামালা! তোমরা আকাশে থেকে চারদিক ত দেখ্‌তে পাচ্ছ, আমার ধ্রুব কোথায় গেছে, বোলে দাও। কৈ—কেউ ত উত্তর দেয় না—অভাগিনীকে কেউ ত বোলে দেয় না। কোথা যাই—কাকে জিজ্ঞাসা করি? আর ত স্থির থাকতে পাচ্চি না। ধ্রুব বিনা সব যে অন্ধকার দেখ্‌ছি। ভগবান! আমার ধ্রুব কোথা, বোলে দাও;—সে যে আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি, অন্ধকারের আলোক, আমার জীবন আকাশের ধ্রুব তারা। ধ্রুব ছাড়া আর থাকতে পারিনি। কৈ—কেউ ত কিছু বোলে দিলে না। তবে কি আমার অঞ্চলের নিধি হারাল, আর সইতে পারিনি, ওহো, বুক ভেঙ্গে গেল, ধ্রুব! ধ্রুব! বাপধন!

(মূর্চ্ছা।)

(তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। একি, এ যে দেখ্‌ছি সুনীতি।
সুনীতি! সুনীতি!
নাহিক উত্তর—
স্পন্দহীন হেন বোধ হয়।
এ যে মূর্চ্ছিত!
সুনীতি! সুনীতি! ভগ্নি! ওঠ,
কুটীর তেয়াগি
বনমাঝে ধূলায় শয়ন কেন?

সুনী। কে তুমি?—ধ্রুব! আমার প্রাণের ধ্রুব নাকি? বাবা, কোলে এস। (কোলে লইতে উদ্যত)

তপ। নহি ধ্রুব আমি—দেখ চেয়ে।

স্থনী। কে ?—ভগিনি!
কি দেখিছ আর—ভেঙ্গেছে কপাল মম ;
গৃহ অন্ধকার করি কোথা চলে গেছে।
বনমাঝে, কুটীর ভিতরে
খুঁজিলাম পাতি পাতি করি
তবু নাহি পাইলাম তারে।
দিদি ! সে যে মোর দুধের বালক !
ক্ষুধা পেলে কে তারে খাইতে দিবে ?
নাহি জানি এতক্ষণ
মা মা বোলে ডাকিতেছে কত।
দিদি। পায়ে ধরি তোর
এনে দাও ধ্রুবকে আমার।

তপ। ভগিনি ! না হও অধীর
কি হইবে ফল বৃথা রোদন করিলে ?
বিশ্বের প্রহরী সদা সঙ্গে আছে যার,
কে মারে তাহারে ?
কিছু ভয় নাই।
দোঁহে মিলি যাই দূর বনে
তন্ন তন্ন করি তথা করি অন্বেষণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। হরি! হরি! পদ্মপলাশলোচন হরি! কোন্ বনে এলুম? কি অন্ধকার! পথ চিনতে পাচ্ছিনি। হরি! কোথা তুমি, দেখা দাও। উঃ! পায়ে বড় হোঁচট লেগেছে (পতন)। আঙ্গুলে বড় লেগেছে, নোকটা ছিঁড়ে গেছে,—বড় রক্ত পোড়্ছে। পদ্মপলাশলোচন হরি! বড় ব্যথা;

কোথা তুমি, একবার দেখা দাও। আঃ! পায়ের ব্যথা আরাম হোল; কে যেন আমার পায়ে হাত বুলুচ্চে! মা না কি? মা ত এখানে নেই, তবে কে আমার পায়ে হাত বুলুচ্চে? আবার ছায়া! সেই ছায়া! চারটে হাত,—নীলবর্ণ ছায়া! গলায় ও কি দপ্ দপ্ কোরে জ্বলছে? এক হাতে শাঁখ, এক হাতে চাকা ঘুরছে, এক হাতে গদা, এক হাতে আবার একটা বড় ফুল। কে তুমি? কাছে এস। হরিকে ডাকলে তুমি এস কেন? তুমি কি আমার হরি? উঃ। আবার পায়ে কাঁটা ফুট্‌লো, বড় ব্যাথা কোচ্চে। হরি। কেমন কোরে কাঁটা বার কোর্‌বো? আমার পায়ে হাত দিলে কে? অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চিনি। কে কাটা বার কোচ্চে? আঃ। বাচ্‌লুম—কাঁটা বেরিয়ে গেল। মা কাছে নেই, তবে কে এমন কোচ্চে? বোধ করি, হরিই কোচ্চে। নিশ্চয়ই হরিই কোচ্চে। দূরে অন্ধকারে ওটা কি? ঐ সোরে সোরে যাচ্চে,—আবার পেচুচ্ছে—ঐ আবার গাছের পাশে লুকুলো। ঐ আমার হরি। হরি! এইবার তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছি। এইবার তোমায় ধরেছি—আর কোথা যাবে, দাঁড়াও—আমি যাচ্ছি—ধোচ্ছি (বৃক্ষের স্কন্ধ জড়াইয়া ধরন) এযে দেখ্‌ছি একটা গাছ। হরি। তোমায় এত ডাক্‌ছি, তবুও দেখা দিলে না! (নেপথ্যে ব্যাঘ্রগর্জ্জন) ও কিসের শব্দ? কে ডাকছে? আমার হরি বুঝি এইবার আসছে। (ব্যাঘ্রের প্রবেশ) এই যে আমার পদ্মপলাশলোচন হরি! হরি। আমাকে বর দাও, আমি যেন সংমার গর্ভে জন্মাই, আর রাজা হই। কথা কইছ না যে? (ব্যাঘ্রগর্জ্জন) ওকি বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। আমি তোমার গলা জড়িয়ে ধরি, তা হলে তুমি কথা কইবে। (ব্যাঘ্রকে আলিঙ্গনে উদ্যত ও ব্যাঘ্রের প্রস্থান) হরি! পালিও না ভাই, পালিও না ভাই। পালিয়ে গেলে! তবে কি ও আমার হরি নয়! হরি! পদ্মপলাশলোচন! তবে কোথা তুমি, দেখা দাও। মা বোলেছেন, হরি সকল স্থানেই আছেন,—হরি বনে থাকে, এই ত আমি বনে বসে বেড়াচ্ছি, কত খুঁজ্‌ছি, হরিকে ত দেখ্‌তে পাচ্চিনা। হরি, দেখা দাও, দেখা দাও, আর লুকিয়ে থেকো না, আমাকে আর কাঁদিও না। গা ঝিম্ ঝিম্ কোচ্চে, ঘুম আস্‌ছে, এইখানে একটু শুই। (নিদ্রা)

(গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ)

নারদ। গোবিন্দপদারবিন্দ ফোটে হৃদিসরসীজলে।

মনভৃঙ্গ মকরন্দপানে ধাও পদকমলে॥

কমল ঘেরিয়া করয়ে গুঞ্জন,
মধুমাখা নাম শ্রীমধুসূদন,
ভাবে মাতোয়ারা, পিও সুধাধারা,
অনন্ত আনন্দ পাবি পদতলে॥

ধ্রুব। (জাগরিত হইয়া) এ কে? এই পদ্মপলাশলোচন হরি! এই আমার প্রাণের হরি। হরি! এত দেরি কোরে এলে কেন? আমি যে তোমাকে কত ডাক্‌ছিলুম। এইবার আমি তোমার পা জড়িয়ে বোসে থাক্‌বো, আর যেতে দোব না (নারদের পদ ধারণ)। এইবার পালাও দেখি—আর ছাড়্‌বো না।

নারদ। শিশো! ছাড় পদ, ছাড় পদ।

ধ্রুব। তুমি চোলে যাবে না, বল, তবে ছাড়্‌বো।

নারদ। না, যাব না, পা ছাড়।

(ধ্রুব কর্ত্তৃক পদত্যাগ)

নার। বৎস! আমি হরি নই, আমি তাঁর দাসানুদাস।

ধ্রুব। কি বোল্লে?—এঁ্যা—তুমি আমার হরি নও।

(উপবেশন)

ধ্রুব। তবে কি প্রাণের আশা, প্রাণেতেই মিশাইল।
(হরি) এত কোরে ডাক্‌ছি তোমায় (একটু) দয়া মনে নাহি হল॥
কোথা পদ্মপলাশলোচন,
দেখে যাও মরম বেদন,
প্রাণ অধীর তোমারে না হেরে, কোথা গেলে তোমায় পাই বল।

নার। শুন শিশো! কোমল শৈশবে
কেন সদা বনে বনে
বেড়াইছ হরির সন্ধানে?
কেবল রোদনে
নাহি পাবে দরশন তাঁর
এস মোর সনে
লয়ে যাই তব পিতার সদনে,
বসাব তোমারে রাজসিংহাসনে।

ধ্রুব। না, আমি পিতার কাছে যাব না। হরিকে দেখ্‌তে চাই, বিমাতা

বোলেছে, "হরিসাধনা কর্, তবে রাজা হবি" ; আমি হরিসাধনা কোর্‌বো, তবে রাজা হব।

নারদ। বৎস। হরির সাধনা অতীব কঠিন।

তুমি শিশু ;—তব হৃদি অতীব কোমল ;

সে সাধনা তুমি বৎস! নারিবে করিতে।

তাই বলি—চল তব পিতার সমীপে।

ধ্রুব। না,—সেথা আমি যাব না। আমার হরি কোথা আছে, বোলে দাও, আমি সেইখানে যাব,—হরি সাধনা কোর্‌বো।

নারদ। ধন্য শিশু।

ধন্য হোক নাম তব সংসার ভিতর।

দিব হরিনাম সুধা,

শিখাব সাধনা,

শিখাইব যোগ, শিখাব তপস্যা।

তুচ্ছ রাজ্যভোগ আশা দাও দূরে ফেলি।

এস মোর সনে

লয়ে যাই তোমা

দূরে ঐ পর্ব্বত শিখরে।

ধ্রুব। হাঁ মহাশয়! হরিকে দেখ্‌তে পাব ত ?

নারদ। বহু তপস্যার পর।

ধ্রুব। তবে আপনি তপস্যা শিখান।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মধুবন।

(ধ্রুব ও নারদের প্রবেশ)

নারদ। বৎস। এই সেই মধুবন,

নিত্য বিরাজেন হেথা শ্রীমধুসূদন!

তপস্যার তরে উপযুক্ত স্থান এই।

বিলম্ব কোরো না আর,

যাও—ত্বরা স্নান করি এস
যমুনার নীরে।
আজি শুভক্ষণে
বীজমন্ত্রে তোমা করিব দীক্ষিত।

(ধ্রুবের প্রস্থান)

ধ্রুবের অনন্ত ভক্তিযোগ!
পূর্ব্বজন্মে সাধনার বলে
পেয়েছে বালক অমূল্য রতন—ভক্তি।
ভক্তি হোতে মুক্তিলাভ,
ভক্তি হোতে জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি,
অণিমা মহিমা আদি অষ্টসিদ্ধি,
বাঁধা সদা ভক্তের দুয়ারে।
বিভূতির প্রতি,
ভক্ত যদি বৈরাগ্য আনিতে পারে,
তবেই প্রকৃত ভক্তির উদয়।
সেই ভক্তি অয়স্কান্ত-মণি সম।
আকর্ষণে তার, জগৎ চিন্তামণি
ভক্তহৃদে করে আগমন;
তাহাই সাত্ত্বিক ভক্তি।
বিনা সে সাত্ত্বিক ভক্তি,
হরি দরশন হবে না কখন।
চারিবিধ ভক্তি আছে শাস্ত্রে উল্লিখিত,
তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক, অহৈতুকী।
যেই জীব ডাকে নারায়ণে
অন্যের অনিষ্ট, নিজ ইষ্ট সিদ্ধিতরে,
তামসিক ভক্ত সেই।
যে ভক্তের হৃদে নাই পর অশুভকামনা
শুধু ইষ্ট সিদ্ধি,
আর ঐশ্বর্য্য কামনা করি,
করে হরি আরাধনা,

রাজসিক ভক্ত সেই।
ধ্রুবের সাধনা মূলে,
রাজসিক ভক্তি আছয়ে নিহিত।
রাজসিক ভক্তি বলে,
অচিরে পাইবে ধ্রুব,
ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব, মান, অতুল সম্পদ,
ঐশ্বর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী দিবে দরশন।
কিন্তু ঐশ্বর্য্যসম্ভোগে,
লিপ্ত যদি হয় শিশু মন,
নারায়ণ দরশন নাহি হবে আর।
ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য আনিতে হইবে;
একটী কামনা শুদ্ধ রহিবে হৃদয়ে যবে,
কোথা হরি, কোথা শ্রীমধুসূদন,
ভক্তের হৃদয়,
যবে সকল বাসনা ত্যজি,
করিবেক শুদ্ধ হরি অন্বেষণ
তখনই সাত্বিক ভক্তি হইবে উদয়।
আবার যখন, ভক্তচিত্তে,
ভগবান রবে বিরাজিত দিবানিশি,
ক্ষণমাত্র হরিশূন্য না হইবে চিত,
চিত্তে কোন বৃত্তিলেশ রহিবে না আর,
ভেদাভেদ জ্ঞান লুপ্ত হোয়ে যাবে,
চিত্তের সম্পূর্ণ লয় হইবে তখন;
সেই অহৈতুকী ভক্তি।
এখন প্রথমে সাত্বিক ভকতি,
যাহে ধ্রুবহৃদে হয় অঙ্কুরিত,
রাজসিক ভক্তি হয় বিদূরিত,
পরিণামে, অহৈতুকী ভক্তি,
হয় প্রস্ফুটিত,
সেই উপদেশ কিছু দিব ধ্রুবে আজি,

গুহ্যমন্ত্র কিছু দিব, কর্ণে তার,
সাধনে যাহার,
হরি দরশন হইবে অচিরে।

(ধ্রুবের প্রবেশ)

বৎস! বোস এই স্থানে জানুপাতি,
গুহ্য উপদেশ কিছু দিব তোমা আজি।

(ধ্রুবের জানু পাতিয়া উপবেশন)

রাজ্যভোগ আশা, তব হৃদে আছে বিরাজিত,
সেই আশা কর বিদূরিত,
শুদ্ধ একমাত্র সেই পদ্মপলাশলোচন চরণে,
প্রাণ কর সমর্পণ,
একমাত্র একাগ্রতা করিবে সাধন,
ভগবান বিনা,
অন্য চিন্তা মনে দিওনা আসিতে।

ধ্রুব। রাজ্যভোগ আশা করিলাম দূর,
ভগবান বিনা,
অন্য চিন্তা মনে দিব না আসিতে।

নারদ। শুন মন দিয়া,
সরল ভাষায়,
তাঁহার সুন্দর রূপ করিব বর্ণন।
নবজলধর রূপ তাঁর,
পদ্মপত্র হেন চক্ষু দুটী,
বিম্বফল সম ওষ্ঠ দুটী তাঁর;
মস্তকে কিরীট, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,
গলে বনমালা,
হৃদিমাঝে কৌস্তুভ রতন
কর্ণেতে কুণ্ডল, চরণে নূপুর,
পীতবস্ত্র পরিধান।
ধ্যান কর বৎস! দিবানিশি এইরূপ
ধ্যানে হৃদিপটে রূপ করিবে অঙ্কিত।

অচল সমান অটল রহিবে,
স্থির মনে থাকিবে নিয়ত
সাবধান—ধ্যানভঙ্গ নাহি যেন হয়।
এখন তোমারে বৎস! করি মন্ত্র দান,
যেই মন্ত্র জপি অবিরাম
পাইবে অচিরে পদ্মপলাশলোচনে।

(কর্ণে মন্ত্রদান)

এই মন্ত্র জপ অবিরাম।

ধ্রুব। গুরুদেব!
প্রণমি চরণে তব।

নারদ। আশীর্ব্বাদ করি
পূর্ণ হোক্ মনস্কাম তব,
হরি দরশন হউক অচিরে।
এবে চলিলাম আমি।
(স্বগতঃ) যাই এবে ধ্রুবের জননী পাশে,
কাঁদে মাতা পুত্র হারাইয়া
বুঝায়ে সান্ত্বনা করি;
লয়ে যাই তারে রাজার সমীপে।

(প্রস্থান)

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

সংসারে প্রেমের অন্বেষণ করিতেছ? চিরকাল ছায়ার পশ্চাতে ঘুরিতে হইবে। তোমায় সত্য কথা বলি, এক ভগবান ছাড়া প্রেম করিবার ও প্রেম পাইবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ না? পাইবে। প্রাণ খুলিয়া চাহিতে হইবে। সংসারে আসক্তি থাকে, স্বীকার কর, উহা দুর্ব্বলতা। মনকে আঁখি ঠারিয়া উহাকে ভুল বুঝাইতে যাইও না। তাহা হইলে অনেক দেরি পড়িয়া যাইবে। ' অনেক ধাক্কা খাইতে হইবে। অনেক ঠেকিতে হইবে—অনেক ভুগিতে হইবে—শেষে ঠিক ঠিক বুঝিবে, এ সব ছায়া-বাজি। বৈরাগ্য আসিলে তবে ঠিক ঠিক প্রেমের উদয় হয়। বৈরাগ্য অর্থে সংসারের উপর তীব্র বিরাগ ও ঈশ্বরের উপর প্রবল অনুরাগ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—ইক্-প্রকরণস্থ বলিয়াই ‘শ্নম্’ লোপ হইলে বৃদ্ধির নিষেধ হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—ইগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈবেগ্‌লক্ষণা বৃদ্ধিঃ।

যদীগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। স্যদঃ। প্রশ্রথঃ। হিমশ্রথ ইত্যত্র ন প্রাপ্নোতি। ইহ চ প্রাপ্নোতি। অবোদঃ। এধঃ। ওদ্ম ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—‘ন ধাতুলোপ আর্দ্ধধাতুকে’ সূত্র, ‘ইক্’লক্ষণ-সম্পন্ন ‘গুণ’ এবং ‘বৃদ্ধি’রই নিষেধ করে, কিন্তু ‘অভাজি’ প্রভৃতি স্থলে যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ইক্-লক্ষণক বৃদ্ধি হয় নাই।

যদি ইক্‌লক্ষণক গুণ বা বৃদ্ধিরই নিষেধ হয়, তবে যেখানে ‘ইক্’এর প্রাপ্তি নাই, যেমন;—স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ (১) এই সকল স্থলে নিষেধ (কর্ত্তব্য হইলেও) প্রাপ্তি হইবে না।

আর অবোদঃ, এধঃ, ওদ্মঃ (২) প্রভৃতি স্থলে, (অকর্ত্তব্য হইলেও) নিষেধই প্রাপ্তি হইবে ?

বার্ত্তিকমূলম্।—নিপাতনাৎ স্যদাদিষু।

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্যদাদিতে নিপাতনেই প্রতিষেধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—নিপাতনাৎ স্যদাদিষু প্রতিষেধো ভবিষ্যতি।

ন চ ভবিষ্যতি। যদীগ্‌লক্ষণয়োঃ প্রতিষেধঃ স্নিনানুবন্ধলোপে কথম।

ভাষ্যানুবাদ।—স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ প্রভৃতি স্থলে নিপাতনেই ‘বৃদ্ধি’র প্রতিষেধ হইবে।

---

(১) অত উপধায়াঃ।৭।২।১১৬। (উপধাস্থিত অকারের বৃদ্ধি হয়, ‘ঞ’ এবং ‘ণ’ ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় পরে থাকিলে এই সূত্রানুসারে, (‘স্যন্দূ’ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিলে ‘অ’কারের বৃদ্ধি ‘ইক্’লক্ষণক না হওয়াতে, তাহার নিষেধও হইবে না। ‘স্যদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ’ প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

(২) ‘অব’ পূর্ব্বক ‘উন্দী’ (পরিক্লেদনে) ধাতু, ‘আ’ পূর্ব্বক ‘ইন্ধী’ (দীপনে) ধাতু এবং ‘আ’ পূর্ব্বক ‘উন্দী’ ধাতু ‘ঘঞ্’ প্রত্যয় করিলে, ‘ঘঞ্’ প্রত্যয় পরে থাকিলে, উপসর্গের দীর্ঘ হয় বলিয়া উক্ত উপসর্গ-সমূহের দীর্ঘ হওয়াতে ‘অবোদঃ,’ ‘এধঃ,’ এবং ‘ওদ্ম’ প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু ইহারা ‘ইক’ না হওয়াতে, বৃদ্ধির নিষেধও প্রাপ্তি হইবে।

তাহা হইবে না। কারণ, যদি ইক্‌লক্ষণক গুণবৃদ্ধিরই প্রতিষেধ হয়, তবে (ইক্‌লক্ষণক) শ্রিব্ ধাতুর 'ই'কারের এবং অনুবন্ধ লোপের (লূঞ্ ধাতুর) 'ই'কার এবং 'ঊ'কারের কি প্রকারে গুণ হইবে? অর্থাৎ 'আশ্রেমাণম্' 'লবিতা' 'লবিতুম্' প্রভৃতি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—প্রত্যয়াশ্রয়ত্বাদন্যত্র সিদ্ধম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—প্রত্যয়াশ্রয়ত্ব হেতুই অন্যত্র সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। ন চৈষ আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তো লোপঃ। যদা ... ধাতুকনিমিত্তে লোপে প্রতিষেধঃ। জীরদানুঃ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই স্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তক যেখানে ধাত্বংশের লোপ হইবে, সেখানেই গুণ-বৃদ্ধির প্রতিষেধ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা (শ্রিব ধাতুর এবং লূঞ্ ধাতুর অংশ, 'ই' এবং 'ঞ') আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হয় নাই। অতএব এই স্থলে, গুণের প্রতিষেধও হইবে না; কোন দোষও হইবে না।

যদি আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হইলেই প্রতিষেধ হয়, তবে যে স্থলে, 'জীব' ধাতুর উত্তর উণাদিস্থিত 'রদানুক' প্রত্যয় করিয়া, 'লোপোব্যোর্বলি' ৬।১।৬৬। সূত্রানুসারে 'ব'কারের লোপ করা হইয়াছে, তাহা ত আর আর্দ্ধধাতুকনিমিত্তক লোপ হয় নাই। সেই স্থলে কেন গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না? অতএব এই নিয়মানুসারে 'জীবদানুঃ'র 'ঈ'কারের 'গুণ'এর নিষেধ প্রাপ্ত হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্। বকি জ্যঃ সংপ্রসারণম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'জ্যা' ধাতুর উত্তর 'বক্' প্রত্যয় করিলে, 'য'কারের সংপ্রসারণ করিয়া 'জীরদানুঃ' পদ সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—নৈতজ্জীবে রূপম্। বক্যেতজ্জ্যঃ সংপ্রসারণং ভবতি। যাবতা চেদানীং বকি জীবেরপি সিদ্ধং ভবতি।

কথমুপবর্হণম্॥ বৃংহিঃ প্রকৃত্যন্তরম্।

কথং বিজ্ঞায়তে বৃংহিপ্রকৃত্যন্তরমিতি।

অচীতি হি লোপ উচ্যতে। অনজাদাবপি দৃশ্যতে নিবৃহ্যতে॥ অনিটীতি চোচ্যতে। ইজাদাবপি দৃশ্যতে নিবর্হিতা নিবর্হিতুমিতি॥ অজাদাবপি ন বৃংহতো অনিটীতি চোচ্যতে। ইডাদাবপি দৃশ্যতে নিবর্হিতা। নিবর্হিতুমিতি॥ অজাদাবপি ন দৃশ্যতে। বৃংহয়তি। বৃংহকঃ॥ তস্মান্নার্থঃ পরিগণনেন॥

ভাষ্যানুবাদ।—'জীবদানুঃ' শব্দ, 'জীব' ধাতুর রূপ নহে, কিন্তু 'জ্যা' ধাতুর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া, 'য'কারের সংপ্রসারণ করিলে, 'জির' এইরূপ রূপ হইবে; তদুত্তর 'দানুক্' প্রত্যয় করিলে 'ই'কারের, 'চ্'লোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণঃ সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইলেই 'জীবদানুঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

অথবা এক্ষণে 'বক্' প্রত্যয় করিলে, 'জীব' ধাতুর দ্বারাও প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ 'বক্' প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎ হওয়াতে, 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারেই গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে। 'জীবদানু'ও সিদ্ধ হইবে।

উপবর্হণম্ প্রয়োগ (নুম্‌এর লোপ হইলে, গুণ) কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

'বৃহি' ধাতুর 'বৃহ' নহে। বৃহ্, ধাত্বন্তর বলিব।

'উপবর্হণম্', যে অন্য 'বৃহ' ধাতুর, তাহা কিরূপে জানিলেন?

'অচ্যনিটি' বার্ত্তিকে, 'অচ্' পরে থাকিলে লোপ হয়, বলা হইয়াছে, অথচ 'অচ্' পরে না থাকিলেও লোপ দেখা যায়। যেমন,—'নি' পূর্ব্বক 'বৃহি' ধাতুর উত্তর 'যক্' প্রত্যয় করিয়া 'লুট্'এর 'তা' প্রত্যয় করিলে, 'যক্' প্রত্যয় 'অজাদি' না হইলেও নুম্'এর লোপ হইয়া 'নিবৃহ্যতে' প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে।

বার্ত্তিকে 'অনিট্' বিষয়ে 'নুম্'এর লোপ বলা হইয়াছে, 'ইডাদিতে'ও লোপ দেখা যাইতেছে। যেমন,—'নিবর্হিতা', 'নিবর্হিতুম্' ইত্যাদি।

আবার অজাদি প্রত্যয় পরে থাকিলেও 'নুম্'এর লোপ অনেক স্থানে দেখা যায় না। যেমন,—বৃংহয়তি, বৃংহকঃ ('ণিচ্'এর 'ই' থাকে বলিয়া 'বৃংহয়তি' স্থানে অজাদি প্রত্যয়, এবং 'ণ্বুল্'এর স্থানে 'অক' হয় বলিয়া 'বৃংহকঃ' স্থলে অজাদি প্রত্যয় হইয়াছে)। অতএব জানা যাইতেছে যে, 'বৃহ'ধাতু, 'উপবর্হণম্' স্থলে ধাত্বন্তর। সুতরাং কোন কোন স্থলে গুণবৃদ্ধির নিষেধ হয়, তাহার পরিগণনার কোনও প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—যদি পরিগণনং ন ক্রিয়তে। ভেদ্যতে। ছেদ্যতে। অত্রাপি প্রাপ্নোতি।

নৈষ দোষঃ। ধাতুলোপ ইতি নৈবং বিজ্ঞায়তে ধাতোর্লোপো ধাতুলোপো ধাতুলোপ ইতি।

কথং তর্হি।

ধাতোর্লোপো যস্মিংস্তদিদং ধাতুলোপং ধাতুলোপ ইতি। তস্মাদিগ্‌লক্ষণা বৃদ্ধিঃ।

যদি তর্হি ইগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। পাপচকঃ। পাপঠকঃ মগধকঃ। দৃশদকঃ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি পরিগণন না করা হয়; তবে ভেত্তব্যে, ছেত্তব্যে, এই সকল স্থলেও গুণের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে?

ইহা দোষ নহে। কারণ, 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্রে, 'ধাতুলোপ' শব্দ এইরূপ জানিবে না যে, ধাতুর লোপ ধাতুলোপ, 'ধাতুলোপ' ইতি।

তবে কিরূপ?

ধাতুর লোপ আছে যাহাতে, সে ধাতুলোপ, সেই এই ধাতুলোপ 'ধাতুলোপ' ইতি। তত্তৎ ইক্‌লক্ষণসম্পন্নেরই বৃদ্ধি করা হইবে।

তবে যদি ইক্‌লক্ষণসম্পন্ন গুণ-বৃদ্ধিরই প্রতিষেধ করা হয়, তবে পাপচকঃ ('পচ্' ধাতু 'ণ্বুল্'), পাপঠকঃ ('পঠ' ধাতু 'ণ্বুল্'), মগধকঃ, দৃষদকঃ ইত্যাদি স্থলে প্রাপ্ত হইবে না?

বার্ত্তিকমূলম্।—অল্লোপস্য স্থানিবত্ত্বাৎ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—'অৎ'লোপের স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—অকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্‌ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—'পাপচকঃ' প্রভৃতি স্থলে, 'যঙ্' 'যক্' প্রভৃতির 'অ'কারের লোপ হইলে, 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানুসারে, 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিবার পর, 'হল্' উপধাবিশিষ্ট না হওয়াতে, গুণ বা বৃদ্ধির প্রাপ্তিই হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনারম্ভো বা। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা এই 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্র আরম্ভ না করাই কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—অনারম্ভো বা পুনরস্য যোগস্য ন্যায্যঃ॥ কথং বেভিদিতা। মরীমৃজকঃ। কুসুভিতা। সমিধিতা ইতি।

অত্রাপ্যকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্‌ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ।

যত্র তর্হি স্থানিবদ্ভাবো নাস্তি তদর্থময়ং যোগো বক্তব্যঃ॥ ক চ স্থানিবদ্ভাবো নাস্তি?

যত্র হলচোরাদেশঃ। লোলুবঃ। পোপুবঃ। মরীমৃজঃ। সরীসৃপ ইতি।

অত্রাপ্যকারলোপে কৃতে তস্য স্থানিবদ্‌ভাবাদ্‌গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ॥ লুকি কৃতে ন প্রাপ্নোতি॥ ইদমিহ সংপ্রধার্য্যম্। লুক্ক্রিয়তামল্লোপ ইতি॥ কিমত্র কর্ত্তব্যম্। পরত্বাদল্লোপঃ নিত্যো লুক্। কৃতেঽপ্যল্লোপে প্রাপ্নোত্যকৃতেঽপি প্রাপ্নোতি॥ লুগপ্যনিত্যঃ॥ কথম্॥ অন্যস্য কৃতে প্রাপ্নোতি। অন্যস্যাকৃতে। শব্দান্তরস্য চ প্রাপ্নুবন্বিধিরনিত্যো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই সূত্রের আরম্ভ না করাই কর্ত্তব্য।

যদি এই 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্র আরম্ভ না করা হয়, তবে 'বেভিদিতা' ('ভিদ্'ধাতু, 'যঙ্'এর লোপে, 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), 'মরীমৃজকঃ' ('মৃজ্'ধাতু 'যঙ্'এর লোপে, 'ণ্বুল্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), 'কুষুভিতা' ('কুষুভ' ধাতু কণ্ড্বাদিগণীয়, 'যক্' প্রত্যয়লোপে 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ), সমিধিতা ('সমিধ'শব্দ 'ক্যচ' প্রত্যয়ে নামধাতু করিয়া ক্যচের লোপ এবং 'তৃচ্' প্রত্যয়ে সিদ্ধ) ইত্যাদি প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? (গুণ বা বৃদ্ধি কেন হইবে না?)

এই স্থলেও ধাতুসংজ্ঞক যঙাদি প্রত্যয়ের 'অ'কারের লোপ করিলে, 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানুসারে, লুপ্ত 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিলে (উপধাভাব-প্রযুক্ত) গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না।

যদি এইরূপ হয়, তবে যেখানে স্থানিবদ্ভাব নাই, সে স্থানের জন্য, এই সূত্র করা হইবে?

কোথায়ই বা স্থানিবদ্ভাব নাই?

যেই স্থানে, হল্ অচ্ সমুদয়ের (লোপ) আদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ 'যঙ্লুক্' বিষয়ে। যেমন,—লোলুবঃ ('লূঞ্'ধাতু 'অচ্' প্রত্যয় করিয়া 'যঙ্'লুক্ করিলে এইরূপ সিদ্ধ হইবে), পোপুবঃ ('পূঞ্'ধাতু), মরীমৃজঃ (মৃজ্ ধাতু), সরীসৃপঃ ('সৃপ্'ধাতু) এই সকল শব্দ, 'যঙোঽচি চ' ২। ৪। ৭৪। সূত্রানুসারে, যাবতীয় 'যঙ্'ভাগের লুক্ করা হইয়াছে।

এই স্থলেও একবারে 'যঙ্'ভাগের 'লুক্' না করিয়া, পূর্ব্বে অকারলোপ করিয়া, পরে 'য'কার লোপ করিব, তাহা হইলেই, হল্, অচ্, উভয়ের লোপ না হইয়া অকার-নামক অচ্এর লোপ হইবে। সুতরাং 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ব্ববিধৌ' সূত্রানু-সারে, অকারের স্থানিবদ্ভাব প্রযুক্ত (উপধা না হওয়াতে) গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না?

তাহা হইবে না। কারণ, এই স্থলে 'অ'কারের লোপ প্রাপ্তই হইতে পারে না। প্রথমতঃ 'যঙ্'এর 'যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে 'লুক্' করিলে, 'অ'কার থাকিবেই না; সুতরাং তাহার লোপও হইবে না, স্থানিবদ্ভাবও প্রাপ্তি হইবে না।

এই স্থলে ইহা বিচার্য্য যে, 'যঙ্'এর লুক্ই পূর্ব্বে করা হইবে ('যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে) অথবা 'অ'কারের লোপই ('অতো লোপঃ' সূত্রানুসারে) পূর্ব্বে করা হইবে, এই স্থলে কোন্টী কর্ত্তব্য?

'যঙোঽচি চ।' ২। ৪। ৭৪। সূত্রাপেক্ষা, 'অতো লোপঃ।' ৬। ৪। ৪৮। সূত্র পরে বলিয়া, পূর্ব্বে (পরবিধি বলবান বলিয়া) 'অ'কারের লোপই কর্ত্তব্য।

তাহা নহে। পূর্ব্বে 'যঙ্'এর লুক্ই কর্ত্তব্য। যেহেতু, 'যঙ্'লুক্ নিত্য। (পরবিধি অপেক্ষাও নিত্যবিধি বলবান্)-কারণ, 'অ'কারের লোপ করিলেও 'য'কারের লুক্প্রাপ্তি হইবে, না করিলেও প্রাপ্তি হইবে।

(যঙ) 'লুক্'ও অনিত্য।

কিরূপে?

কারণ, অকারের লোপ করিলে, অন্যের (য্ভাগের) 'লুক্' প্রাপ্তি হইবে; আর অকারের লোপ না করিলে, অন্যের (সমুদায় 'যঙ্' প্রত্যয়ের) 'লুক্'-প্রাপ্তি হইবে। শব্দান্তরে যে বিধি-প্রাপ্তি হয়, তাহা অনিত্য হইয়া থাকে।

ভাষ্যম্।—অনবকাশস্তর্হি লুক্। সাবকাশো লুক্। কোঽবকাশঃ॥ অবশিষ্টঃ॥

অথাপি কথঞ্চিদনবকাশো লুক্ স্যাদেবমপি ন দোষঃ। অল্লোপে যোগ-বিভাগঃ করিষ্যতে। অতো লোপঃ। ততো যস্য, যস্য চ লোপো ভবতি। অত ইত্যেব। কিমর্থমিদম্॥ লুকং বক্ষ্যতি তদ্বাধনার্থম্॥ ততো হলঃ। হল উত্তরস্য যস্য চ লোপো ভবতি। ইহ তর্হি পরত্বাদ্যোগবিভাগাল্লোপো লুকং বাধেত॥ কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদম্। নোনূয়তের্নোনাব। সমানাশ্রয়ো লুগ্লোপেন বাধ্যতে।

কশ্চ সমানাশ্রয়ঃ॥ যঃ প্রত্যয়াশ্রয়ঃ॥ অত্র প্রাগেব প্রত্যয়োৎপত্তের্লুগ্ভবতি। কথং স্যন্দঃ। প্রশ্রথঃ। হিমশ্রথঃ। জীরদানুঃ। নিকুচিত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে (যঙ্) লুক্ অনবকাশ-বিষয় বলিয়া অপবাদক হইবে? তাহা নহে। লুক্ অবকাশবিশিষ্ট।

যদি সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে অকারের লোপ হইয়া যায়, তবে 'যঙোঽচি চ' সূত্রানুসারে 'যঙ্'লুকের অবকাশ কোথায়?

অকার লোপ করিবার পরে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ 'য্'কার লোপ করিবার জন্য 'লুক্' (যঙোঽচি চ) প্রবর্ত্তিত হইবে।

অনন্তর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যদি কোনও প্রকারে 'লুক্'এর প্রবর্ত্তিত হওয়ার অবকাশ নাও থাকে, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, অকারলোপ-বিষয়ে যোগবিভাগ করা হইবে। এক ভাগ করা হইবে 'অতো লোপঃ', তার পরে করিব 'যস্য' ('যস্য হলঃ' সূত্র হইতে 'যস্য')। তাহা হইলেই 'য'কারেরও লোপ হইবে। কিন্তু যেই স্থানের 'অ'কারের লোপ হইয়াছে, সেই স্থানেরই 'য'কারের লোপ হইবে।

কি জন্য এইরূপ করা হইল?

'লুক্' বলা হইবে। তাহাকে বাধা করিবার জন্য। তার পরে আর এক ভাগ করা হইবে 'হলঃ'। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে,—'হল্'এর পরবর্ত্তী যে 'য'কার, তাহারও লোপ হয়। অতএব, এই স্থলে তবে কি পরত্ব হেতু, কি যোগবিভাগ হেতু, 'লোপ'বিধি, 'লুক্'বিধিকে বাধা করিবে, অর্থাৎ 'লুক্' হইবার পূর্ব্বে লোপই হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এইরূপ যোগবিভাগ করিয়াই কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে 'কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদমং' এই শ্রুত্যংশে, 'নোনাব' শব্দ কিরূপে সিদ্ধ হইল? কারণ, 'ণু' (স্তুতৌ) ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয় করিয়া 'নোনূয' প্রয়োগ হইবে। পরে 'লিট্'এর 'ণল্' প্রত্যয় করিলে, যদি 'অ'কারের লোপ করিয়া 'য'কারের লোপ করা হয়, তবে এই স্থলেও 'অ'কারের স্থানিবদ্ভাব করিয়া ণু ধাতুর 'উ'কার' অজন্ত্যাঙ্গ না হওয়াতে, 'ণল'এর 'ণ'ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলেও 'উ'কারের বৃদ্ধি 'ঔ' হইয়া নোনাব প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না?

এই স্থলে কোনও দোষ হইবে না। কারণ, সমান আশ্রয়সম্পন্ন লুক্ই লোপের দ্বারা বাধিত হয়।

কে সমানাশ্রয়?

যে প্রত্যয়াশ্রয়। অর্থাৎ এই স্থলে যদি পরবর্ত্তী 'ণল' প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া, অকার লোপ বা যঙ্ লুক্-প্রাপ্তি হইত, তবেই অলোপ, লুক্‌কে বাধা করিত। এখানে কিন্তু প্রত্যয় (ণল্) উৎপত্তির পূর্ব্বেই, 'যঙ্'এর লুক্ হইয়াছে। ('যঙোঽচি চ' সূত্রে, 'চ'কার গ্রহণ প্রযুক্ত, কোন নিমিত্ত না থাকিলেও 'যঙ্'এর লুক্ হয় বলিয়া, এখানেও 'ণল্' প্রত্যয়ের পূর্ব্বেই 'যঙ্'এর লুক্ হইবে; সুতরাং 'উ'কারের বৃদ্ধি হইয়া 'ঔ'কার হইবে, 'নোনাব' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে)।

স্নুদঃ, প্রশ্রথঃ, হিমশ্রথঃ, জীরদানুঃ, নিকুচিতঃ ইত্যাদি প্রয়োগ কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—উক্তং শেষে। *।

বার্ত্তিকানুবাদ।—এই সকল প্রয়োগ শেষে উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্॥ নিপাতনাৎ স্নুদাদিষু। প্রত্যয়াশ্রয়ত্বাদন্যত্র সিদ্ধম্। রকি জ্যঃ সংপ্রসারণম্॥ নিকুচিতেঽপ্যুক্তম্॥ কিম্। সন্নিপাতলক্ষণো বিধিরনিমিত্তং তদ্বিঘাতস্যেতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—শেষে কি উক্ত হইয়াছে?

এই উক্ত হইয়াছে যে,—ভবঃ, প্রশ্নঃ প্রভৃতি শব্দ ও নিপাতনেই সিদ্ধ হইয়াছে। আর অন্যান্য স্থলে প্রত্যয়াপ্রয়ত্ব প্রযুক্তই সিদ্ধ হইবে।

'জীরদানুঃ' শব্দ, 'জ্যা' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয় করিয়া, 'র'কারের সংপ্রসারণ (এবং দীর্ঘ) করিলেই সিদ্ধ হইবে।

'নিকুচিত' শব্দেও উক্তই হইয়াছে।

কি উক্ত হইয়াছে ?

সন্নিপাত অর্থাৎ দুইয়ের সম্বন্ধলক্ষণসম্পন্ন যে বিধি তাহা তাহার বিঘাতকের (নষ্টের) হেতু হয় না।

তাৎপর্য্যার্থ।—'নি'পূর্ব্বক (ইত্যাদি) 'কুঞ্চ'ধাতু 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'নিকুচিত' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, 'কুন্‌চ' ধাতুর যে 'ন'কার, তাহা,'অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ক্ঙিতি চ।'৬।৪।২৪। (১) সূত্রানুসারে,'ক্ত'প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎনিমিত্তক কিৎ হওয়াতে, লোপ হইয়াছে। অতএব যে 'ক্ত' (আর্ধধাতুক) প্রত্যয়কে নিমিত্ত করিয়া 'ন'কার লোপ হইয়াছে, আবার সেই 'ক্ত'প্রত্যয়কেই নিমিত্ত করিয়া 'কুঞ্চ' ধাতুর উকার উপধাও হইবে না ; সুতরাং 'পুগন্তলঘূপধস্য' সূত্রানুসারে, 'উ'কারের গুণও হইবে না। কারণ, পিতা পুত্র যেমন পরস্পর পরস্পরের হন্তা হয় না, সেইরূপ যে যাহার উৎপাদক হইয়া থাকে, সে তাহার বিনাশক হয় না। অতএব 'কুঞ্চ' ধাতুর 'উ'কার উপধা না হওয়াতে, গুণপ্রাপ্তিও নাই , 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' সূত্র করিবারও প্রয়োজন নাই।

(উত্তপধাত্তাবাদিকর্ম্মণোঽন্যতরস্যাম ১।২।২১।সূত্রানুসারে, 'নিষ্ঠা' প্রত্যয় প্রযুক্ত বিকল্পে কিত্বকার্য্য হয় বলিয়া, 'ক্ঙিতি চ' সূত্রানুসারেও এই স্থলে প্রাপ্তিসম্ভব ছিল না।

ক্ক্ঙিতি চ।৫।

ক্ক্ঙিতি ৭।৮।১।

গকার ইৎ, ককার ইৎ এবং ঙকার ইৎ নিমিত্ত হইলে, গুণ বা বৃদ্ধি হয় না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ক্ক্ঙিতি প্রতিষেধে তন্নিমিত্তগ্রহণম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—গ, ক, ঙ ইৎ প্রতিষেধ বিষয়ে, সেই সকল বর্ণ নিমিত্ত হইলে, প্রতিষেধ হয় ; এইরূপ 'নিমিত্ত' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

---

(১) হল্ অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত শব্দসমূহের এবং ইকার ইৎ (লোপ) ভিন্ন শব্দসমূহের উপধাস্থিত 'ন'কারের লোপ হয়, ক এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে

গুরুকরণ।

(জনৈক সাধুর সহিত কথোপকথন।)

প্র। আজকাল ত গুরু তেমন মনের মতন পাওয়া যায় না, সে স্থলে কি করা কর্ত্তব্য?

উ। তুমি কেবল অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে ডাকতে থাক; গুরুকরণ যদি আবশ্যক হয় ত, তিনি মনের মতন গুরু পাঠিয়ে দিবেন; গুরু খুঁজে বেড়াতে হয় না; যেমন ধ্রুবের হইয়াছিল। অথবা হয় ত, তিনি এমন অন্তরে ভাব উদ্রেক করিয়া দিবেন, যাহাতে গুরুলাভের ফল আপনা হইতে হইয়া যাইবে; যেমন প্রহ্লাদের। এমনও আবার হয়—অনেকে হয় ত তাঁকে ডাকতে ডাকতে আপনা হইতেই হঠাৎসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, অথবা স্বপ্নসিদ্ধ হইয়া যায়। তাঁকে যদি ঠিক ঠিক ব্যাকুলতার সহিত ডাকা যায়, তিনি ত অন্তর্যামী, ভক্তবৎসল, যা দরকার তিনি সংযোগ করিয়া দেন; কিছু মাত্র অভাব থাকে না। আজ্ কালকারও কথা বলিতেছি, এমন আমরা অনেক দেখেছি যে, গুরুকরণ হয় নাই অথচ সিদ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

প্র। আচ্ছা, তা হইলে কি মন্ত্রেরও আবশ্যক করে না?

উ। যদি কোনও মন্ত্রে বিশ্বাস না হয় ত, তাহারও দরকার হয় না। পরমহংসদেব বলিতেন, 'মন্ত্র' মানে কি জান?—'মন তোর'। অর্থাৎ, মনকে নিজের বশে আনিবার জন্যই মন্ত্রের আবশ্যকতা। হাজার কোন মন্ত্র জপ করিলেও কিছু হয় না, আবার হয় তো, দু চার বার মন্ত্র জপ করিলেই অনেক কায হইয়া যায়, যিনি মনকে বশে আনিতে পারিয়াছেন, তাঁর আর বেশী মন্ত্রের আবশ্যক করে না; তিনি যদি কখনও মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাহা সামান্য নিমিত্ত কারণ মাত্র; মন্ত্র উচ্চারণ করিতে না করিতেই ঈশ্বরে তাঁর মন লাগিয়া যায়। তবে কি জান, প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ, কোন বিশেষ মন্ত্র লইলে ভাল হয় বটে। তবে তোমাদের যদি কোন বিশেষ মন্ত্রে বিশ্বাস না হয়, ঈশ্বরের অনেক নাম আছে ত, যে কোন একটা নাম জপ করিতে পারিলেই হইতে পারে। তিনি যেন চাঁদামামা—সকলকারই মামা—যে ডাকে তাঁরই।

অনেকে বলে বটে যে, গুরু বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সেটা সকলের মতে যুক্তিযুক্ত নহে। গুরু যেমনই কেন হন না, শিষ্যের যদি ব্যাকুলতা থাকে, তা হ'লে কিছু আটকায় না। "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়,

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥" এরকম অনেক স্থলে দেখা যায়, এবং পুরাণাদিতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পড়া যায় যে, গুরুর চেয়ে শিষ্যের গুণ অধিক; শিষ্যের সিদ্ধ হওয়া, গুরুর উপর অনেক স্থলে, নির্ভর না করিতে পারে।

বিশ্বাসই সর্ব্ব কার্য্যের প্রধান মূল। গুরুকে যদি পরীক্ষা করিয়া লইতেও হয়, তবুও বিশ্বাসের একান্ত আবশ্যক, আজ হয় তো তাঁকে পরীক্ষা করিয়া "ঠিক" মনে করিলাম, কাল তাঁর প্রতি অবিশ্বাস আসিতে পারে। এইরূপ ক'রে, যাবজ্জীবন গুরুই বাছিয়া লইতে থাক? কায আর করিবে কবে? তাহার চেয়ে, গোড়া থেকেই বিশ্বাস করিয়া গেলে ভাল হয়। গুরু কেমন, তা আমাদের দেখ্‌বার দরকার নাই। তাঁর সঙ্গে মন্ত্র লওয়া মাত্র সম্বন্ধ, সেই মন্ত্র লইয়া নিজের বিশ্বাস ভক্তির সহিত সাধন ভজন করিলেই যথেষ্ট, গুরুর দোষের দিকে দৃষ্টি রাখার দরকার নাই। তবে, গুরুকে ভক্তি বিশ্বাস করিতে পার, খুবই ভাল। ভক্তি বিশ্বাস—অহৈতুকী হওয়াই আবশ্যক। সকল বিষয়েই, খুঁত ধরিলে—অনেক ধরা যায়; শেষকালে হয় তো "ঠগ্ বাছতে গাঁ উজড় হওয়ার" মত হইয়া দাঁড়ায়; গুরুকরণও হয় না; মন্ত্র লওয়াও হয় না, সাধন ভজনও হয় না। ক্ষুধা যার অতিরিক্ত হয়, তার আর সে সময়ে ভাল মন্দ দ্রব্যের দিকে তত বড় একটা দৃষ্টি থাকে না। ঈশ্বর লাভের জন্য যদি কেহ যথার্থ ব্যাকুল হন, তিনি, গুরুর দোষ গুণের দিকে বা মন্ত্রের ভাল মন্দর দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না।

প্র। তা হলে কি গুরুর নিকট কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক উপকারের আশা করা যেতে পারে না? গুরু কি কেবল মন্ত্রদাতা মাত্র?

উ। সেরূপ উন্নত গুরুলাভ অদৃষ্টের কথা, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকে, পাইবে। যেখানে এ প্রকার গুরু পাইলে না, অথচ কুলগুরু তেমন মনের মতন লাগছেন না, সে স্থলে গুরুকে মন্ত্রদাতার স্বরূপ লইতে হবে বইকি। তবে সেই কুলগুরুকে আপনি নিজের গুণে ভক্তি বিশ্বাস করেন, আপনা হইতেই—গুরুর কৃপায় ফল আপনার ভিতরে আসিয়া যাইবে। সব বিষয়েই ফলদাতা—ঈশ্বর। গুরু—অনেক স্থলে নিমিত্ত মাত্র। অনেকে বলেন, ধ্রুব যখন নিজের বলে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন, এমন কি, দেবর্ষি নারদ পর্য্যন্তও তাঁর সমক্ষে মন্ত্রদাতা-উপলক্ষ্য স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। একটা গল্প আছে, সকলেই জানেন, গুরু শিষ্য দুইজনে এক সময়ে একটী নদী পার হইতে যাইতেছিলেন,

গুরুর নাম লইয়া শিষ্য অনায়াসে হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলেন, গুরু তাই দেখিয়া মনে করিলেন, "আমার নামেরই মাহাত্ম্যে সত্যিই শিষ্য এরূপ যাইতে পারিল।" গুরু নিজের নাম লইয়া সেই নদী পার হইতে যাইবেন, আর অমনি ডুবিয়া গেলেন।

প্র। আচ্ছা, ইচ্ছা যদি হয়, যাঁকে তাঁকেই কি গুরু করিয়া লইতে পারি?

উ। কুলগুরু যদি না থাকেন ত, সাধ্যমত সদ্গুরু অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য বটে। তবে কি জানেন, এমন অনেক স্থলে ঘটিতে পারে যে, আজ যাঁকে সদ্গুরু বলিয়া জানিলাম, কাল তিনি অসৎ হইয়া আমার সমক্ষে দাঁড়াইবেন। তাই বলি, সকল স্থলেই নিজের সাধন ভজনের উপর, নিজের ভক্তিবিশ্বাসের উপর, নিজের ব্যাকুলতা বা আন্তরিকতার উপর, বিশেষ নির্ভর করিবেন। যদি অদৃষ্ট বশতঃ তিনি সত্যই সদ্গুরু হন, তাহা হইলে ত, সুবিধার আর অবধি থাকে না। আর যদি তা না হন, তা হ'লেও এমন কিছু বিশেষ ক্ষতি নাই; আপনি নিজে ঈশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে তাঁরই কৃপায় উদ্ধার হইতে পারেন।

গুরু অনেক প্রকার আছেন: মন্ত্রগুরু, শিক্ষাগুরু, উপগুরু, ভেকের গুরু, প্রভৃতি। অনেকে হয়ত মন্ত্রগুরু অথবা দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে কিছুই উপকার পাইলেন না—এক মন্ত্র ছাড়া; তার পর, অদৃষ্ট বশতঃ এমন এক সিদ্ধ শিক্ষাগুরু পাইলেন যে, তাঁহার কৃপাবলে অসম্ভবনীয়রূপে উন্নত হইয়া যাইলেন। অনেক সিদ্ধ শিক্ষাগুরু আছেন, যাঁহারা নিজেরা কর্ণে মন্ত্র দেন না; মন্ত্র অপর কাহারও কাছ থেকে আনাইয়া লয়েন, পরে, তিনি নিজের কৃপাবলে শিষ্যকে উন্নত করিয়া দিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক উন্নত সদ্গুরু আছেন, যাঁহারা নিজে মন্ত্রও দিয়া থাকেন এবং শিক্ষাও দিয়া থাকেন।

প্র। কুলগুরু ছাড়িয়া অন্য গুরু গ্রহণ করিতে পারা যায় কি?

উ। সকল স্থলে নয়। যদি ঈশ্বর-ইচ্ছায়, অথবা আপনার সুকৃতি বলে, তেমন সিদ্ধগুরু পান ত, সেই গুরুর কাছ থেকে অনায়াসে মন্ত্র লইতে পারেন। তবে, অনেকে সিদ্ধগুরুর ভড়ং অবলম্বন করিয়া বেড়ান; তাঁহাদিগের নিকট হইতে খুব সাবধান থাকিবেন। কিছু দিন ধরিয়া তাঁহাকে সাধ্যমত ভালরূপ দেখিয়া, বুঝিয়া, তাহার পরে, যদি মন একান্ত আকৃষ্ট হয়, তবে তাঁর কাছ হইতে মন্ত্র বা শিক্ষা লইতে পারেন। কুলগুরুর আজ্ঞা লইয়া এইরূপ গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র লইতে পারিলেই বড় ভাল হয় বটে। অপারগ পক্ষে নাচার, কিন্তু কুলগুরুকে অসন্তুষ্ট করা বিধেয় নহে। তাঁহাকে যেন তেন প্রকারেণ

সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেন। আর সেরূপ যদি সদ্‌গুরু না পান, কুলগুরুরই নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ডাকিবেন ; তিনিই যাবতীয় আধ্যাত্মিক অভাব পূরণ করিয়া নিশ্চয়ই দিবেন।

প্র। সদ্‌গুরু যদি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় হন, তাহা হইলে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র লইতে পারা যায় কি ? ব্রাহ্মণও কি তাঁহার কাছ থেকে মন্ত্র লইতে পারেন ?

উ। সদ্‌গুরু অর্থে যদি সিদ্ধ গুরু হন, তাহা হইলে তাঁহার কাছ থেকে সকল জাতিই মন্ত্র লইতে পারেন। প্রকৃত ভক্তের এবং সিদ্ধ মহাপুরুষগণের আবার জাতি কি ? নদী সকল যতক্ষণ না সমুদ্রে মিশিয়া যায়, ততক্ষণ তাহাদের নামরূপ প্রভৃতি উপাধি থাকে, সমুদ্রে মিশিলে আর লাল জল সাদা জল, ঐ নদী ও নদী—কোন প্রকার ভেদাভেদ থাকে না। তেমনি জীব যখন "শিব" হয়, তখন তাহাতে কোন প্রকারেরই জীবভাব থাকিতে পারে না, ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি ভেদ তখন আর তাঁতে থাকা কিরূপে সম্ভব ? পুরাণাদিতে এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায়, এবং যদি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন ত দেখিতে পান যে, অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণেতর জাতীয় সিদ্ধ গুরুর নিকট হইতে অনেক সদ্‌ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তও মন্ত্র লইয়া যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ, অনেকের ধারণা যে, শূদ্র যদি সিদ্ধ হন, তিনি একজন সামান্য ব্রাহ্মণের চেয়েও নিচু, তাঁহার কাছ থেকে কোনও ব্রাহ্মণ দীক্ষা লইতে পারেন না। কাশীধামেও এইরূপ বদ্ধ ও অন্ধ জাতিভেদ জ্ঞান অনেকের ভিতর আছে। এ সকল কিন্তু ভুল। যাঁহারা সত্যই ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহারা এরূপ ভেদজ্ঞান করেন না। যেখানেই গুণ দেখেন, সেইখানেই তাঁরা মাথা নুয়াইয়া থাকেন। তাঁরা ত আর জড়ের উপাসনা করেন না যে, এই খোলটা লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিবেন। যেখানে একটুও মাত্র চৈতন্যের বিকাশ দেখিতে বা বুঝিতে পারিবেন, সেইখানেই তাঁরা ছুটিবেন। অগ্নি সর্ব্বত্রই পবিত্র। অগ্নি যদি আঁচ্‌তাকুড়ে পড়িয়া থাকে, সেই অগ্নি কি কখন অপবিত্র হইতে পারে ? আঁচ্‌তাকুড় থেকে যদি কেহ তুলিয়া লয়, সেই অগ্নিকে কি কখন জল দিয়া ধুইয়া লয় ?—না, সে অগ্নির দাহিকাশক্তি কখন কমিয়া যায় ? আর এক কথা, মনে কর, উমাচরণ পাল—একজন ব্যক্তি—সে শূদ্র। এখন, "উমাচরণ পাল" এই নামটী সেই ব্যক্তির কোন্ জিনিষটাকে দিতেছি ? তাহার জড়শরীরটাকে, না, তাহার আত্মাকে, না তাহার শরীরবিশিষ্ট আত্মাকে

অর্থাৎ আত্মা ও শরীর এই দুই মিশ্রিত হইয়া যাহা হইয়াছে, তাহাকে? যদি তাহার জড়শরীরের নাম "উমাচরণ পাল" বল, ভাল কথা; সেই ব্যক্তির "উমাচরণ পাল" নামক জড় শরীরটাই শূদ্র বলিলে, বেশ, কিন্তু জড় শরীর ত আর মন্ত্র দেয় না, মন্ত্র দেন—সেই জড় শরীরের ভিতর যিনি আছেন, তিনি। জড়শরীর শূদ্র হইতে পারে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার ভিতর যিনি আছেন, তিনি ত আর শূদ্র নহেন, তা হলে তাঁর প্রদত্ত "মন্ত্রে" আর শূদ্রাশূদ্র দোষগুণ কি? আর যদি বল, সেই ব্যক্তির শরীরকে "উমাচরণ পাল" বলছি না, "উমাচরণ পাল" বলছি তার আত্মাকে, তা হ'লে মহাভ্রম করিলে। মনে কর, সেই ব্যক্তি মরিয়া গেল, তাহার শরীরটা ভস্ম করিয়া ফেলিলে; তুমি এখন, তার শরীরের নাম "উমাচরণ পাল" বলছ না, বলছ তার আত্মার নাম "উমাচরণ"। এখন তার 'আত্মা' অবশ্য মরিয়াও যায় নি, তার আত্মাকে অবশ্য পুড়াইয়াও ফেলিতে পার নি। তোমার মতে "উমাচরণ পাল"ও তা হোলে অবশ্য এখন বেঁচে আছে "আত্মা"রূপে, তা ভূত হইয়াই থাকুন, আর দেবতা হইয়াই থাকুন, বা আবার মানুষ-জন্মই গ্রহণ করুন। মনে কর, "মানুষ" হইয়াই ফের জন্মাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘরে নাম হইল "উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেবশর্ম্মা"। তুমি যেয়ে এখন সেখানে মারামারি করগে, কেন এর নাম "উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" দেওয়া হইল? এর নাম ছিল "উমাচরণ পাল", এ ছিল শূদ্র! আবার শ্মশান হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যেই দেখিলে যে, সেই ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিয়াছেন, মাথা হইতে সিন্দুর মুছিয়া ফেলিয়াছেন, থান কাপড় পরিয়াছেন, এবং "বিধবা হইলাম" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, তখন, আর একবার, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গেও ঝগড়া করগে যে, কেন তিনি বিধবা হচ্ছেন? "উমাচরণ পাল ত মরে নি, উমাচরণ পালকে দেখে এলুম, সে মুখুয্যেদের বাড়ী জন্মেছে!"

এখন বুঝ্‌তে পারলে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি উপাধি, আত্মার কখন হইতে পারে না! শরীরের উপাধি মাত্র।

আর যদি বল, "উমাচরণ পাল" সেই ব্যক্তির 'শরীরবিশিষ্ট আত্মা"র নাম। বেশ কথা, তা হলে, শরীরেরও নাম নহে, আত্মারও নাম নহে উমাচরণ পাল, বলছ শরীরবিশিষ্ট আত্মার। কিন্তু, শরীরের সহিত আত্মার সংযোগ এবং সংযুক্তভাবে অবস্থানও যেমন হইয়া থাকে জান, তেমনি আবার শরীর হইতে আত্মার বিয়োগ এবং পৃথক্‌ভাবে অবস্থানও হইয়া থাকে। সাধারণ

কথায়, মানুষ যখন ম'রে যায়, তখন বলা যেতে পারে, "শরীর হইতে আত্মার বিয়োগ" হইল।' আর, যখন মানুষ সিদ্ধ হয়, তখন বলা যাইতে পারে যে, শরীর হইতে আত্মা পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, যেমন "খড়ুলি নারিকেল" অর্থাৎ যে নারিকেলের জল শুকাইয়া যাইলে নারিকেলের শাঁস মালা হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। মানুষের এই অবস্থার নাম জীবন্মুক্ত অবস্থা। মানুষ মরিয়া যাইলে যেমন আত্মাতে আর কোনও উপাধি দেওয়া যাইতে পারে না, তেমনি মানুষ সিদ্ধ হইলেও তাঁর অন্তরে যিনি আছেন, তাঁতে আর "উমাচরণ পালত্ব" বা শূদ্রত্ব প্রভৃতি উপাধি দেওয়া যাইতে পারে না। উমাচরণ পাল যদি সিদ্ধ বা জীবন্মুক্ত না হইয়া কাহকে মন্ত্র দেন ত, অবশ্য অন্যায় করিবেন, কেন না, তখনও তাঁর জ্ঞান হয় নাই, তখনও তাঁর ভিতরে চৈতন্যের প্রকাশ হয় নাই, তখনও দেহাদি ভাব যায় নাই—দেহেতেই আত্মাভিমান রহিয়াছে আর, যদি সেই উমাচরণ পাল সিদ্ধ বা জীবন্মুক্ত হইয়া কাহকে মন্ত্র দেন ত, তাতে কোনও দোষ হইতে পারে না। কেন না, তখন যিনি মন্ত্র দিলেন, তিনি আর উমাচরণ পাল নন,—উমাচরণ পালের ভিতর যে চৈতন্য আছেন, সেই চৈতন্যই মন্ত্র দিলেন। এরূপ গুরুর নিকট হইতে অনায়াসে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তও মন্ত্র লইতে পারেন। এরূপ গুরু সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-গুরুর (যাঁহাদের অবশ্য আত্মজ্ঞান হয় নাই) অপেক্ষা ভাল।

প্র। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইলে ত সমাজে "এক-ঘরে" করে ফেলতে পারে।

উ। "একঘরে" ক'রে ফেলতে পারে, যদি সেই গুরু জীবন্মুক্ত পুরুষ না হন। সমাজে দুরকম লোক আছে—ভাল ও মন্দ, বিবেচক আর অবিবেচক; বুদ্ধিমান আর নির্বোধ। জীবন্মুক্ত গুরু যদি অপর জাতীয়ও হন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র লইলে সমাজের বিবেকী সজ্জনগণ কখনই আপনাকে দোষারোপ করিবেন না, বেশ জানিবেন; এবং তা হলে আর আপনি "একঘরে" হইলেন না, বরং আপনার ভালই হইল, কেন না, ভাল লোকগুলিই আপনার পক্ষে হইলেন। মন্দ লোক আপনাকে ভাল বলিল আর মন্দ বলিল, তাতে কি এসে যায়? "লোক না পোক"। যাহারা অবিবেচক, যাহারা নির্বোধ, তাহারা ত সকলকারই প্রায় নিন্দা করিয়া থাকে, আপনি ভাল করিলেও নিন্দে করিবে, মন্দ করিলেও নিন্দে করিবে।

আর এক কথা দেখ, সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। সমাজেরও একটা সীমা আছে। সমাজ দেশাচার প্রভৃতি লইয়া; সমাজ—পার্থিব বিষয় লইয়া। ধর্ম্মের কিন্তু সীমা নাই, ধর্ম্মের কখনও শেষ নাই। এখানে ধর্ম্ম" মানে বলছি "পারমার্থিক তত্ত্ব"। যেমন কাল অনন্ত, যেমন পরমাত্মা অনন্ত, তেমনি পারমার্থিক তত্ত্বও অনন্ত। যতই কেন আপনি উন্নত হন না, তথাপি যদি আপনি সত্যই সত্যপিপাসু হন, আপনার সমক্ষে তখনও অনেক পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার বাকি থাকিবে। পারমার্থিক তত্ত্বচর্চ্চার প্রথম আরম্ভ হইতেছে অবশ্য সমাজের ভিতর হইতে। জীব যতক্ষণ ঈশ্বরোপাসনায় বেশী উন্নত হয়েন নাই, ততক্ষণই সমাজের দ্বারা আবদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ তাঁর উপাসনাও অবশ্য, দেশাচার বা লৌকিক আচারের অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু যখন জীবের অন্তরে 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক' প্রজ্বলিত হইতে সুরু হয়; তখনই জানিবেন, তিনি সাধারণ লৌকিক আচারের বহির্ভূত হইতে উন্মুখ হইতেছেন। ক্রমশঃ যখন তিনি জীবন্মুক্ত হন, তখন আর তাঁহাকে সমাজ প্রভৃতি কিছুই আয়ত্তাধীন বা স্পর্শও করিতে পারে না।

প্র। "সিদ্ধগুরু" বলিলেন, এখন, সিদ্ধ অবস্থা কেমন করিয়া বুঝিয়া লইব?

উ। দেহাভিমান যাঁর যত গেছে, তিনি ততই সিদ্ধ হইয়াছেন। অবশ্য, নিজে সিদ্ধ না হইলে ঠিক ঠিক কে সিদ্ধ, তা বুঝা যায় না, তথাচ, সিদ্ধ অবস্থার কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে। সহজ কথায়, পরমহংসদেব বলিতেন—সিদ্ধ অর্থাৎ "সেদ্ধো", আলু প্রভৃতি সিদ্ধ হইলে যেমন নরম হয়, যে ব্যক্তি সিদ্ধ হন, তিনিও তেমনি স্বভাব চরিত্রে অতি নরম হইয়া যান; তাঁর কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি অতিশয় কমিয়া যায়—কিছুই থাকে না বলিতে গেলে। তিনি তখন অতি দীন হীনের ন্যায় হন। পরমহংসদেব আর এক কথা বলিতেন,—যাঁর কাছে বসিলেই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, ঈশ্বরে মন আপনা হইতেই যায়, তিনিও ঠিক ঠিক সাধু, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই যাঁর চক্ষু দিয়া জল পড়ে, তিনিও ঠিক্ ঠিক্ সাধু।

যাঁকে দেখিবে, অনেক সাধক ও যথার্থ ধর্ম্মপিপাসুগণ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন, যিনি কোনও সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন না; যিনি বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ বা আড়ম্বর প্রভৃতিতে লিপ্ত নহেন; যাঁহার কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার নিজের স্বার্থ নাই; যাঁহার মন সর্ব্বদাই প্রায় ঈশ্বর চিন্তায় রত, তাঁহাকেও ঠিক্ ঠিক্ সাধু বা সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

প্র। আচ্ছা, একজন শূদ্র-সিদ্ধ, আর একজন ব্রাহ্মণ সিদ্ধ এইরূপ দুইজন গুরু যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাহার নিকট হইতে মন্ত্র লওয়া শ্রেয়?

উ। যাঁর উপর তোমার ভক্তি হইবে, তাঁরই কাছ থেকে লইতে পারি। বস্তুতঃ, সিদ্ধ অবস্থাতে ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই।

প্র। গৃহস্থ কি কখন গুরু হইবার যোগ্য?

উ। যদি মন্ত্র গুরু বল,—গৃহস্থ যদি কুলগুরু হন, কোন ক্ষতি নাই গৃহস্থ, যে কোনও জাতি হউন না কেন, তাঁর যদি গুণ থাকে, উপগুরু সকল জাতিরই হইতে পারেন; একটা পিঁপড়ের কাছ থেকেও এক জন সদ্ব্রাহ্মণও শিক্ষালাভ করিতে পারেন; ভাগবতে আছে—অবধূত চব্বিশটী এরূপ গুরু করিয়াছিলেন। গৃহস্থ যদি সিদ্ধ হন, অর্থাৎ জনকাদির মতন হন, তাহা হইলে তিনি, ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, শুকাদি ব্যাসপুত্রেরও গুরু হইতে পারেন।

প্র। গৃহস্থ কুলগুরু ছাড়িয়া সন্ন্যাসী গুরু লইতে পারি কি না? সন্ন্যাসী যদি পূর্ব্বাশ্রমে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতীয় ছিলেন এরূপ হয়, তাঁহাকেও গুরু করা যায় কি না?

উ। সন্ন্যাসী যদি যথার্থ ত্যাগী ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহার কাছ থেকে মন্ত্র বা শিক্ষা অনায়াসে লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কুলগুরুর অনুমতিক্রমে হইলেই বড় ভাল হয়। এরূপ প্রথা ভারতবর্ষের সকল দেশেই আছে। যাঁহারা খুব ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। কুলগুরু যদি অসন্তুষ্ট একান্ত হন, সেই সন্ন্যাসীর তপোবলে সে সব দোষ স্পর্শিতে পারে না। তবে কুলগুরুকে কখনই অশ্রদ্ধা করিবে না।

প্র। সন্ন্যাসী কিসে গৃহস্থ-গুরুর অপেক্ষা বড়?

উ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় হোম করিতে হয় এবং পিতৃ-পুরুষের ও নিজের পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সেই হোমাগ্নিতে, যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁকেও শিখা-সূত্র আহুতি দিতে হয়। এবং, পূর্ব্বাশ্রমের যাবতীয় নাম উপাধি, সমস্তই সেই হোমাগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। সন্ন্যাস গ্রহণ থেকেই তিনি নারায়ণ স্বরূপ হইয়া যান। লোকে কথায় বলে, পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয়। সন্ন্যাসীকে দেখিলেই লোকে "নম নারায়ণ" বলিয়া প্রণাম করে। সন্ন্যাসীর আর তখন কোন সামাজিক বা ব্যবহারিক উপাধি থাকে না। সুতরাং তিনি পূর্ব্বাশ্রমে শূদ্রই থাকুন বা চণ্ডালই থাকুন, তিনি সকল জাতির বা সকল

আশ্রমের গুরু হইতে পারেন এরূপ প্রথা ভারতবর্ষের সকল স্থানেই দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গালা দেশে, সন্ন্যাসীর চাল বড় নাই বলিয়া, সকলে শূদ্র-সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী এইরূপ পৃথক করিতে যান। এ সকল সাধারণ কথা বলুম মাত্র। অবশ্য, এমন অনেক জীবন্মুক্ত গৃহস্থ আছেন, যাঁহারা ঠিক ঠিক সন্ন্যাসীর অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহেন।

প্র। শূদ্রও কি তাহা হইলে সন্ন্যাসী হইবার অধিকারী হইতে পারে?

উ। নিশ্চয়। সকলকালে, ও ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে সকল জাতিরই সন্ন্যাসী হইবার অধিকার আছে, এবং হইয়াও থাকে, দেখা যায়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রায় কোথাও বড় একটা আপত্তি দেখা যায় না। কেন না, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপবীত থাকে, তাঁহারা দ্বিজাতি। দ্বিজাতি মাত্রেরই দণ্ড গ্রহণে অধিকার—ইহা প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত। এক কথা হইতেছে—শূদ্রসম্বন্ধে। এখন, শূদ্র বলি কাকে? অনেকে বলেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম এই যে, অস্পৃশ্য জাতিকেই শূদ্র বলা যায়, অর্থাৎ যাহারা অতি অপবিত্র—শারীরিক ও মানসিক, যাহাদের স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, যেমন, মেথর, মুচি, মুর্দ্দফরাস প্রভৃতি। যদি বলেন, ইহারা শূদ্র নয়, "অন্ত্যজ" নামক "পঞ্চম" জাতীয়, তবে, শূদ্র বলি যে কাকে, কিছুই ত ঠিক করিতে পারি না। আজকাল ত ব্রাহ্মণ শূদ্রে সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। যে শূদ্রের বাড়ীতে, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া পাতা পাতিয়া খাইতে পারি, তা লুচি হউক, মোণ্ডা হউক, আর শুক্‌নো চিঁড়ে মুড়কি হউক, বা, তৎপরিবর্ত্তে কাঞ্চনমূল্য গ্রহণ করিতে পারি; অথবা তাহার বাড়ীতে শালগ্রাম লইয়া যাইয়া ঘণ্টা নাড়িয়া আসিতে পারি, সেই শূদ্র যদি কখনও সামাজিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি করে, তাহার সেই উন্নতি দেখিয়া, আমি অর্থলোলুপ ও যাচ্ঞের ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, হিংসাপরবশ হইয়া তাহাকে শূদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করিলে হইবে কি? আজকাল যেমন, শূদ্রের শূদ্রত্ব দেখা যায় না, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বও তেমনি সকল স্থলে দেখা যায় না। শূদ্র কোথায় ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবে, তা না হয়ে, আজকাল দেখ্‌তে পাচ্ছি, অনেক ব্রাহ্মণ, শূদ্রের দাসত্ব করিতেছেন। উমাচরণ পালের ন্যায় অনেক শূদ্রের তাঁবে অনেক ব্রাহ্মণ ত চাকরি করিতেছেন। অবশ্য সদ্‌ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি না। অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণের নাম মাত্র ধরেন, তাঁদেরই কথা বলিতেছি মাত্র। চিল শকুনি প্রভৃতি অনেক উচ্চে

উঠে বটে, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে গোভাগাড়ে। যাহা হউক, সদ্ব্রাহ্মণের পক্ষেও শূদ্র যে অতি হেয়, তাহা নহে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণের পদ স্পর্শ করিতে পারে, যে শূদ্রের, ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিবার অধিকার আছে; সে শূদ্রে সাত্ত্বিক ভাব কি আসিতে পারে না? শূদ্রও যদি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে, ঈশ্বরের জন্য যদি অতি ব্যাকুল হইয়া পড়ে, যে শূদ্রের, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু একেবারেই ভাল লাগে না, সে শূদ্রের কি ঈশ্বরের জন্য ত্যাগে অধিকার হইতে পারে না? শূদ্রের কথা দূরে থাক, হিন্দু ছাড়া যবনেরও ত্যাগের অধিকার আছে।

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিং॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তারাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥"

সন্ন্যাস মানে কি? ত্যাগ ত? যদি নিজের কোন প্রকার সুখের জন্য শূদ্র সংসার আশ্রম ত্যাগ করে, তাহা হইলে অবশ্য দোষ হইতে পারে; কিন্তু, ঈশ্বরের জন্যে শূদ্র অনায়াসে সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না, ইহা যাবতীয় শাস্ত্র ও যাবতীয় মহাপুরুষগণ বলিয়া থাকেন। শূদ্র যখন সমস্ত ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর অন্তপ্রাণ হন, তখন আর তাঁহাতে, শূদ্রত্বের কথা দূরে থাকুক, জীবত্ব পর্য্যন্তও লোপ হইয়া যায়। 'ত্যাগ করা' সামাজিক কথা নয়, জাতিগত কথা নয়; ইহা প্রাণের কথা, ইহা পারমার্থিক কথা। ত্যাগ কি যে সে করিতে পারে? যিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, যিনি আর কোন মতে সংসারে মন ধরিয়া রাখিতে পারেন না, যাঁর এক ঈশ্বর ছাড়া, আর কোন বস্তুতেই শান্তি হয় না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তু বিষ বোধ হয়, তিনি কোন ক্রমে সংসারে আর থাকিতে পারেন না বলিয়াই সমস্ত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহাকে আর তখন, ব্রাহ্মণ বলুন, শাস্ত্র বলুন, জাতি বলুন, যুক্তি বলুন, পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু বলুন, কাহার সাধ্য আর ধরিয়া রাখিতে পারে? তাঁহার নিকট জাতিধর্ম্ম, বা শাস্ত্র দেখান,—যেমন অরণ্যে রোদন করা। আচ্ছা বলি, আপনি একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ; আপনিই অন্তরের সহিত সত্য কথা বলুন দিকি, আপনি একজন গৃহস্থ, আপনি বড়, না, সেই ত্যাগী ও ঈশ্বর-নিষ্ঠ শূদ্র বড়?

আত্মা।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ)

এক মহাপুরুষ মায়ার যথার্থ স্বরূপ দেখিতে চান ও দেখেন, এক পরমা-সুন্দরী চিরযৌবনা রমণী, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতা, রমণীর সমস্ত শরীর যেন কারুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি। রমণী একটী শিশু প্রসব করিয়া, তৎপশ্চাৎ তাহাকে উদরস্থ করিল।

এই কারুণ্য ও কঠোরতার একত্র সমবায়, অতি যত্নসহকারে স্বীয় গর্ভে শিশুকে ধারণ করিয়া, প্রসব হইবামাত্রই তাহাকে উদরস্থ করণ,—এই নিয়মই যেন জগতের ভিত্তি। জীবনের উদ্দেশ্য মৃত্যু। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবনতি। উদ্দেশ্যের সঙ্গেই উদ্দেশ্যহীনতা। ইহারই নাম মায়া।

গাছে ফুল ধরিল, উদ্দেশ্য—ফুলের পরিণতি ফলে। ফুল ক্রমে ফল হইল; ফল পাকিল, পাকিয়াই পচিতে আরম্ভ করিল। যদি পচনই, মৃত্যুই ফলের চরম দশা, তবে এত কষ্ট করিয়া ফুলকে ফলে পরিণত করার আয়াস কেন? মানবশিশু বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, অবস্থাচয় অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধ হইতেছে। বৃদ্ধ কত দেখিয়াছে, কত শুনিয়াছে, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে বৃদ্ধের জ্ঞানভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্ন সঞ্চয় করিয়াছে, বৃদ্ধ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার জ্ঞান জগতের কত উপকার করিতে পারে, বৃদ্ধের পরামর্শে অর্ব্বাচীনের প্রভূত অমঙ্গল দূর হইত। কিন্তু বৃদ্ধের সে জ্ঞান জগতের কাজে আসিল না। মৃত্যুরূপ দস্যু কর্ত্তৃক তাহার সমস্ত ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল। মহাপুরুষ কৃচ্ছ্র-সাধনবলে অমৃতত্বপ্রয়াসী। সে অমৃতত্বের অবস্থা আর নিজের যথাসর্ব্বস্বের নাশ এক কথা। যেখানে অমৃতত্ব, সেখানে "আমি" বলিবার পর্য্যন্ত অবসর নাই। "যত্র নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্"। চরম উন্নতি আর নিঃশেষ মৃত্যু এক কথা। এ নিত্য ছলনা যেন জাগতিক ব্যাপারের মূলমন্ত্র।

আবার যাহাতেই জীবন, তাহাতেই মৃত্যু। যে পথে অগ্রসর হইলে তোমার জীবন, সেই পথেই প্রতিপদে তোমার মৃত্যু। যে বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসা-শ্রমের প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষের সার পুরুষগণকে সন্ন্যাসী করিয়া এক সময়ে এ দেশকে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম্মই আবার ভারতবর্ষের অবনতির বীজ রোপণ করিল; সমাজের সদগুণসম্পন্ন সন্তানগণ সন্ন্যাস লইতে আরম্ভ করিল, গৃহস্থাশ্রমে সুতরাং পড়িয়া রহিল কতকগুলি অকর্ম্মণ্য নীচাশয়

পর দুর্ব্বলপ্রাণ, দুর্ব্বলমস্তিষ্ক কুসন্তান। তাহাদেরই বংশধর আমাদের হাতে ভারতের জাতীয় জীবন, কাজেই এত দুর্দ্দশা।

জন্মগত জাতিতে পিতা পিতামহাদির বিশেষ গুণ সন্তানে উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণপিতার সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণসন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। এ পক্ষে, জন্মগত জাতি একটী সুন্দর প্রথা। কিন্তু এই প্রথাই অন্য পক্ষে আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। বিস্তৃতির দ্বার একবারে রুদ্ধ করিয়াছে। ক্রমে শরীর নষ্ট, মন নষ্ট, আমরা অচেতন পুত্তলিকার দশায় পড়িতেছি। সমাজসংস্কারক ভাবিয়া আকুল, জন্মগতজাতি না ভাঙ্গিলে উপায় নাই। যাহাতেই জীবন, তাহাতেই মৃত্যু।

সুখের সঙ্গে দুঃখ। ধনী বহু অর্থের অধিকারী। কিন্তু, উদরের দুরবস্থায় সে ধন তাহার ভোগে আসিতেছে না। দরিদ্র সবল ও সুস্থ, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ভোগসক্ষম ও লোলুপ, কিন্তু অর্থের অভাবে দরিদ্র ভোগে বঞ্চিত।

এই না সত্য, না মিথ্যা, মরুমরীচিকাসদৃশ ব্যাপারের নাম মায়া। বিচক্ষণ ব্যক্তি মায়াকে "বিচিত্র ভবের খেলা দুবেলা ভাঙ্গিতে গড়িতে দেখিয়া অবাক্" হন। কোন্ প্রাণে, কোন আশায়, কোন্ বিবেক সহায়ে মায়িক জগৎকে সত্য বলিবেন? কি উদ্দেশ্যেই বা মায়ার কার্য্যের সহিত নিজের আত্মীয়তা স্থাপন করিবেন?

যে জিনিস্টীকে সত্য বলিয়া ধরিতে যান, দেখেন, সেটির অস্তিত্বই নাই যাহার নিত্য পরিবর্ত্তন, তাকে সত্য বলিয়া ধরিতে যাওয়া বাতুলতা। আজ যাকে আপনার বলেন, স্বার্থে আঘাত লাগিলে দেখেন, কাল সে পর হইয়া যায়। তার পর, কেহই তো চিরদিন আপনার থাকে না; মৃত্যু আত্মীয়তা বন্ধন ছেদন করিবেই করিবে। উদ্দেশ্যবিহীন উন্মত্তের সঙ্গে কাজ করিতে যাওয়াও কি উন্মত্ততা নয়? ভাল একটী কাজ করবে, কোন একটা মহান্ উদ্দেশ্য আশ্রয় করে কর্ম্মস্রোতে ভাসিতে যাইবে, কত কষ্ট, কত দিন রাত খেটে, একটা কাজ খাড়া করবে, তৎক্ষণাৎ মায়ার অঙ্গুলিস্পর্শে হুড়মুড় করিয়া সব পড়িয়া যাইবে। এ অতি সত্য। কোথায় শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় বুদ্ধ, কোথায় শঙ্কর, কোথায় ঈশা, তাঁহারা প্রাণ দিয়া জগতের কল্যাণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু জগৎ যে জগৎ সেই জগৎই রহিয়াছে। হতে পারে, দু চার দিনের জন্য ঐ সকল মহাপুরুষের আগমনে এক মঙ্গলের হাওয়া পৃথিবী পবিত্র করে। কিন্তু সে দু চার দিন আর অনন্ত ভবিষ্যৎ—কত ব্যবধান!!

তাই সুধী ব্যক্তি মায়াকে প্রণাম করিয়া বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও", বালকের মত কাঁদিয়া মাকে বলেন, "মা, তুমি মারিলে মারিতে পার, রাখিলে রাখিতে পার; আমাকে ছাড়িয়া দেও। যদি একান্তই ছাড়িয়া না দিবে, তবে সেই দিব্য দৃষ্টি দেও, যাতে নিত্য দেখ্‌তে পাই, এ লীলা তোমারই। যাতে দেখ্‌তে পাই, সুখের পশ্চাৎ তুমি, দুঃখেরও পশ্চাৎ তুমি, মৃত্যুর পশ্চাতে তুমি, জীবনের পশ্চাতেও তুমি, এক অম্বারূপিণী তোমাতে বিশ্ব পরিপূর্ণ।" ইহার নাম আত্মনিবেদন, মহামায়ার চরণে শরণ লওয়া, ইহাই ভক্তি।

অপরদিকে জ্ঞানী মহামায়ার দুরন্ত সন্তান, মাতৃঘাতী। মায়ার দুরন্ত ছলনা দেখে জ্ঞানী বিবেক মহা অসি হস্তে মায়াকেই বধ করিতে উদ্যত। তিনি আশ্রয়প্রার্থী নন, পুরুষকার তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার পথ মহামায়াকে কেটে যাওয়া। রূপ, গুণ, নাম, যতই সাম্‌নে আসুক, তিনি আর তাতে প্রতারিত হন না। বিবেকমাহাত্ম্যবলে সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করে নামরূপাতীত স্বস্বরূপানুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত।

ভক্তই হউন, আর জ্ঞানীই হউন, যতদিন মহামায়ার অন্তরে অবস্থিত, ততদিন তাঁহাকে প্রতারিত করা দুঃসাধ্য। ফল না পাকিলে পড়িবে না, বৃদ্ধ না হইলে মরণ নাই,—এই মহামায়ার রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। না পাকিলে মরিবার যো নাই। অপঘাতমৃত্যু, বাল্যযৌবনে মৃত্যু যেন অস্বাভাবিক। মুক্তি, কি না, অহংকারের সমূলে বিনাশ। এ বিনাশ অপঘাতমৃত্যু নয়, বাল্যযৌবনের মৃত্যুর ন্যায় ফাঁকি দিয়ে পালান নয়। যদি যথার্থ নাশ বলে কিছু থাকে, তা এই মুক্তি। এ মরণে মরিতে হইলে, অতি পক্ক, অতি বৃদ্ধ হইতে হইবে। জ্ঞানীকে বিবেকবৃদ্ধ হইতে হইবে; ভক্তকে ভক্তিতে পরিপক্ক হইতে হইবে। একটু কাঁচা থাকিলে চলিবে না। যতদিন কাঁচা থাকিবে, তত দিনই এই সংসার বৃক্ষের ডালের সহিত সংযোগ অচ্ছেদ্য। ভক্তকে ভক্তির "কড়ার কড়া তস্য কড়া" বোঝাইয়া দিতে হইবে। জ্ঞানীকে অনাত্ম-বুদ্ধি দূর করে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আত্মবুদ্ধি হইতে হইবে। ক্রমে যেমন ভক্তি-জ্ঞানের সম্যক্ পরিপক্কতা আসিবে, অমনিই মায়ার নিত্যাসিদ্ধ নিয়মবলে পাকা ফল আপ্‌নিই পড়িয়া যাইবে। ইহাই শেষ নাশ বা মুক্তি।

মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণমিশনের কার্য্যবিবরণ।

(১৮৯৭ হইতে ১৯০২ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত।)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৮৯৭ সালে মান্দ্রাজ নগরে যাইয়া তদবধি তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার কার্য্যের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের বিবরণ সঙ্কলিত করিলাম।

প্রথমতঃ ইনি যাইয়া পরমহংসদেবের কতকগুলি মান্দ্রাজী ভক্তকর্তৃক পরিচালিত ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকার আফিসে বাস করেন। শীঘ্রই ইহার কতকগুলি ছাত্র জুটে। তাহারা নিয়মিত ভাবে তাঁহার ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় উপদেশ শুনিতে আসিত। মান্দ্রাজের অন্তর্গত ময়লাপুর নামক স্থানে তাঁহার প্রথম কার্য্য আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ মান্দ্রাজের নানাস্থানে ইহাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার জন্য অনেকগুলি শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। মান্দ্রাজবাসীরা তেলুগু ও ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা বুঝেন না। কাযে কাযেই ইহাঁকে ইংরাজীতেই সমুদয় বক্তৃতা দিতে হয়। ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, সুতরাং ইহাঁদের সুবিধার জন্য প্রাতে ও বৈকালে শাস্ত্রব্যাখ্যা হইয়া থাকে। মান্দ্রাজের বিভিন্ন স্থানে দশটী এরূপ শিক্ষাসমিতি আছে। তদ্ব্যতীত মান্দ্রাজের ৫ মাইল দূরবর্ত্তী সৈদাপেট নামক স্থানের কতকগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধে তথায় একটী গীতাপাঠসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ছাত্রসংখ্যা তিন শতের অধিক। বলা বাহুল্য, এই শিক্ষার জন্য কোনরূপ বেতন গ্রহণ করা হয় না। উপনিষদ্, গীতা, সাংখ্যদর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত এই সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত এই কয় বৎসরে মান্দ্রাজ ও তাহার নিকটস্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র সহরে সর্ব্বপ্রকার শ্রোতার সমক্ষে ৩০ টীর অধিক ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের লোক স্বামী বিবেকানন্দের উপর এতদূর অনুরক্ত যে, তত্রত্য সালেম জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মপুরী (বানিযামবাড়ী) ও আরাণমপট্টি নামক দুইটী স্থানে বিবেকানন্দ হল নামে দুটী হল সংস্থাপিত হইয়াছে। বেঙ্কট স্বামী নাইডু নামক তত্রত্য জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঐ হল দুইটীর প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাধা করেন। ঐ সময়েই তথায় একটী অবৈতনিক বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হয় এবং পর্ব্বোপলক্ষে তথায়

কাঙ্গালীভোজনেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। তথায় প্রতি বৎসর ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবও মহোৎসাহসহকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবাদিন্ আফিসে একবৎসর থাকিবার পর স্বামীজি স্বর্গীয় বিলগিরি আয়েনগার মহাশয়ের অনুরোধে কর্ণান ক্যাসল নামক তাঁহার সুবৃহৎ প্রাসাদের একাংশে বাস করিতে স্বীকৃত হন। সেই পর্য্যন্ত তিনি তথায়ই বাস করিতেছেন। ময়লাপুরের কতকগুলি ভদ্রলোক স্বামীজির চরিত্র ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মঠের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিশেষ যত্ন করেন। শেষাচার্য্য মহোদয়ের উদ্যোগে দশ জন ভদ্রলোক কিছু কিছু করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ মাসে মাসে ১৬৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন।

সাধারণে এক্ষণে মান্দ্রাজ সহরের মধ্যস্থলে একটা পৃথক্ মঠবাটী নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন এবং ইহার নির্ম্মাণার্থ চাঁদা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশা করা যায়, ধর্ম্মপিপাসু সহৃদয় ব্যক্তিগণের যত্নে ইহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। এ পর্য্যন্ত মঠে সর্ব্বশুদ্ধ আয় হইয়াছে ৬৫৩৲ টাকা। ব্যয়—৫৪০৵১৫, উদ্বৃত্ত আছে ১১২৸৶৫।

এক্ষণে স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী শিক্ষাসমিতির বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সৈদাপুরগীতাসমিতি ব্যতীত সকল গুলিই মান্দ্রাজসহরের বিভিন্ন পল্লীতে অবস্থিত।

(১) ময়লাপুর শিক্ষাসমিতি।

১৮৯৭ সালের অক্টোবরে ইহা প্রথম খোলা হয়। প্রতি শনিবার প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ময়লাপুর দেশীয় মধ্যবিদ্যালয়ের হলে ইহার অধিবেশন হয়। এখানে উপনিষদ্ শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ শেষ হইয়াছে—বৃহদারণ্যক আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সহজ ও সরলভাবে দুরূহ জটিল দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতাও হইয়া থাকে।

(২) হিন্দু কৈশোরসমিতি, মান্দ্রাজ।

এখানে ১৮৯৭ সালের প্রথম হইতেই ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। প্রতি মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময় এই সভাগৃহে স্বামীজির ছাত্রগণ সমবেত হন এখানে প্রধান প্রধান হিন্দুদর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ১৮৯৮ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত পতঞ্জলির যোগসূত্রসম্বন্ধে এবং পরে ১৯০১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। পরে ১৯০১

সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত আরদর্শনের বক্তৃতা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা শ্রোতৃবৃন্দের কিছু কঠিন বোধ হওয়ায় অল্প প্রচলিত অপ্রধান উপনিষদ্‌গুলি (শঙ্করাচার্য্য যে গুলির ভাষ্য রচনা করেন নাই) সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতেছে। ইতিমধ্যে কৈবল্য ও অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ সমাপ্ত হইয়াছে। বক্তৃতা ব্যতীত প্রত্যহ সকলকেই প্রশ্ন করিতে অবকাশ দেওয়া হয়। স্বামীজি অতি সরল ভাষায় সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া থাকেন।

(৩) মান্দ্রাজান্তর্গত ব্ল্যাক টাউনের উচ্চ তত্ত্ববিদ্যালয়ে উপনিষৎসভার বক্তৃতা।

এই সভা ১৮৯৮এর মার্চ্চে শ্রীমৎ পরমহংস বালসুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মস্বামীকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি ১॥ বৎসর ধরিয়া ঈশ ও কেন উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ১৯০০ সালের ৩১শে জুলাই ঐ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় সভার সভ্যগণকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট উপদেশ লইতে বলেন।

সভার সভ্যগণের অনুরোধে স্বামীজি এখানে প্রতি শুক্রবার অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এখানে ইনি কঠোপনিষদ্ সমুদয় ও প্রশ্নোপনিষদের কতক অংশ অবলম্বন করিয়া ১৯ মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮টী বক্তৃতা দিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ মাত্র বক্তৃতা বন্ধ গিয়াছিল। অত্যন্ত পরিশ্রমের জন্য কিছুদিন বিশ্রাম লইতে হইয়াছিল এবং বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য গুরুভাইগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এক মাসের উপর কিছু সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে সভার সভ্য হইতে গেলে কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিতে হইত। স্বামিজি আসিয়া এই প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সকলে বিনা ব্যয়ে ইঁহার বক্তৃতা শুনিতেছে। কোন ছাত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক কিছু দিতে আসিলেও স্বামীজি তাহা গ্রহণ করেন না।

ছাত্রগণ যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিতেছেন, স্বামীজি অতি সরল ভাষায় নানারূপ উদাহরণ দিয়া, কখন বা রূপকের সাহায্যে অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সকল ছাত্রদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। তাঁহার সদা প্রফুল্ল মুখ, তাঁহার বক্তৃতাকালীন গাম্ভীর্য্য, প্রশ্নের উত্তর দিবার কালীন আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা, তাঁহার অপূর্ব্ব তর্কশক্তি, প্রশ্নকর্ত্তার ধারণার উপযোগী উত্তরদান তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের অতি প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। উপনিষদ্

ব্যাখ্যা ব্যতীত আরও অনেক বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে। নিম্নে তাহার কতক গুলি উল্লিখিত হইল।

১৯০০ সাল

আগষ্ট ১০ ... সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মের ব্যাখ্যা।
„ ১৭ ... সচ্চিদানন্দ নিত্যপরিপূর্ণ।
„ ২৪ ... দেশকালনিমিত্ত।
„ ৩১ · সাংখ্যদর্শন।
সেপ্টেম্বর ৭ ... চাতুর্ব্বর্ণ্য, আগম ও নিগম।
„ ১৪ .. ব্রহ্মাণ্ড কি?
„ ২১ ... জড় ও চৈতন্য।
„ ২৮ .. মায়া।
অক্টোবর ৫ ... সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি ও প্রকৃত সন্ন্যাসী কে?
„ ২৬ প্রণব।
নবেম্বর ২ ... ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচরম্।
„ ৯ ... প্রাণ ও মন।
„ ১৬ ... পঞ্চকোষ ও জ্ঞানীর লক্ষণ।
„ ২৩ .. জন্মান্তরবাদ।
„ ৩০ · ধ্যান ও দর্শনের তিন যুগ।
ডিসেম্বর ৭ পরমাণুবাদসম্বন্ধে পাঁচজন দার্শনিকের মত এবং এক কিরূপে বহু হইল?
„ ১৪ ... আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এবং বদ্ধ ও মুক্তপুরুষের আনন্দের প্রভেদ।
„ ২১ ... ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তৃত্বাভিমান কিরূপে হয়।

১৯০১ সাল

জানুয়ারি ১১ ... কিরূপে গুরুসেবা করিতে হয় এবং গুরু কে?
„ ১৮ ... ত্রিগুণ ও জ্ঞানীর অবস্থা।
„ ২৫ · অদ্বৈতবাদিগণ জৈমিনিদর্শনকে কিরূপে খণ্ডন করেন?

ফেব্রুয়ারি	১	...	মুক্তিসম্বন্ধে কিমটী দর্শনের মত।
,,	৮	...	মৃত্যু ও সমাধির পার্থক্য।
মার্চ্চ	১	.	জগৎ পক্ষিকুলায়স্বরূপ এবং আত্মতত্ত্ব।
,,	৮	...	আচার্য্যগণের মতভেদ এবং তাঁহাদের ঐক্য।
,,	১৫	...	বিভূতি কি?
,,	২২	...	মনোবিজ্ঞান ও দর্শন।
এপ্রিল	১২	...	প্রকৃত শিষ্য কে?
,,	১৯	.	সৃষ্টি কি এবং কিরূপে সৃষ্টি হয়?
,,	২৬	..	অহঙ্কার কি, আমরা জ্ঞানপাপী কিসে?
মে	১০	.	হিন্দু ত্রৈতবাদ (ত্রিদেববাদ)।
,,	২৪	...	দুঃখই সুখের মূল এবং সুখই দুঃখের মূল।
,,	৩১	.	চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর সবই সেই এক ব্রহ্ম, এবং সমাধিস্থ ও সুপ্ত ব্যক্তির প্রভেদ।
জুন	৭	..	কিছু নয় যাহা, তাহাও কিছু কিরূপে এবং ধর্ম্ম কি?
,,	১৪	...	ঈশ্বর কোথায়?
,,	২৮	.	সাধুগণ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি কিসে?
জুলাই	১২	...	বেদান্তশ্রবণের অধিকারী কে?
,,	১৯		অহংনাশের উপায়।
আগষ্ট	৯	...	নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদে প্রভেদ।
সেপ্টেম্বর	২০	...	বৈরাগ্য।
,,	২৭		সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত।

১৯০২ সাল

জানুয়ারি	৩	...	জগতের দুই বিভাগ কি কি?
ফেব্রুয়ারি	১৪	.	গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যা।
,,	২৮	...	ধ্যান ও সমাধি।

মধ্যে মধ্যে অনেক সন্ন্যাসী, এবং সাহেবও তাঁহার এই সকল বক্তৃতায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার উচ্চভাবসমন্বিত বক্তৃতাশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন।

(৪) কমলীশ্বরণ পেট্টা শিক্ষাসমিতি।

১৮৯৮এর নবেম্বরে ইহা খোলা হয়। ঐ স্থানের শিবমন্দিরের মণ্ডপে এই সমিতির অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ ভগবদ্গীতার অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। ২॥ বৎসর ধরিয়া গীতা আলোচনার পর ১৯০১ সালের মে মাসে উহা শেষ হয়। বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন মত সম্বন্ধেও কতকগুলি মনোহর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ছাত্রগণকে বেদান্তের ধারণায় সক্ষম দেখিয়া তিনি সম্প্রতি পঞ্চদশীনামক বেদান্তগ্রন্থ পাঠ করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রতি সোমবারে প্রাতে ৭টা হইতে ৮॥০টা পর্য্যন্ত সমিতির অধিবেশন হয়। ছাত্রগণের মধ্যে চারিজন স্বেচ্ছাক্রমে মঠের সাহায্যার্থ কিছু কিছু দিয়া থাকেন।

(৫) এগমোর সমিতি।

মান্দ্রাজনগরস্থ এগমোর পল্লীর সাহিত্যসভার অধীনে ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটী ধর্ম্মসমিতি স্থাপিত হয়। তদবধি স্বামীজি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান ইন্টারপ্রেটার, রামচন্দ্র রাও বি, এর গৃহে প্রতি রবিবার অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতা ১৯০১ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত হয়। তার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অধ্যাত্মরামায়ণের উপর বক্তৃতা চলিতেছে। বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষেও, বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা দিয়াছেন।

(৬) মান্দ্রাজান্তর্গত রায়পুরমে গীতাসমিতি।

১৯০১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রায়পুরমে গীতাসমিতি খোলা হয়। এ পর্য্যন্ত ১৪ বার সভার অধিবেশন হইয়াছে। ১০ জন ছাত্র লইয়া সমিতির আরম্ভ; এক্ষণে ১৫ জন ছাত্র হইয়াছেন। প্রথমে 'ধর্ম্মের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা হইয়া সভার আরম্ভ হয়। তৎপরে গীতার উপক্রমণিকাস্বরূপে একটী বক্তৃতা হইয়া গীতাসম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম দুই অধ্যায় ইতিমধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে।

(৭) সৈদাপেটস্থ গীতাসমিতি।

সৈদাপেটস্থ বিজয় ভিলাতে ১৮৯৯ এর মে মাসে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। এখানে স্বামীজি প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥০টা হইতে

৮॥০টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। যদিও ভগবদ্গীতাসম্বন্ধেই প্রধানতঃ বক্তৃতা হইয়া থাকে, তথাপি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক জটিল প্রশ্নেরও মীমাংসা করিয়া দেন আর সকল প্রশ্নেরই অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত উত্তর দিয়া থাকেন।

যদিও ছাত্রসংখ্যা ১৫। ২০ টীর অধিক হইবে না, তথাপি তিনি মান্দ্রাজ হইতে এই পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিয়মিতরূপে প্রতি শনিবার সৈদাপেট নগরে যাইয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা হইয়া গিয়াছে। স্বামীজি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীশ্চিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের সমন্বয় বিষয়িণী অনেক বক্তৃতাও দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি এমন উদার ভাবের হইয়াছিল যে, অনেক খ্রীশ্চিয়ান ও মুসলমান ভদ্রলোকও অনেক সময় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতার নিঃস্বার্থপরতার ভাব খুব হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। এই সভার একজন সভ্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতার জন্য সাধারণকে ৪০০০ টাকা মূল্যের একটী হল দান করিয়াছেন।

(৮) চিন্তাদ্রিপেট্টা সমিতি।

ইহা ১৮৯৭ সালের মধ্যভাগে খোলা হয়। ভগবদ্গীতা সমুদয় শেষ হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৮ সালের শেষ ভাগ হইতে এখন পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত চলিতেছে।

কেন ?

কি অভাব বিধাতার মনে ?
কেন হল জগৎ সৃজন ?
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু সনে
কেন সদা কোরে আলিঙ্গন ?

কেন রে অমৃত ফল পাশে ?
কালকূট প্রাণিবিনাশন
কেন রে ক্ষণিক সুখ আশে
ধায় নর যথায় মরণ ?

নরনারী সৃষ্টি কেন তবে
অভিপ্রায়—সৃষ্টি বৃদ্ধি তরে?
তবে প্লেগ দুর্ভিক্ষ মরণ
কেন ধরা মাঝেতে সঞ্চরে?

কেন ফোটে বাগানেতে ফুল,
হাসি হাসি যেন মুখ খানি,
সৌরভেতে করয়ে আকুল,
গন্ধগ্রাহী যত আছে প্রাণী?

রূপের ঘটায় কেন হায়,
নয়নেরে মনেরে মজায়?
কেন রে আবার ভানুতাপে
দুদিন বাদেতে ঝরে যায়?

কেন পাখী ডাকে শাখী পরে—
আনন্দেতে কূজন ছড়ায়?
কেন বা সে কোকিল কুহরে?
সবাকার পরাণ মজায়?

শিকারীর গুলি লেগে পুনঃ-
কেন হায় পড়ে ভূমিতলে,
ছটফটি হয় রে অজ্ঞান,
সে কাকলী যায় তার চলে?

কেন এত ভালবাসা বাসি?
কেন এত মান অভিমান?
কেন এক দণ্ড ফুটে হাসি?
কেন পুনঃ বিকট শ্মশান?

কেন এত জীবনের স্পৃহা?
কেন এত যত্ন প্রাণ তরে?
দুদিনের তরে যদি সব,
কেন তবে প্রাণী খেটে মরে?

কোমলে কঠোরে কেন খেলা
দেখি নিতি এই ভবমাঝে ?
কেন হাসি কান্না সুখ দুখ
পাশাপাশি ধরায় বিরাজে ?

কেন এত যশের বাসনা—
দুদিনের পরে যার শেষ ?
কেন এত ধনের কামনা—
ভস্মরাশি যার অবশেষ ?

কেন এত বাদ অনুবাদ ?
কেন এত দর্শন বিজ্ঞান ?
কেন এত মত মতান্তর ?
পেয়েছ কি কিছু হে, সন্ধান ?

রহস্য কি ? ওহে মতিমান,
দিতে কি পার হে বুঝাইয়ে ?
কেন সদা ঘুরি ভবমাঝে ?
কেন সদা মোহেতে মজিয়ে ?

এই সব তত্ত্ব ভেবে ভেবে,
প্রাণ সদা উদাস উদাস,
কর্ম্ম কিছু নাহি ভাল লাগে,
শান্ত হল অন্তর আকাশ।

অপূর্ব্ব ভাবেতে মগ্ন মন,
দেখিনু অপূর্ব্ব লীলা ভবে,—
আনন্দেতে উৎপত্তি সবার,
আনন্দেতে বর্ত্তমান সবে।

আনন্দেতে হবে পুন লয়,
আবার উঠিবে তাহা হতে,
মজ্জমান, পুনঃ ভাসমান,
নিত্যকাল আনন্দের স্রোতে।

তত্ত্বজ্ঞানে আনন্দ উদয়,
ভোগবুদ্ধি অজ্ঞানের মূল ;
সাত্ত্বিবুদ্ধি হলে উপার্জ্জন,
পাইবে হে, ভবার্ণবে কূল।

অহিন্দু হিন্দু হইতে পারে কি না ?

(স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।)

প্রবুদ্ধ ভারত হইতে গৃহীত।

প্র। যে সকল হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া উচিত কি না ?

উ। নিশ্চয়ই উচিত। তাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া অনায়াসে যাইতে পারে এবং করা উচিত। তাহা না হইলে, দিন দিন আমাদের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন, যখন মুসলমানগণ ভারতে আসেন, তখন হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটি ছিল। এখন হিন্দুর সংখ্যা বিশ কোটি মাত্র। আবার কেহ হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে হিন্দুসমাজের সংখ্যা হ্রাস হয়, শুধু তাহাই নহে, সে হিন্দুসমাজের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আবার অনেকে কেবল তরবারির চোটে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ান হইয়াছে। তাহাদের সন্তান-সন্ততিই এক্ষণে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ানরূপে বিরাজিত। ইহাদিগকে পুনর্ব্বার হিন্দু না করিবার কারণ কি ? আর যাহারা স্বাভাবিক হিন্দুসমাজের বহির্ভূত, তাহাদের অনেককে প্রাচীনকালে হিন্দু করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং এখনও এইরূপে হিন্দুসমাজের ভিতর গ্রহণ করার ব্যাপার চলিয়াছে। শুধু অসভ্যজাতি, ভারতবহির্ভূত অন্যান্য জাতি এবং মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে ভারত আক্রমণকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ই যে এইরূপে হিন্দুসমাজে গৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে, পুরাণে যে সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহারাও এইরূপ অহিন্দুজাতি হইতে গৃহীত, ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দু হইতে গেলে অবশ্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যাহারা কেবল তরবারির বলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, (যেমন কাশ্মীর ও নেপালে দেখা যায়) অথবা যে সকল বিধর্ম্মিগণ হিন্দু হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে কোন প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করা বিহিত নহে।

প্র। কিন্তু স্বামীজি, ইহাঁরা কোন্ জাতির অন্তর্গত হইবেন? অবশ্য তাঁহাদের কোন জাতির অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক; তাহা না হইলে তাঁহারা অবশ্য হিন্দুদের সহিত মিশিতে পারিবেন না।

উ। স্বধর্ম্মত্যাগীরা পুনর্ব্বার গৃহীত হইলে, অবশ্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতিতে যাইবে। আর নূতন যাহারা আসিবে, তাহারা নিজেদের জাতি নিজেরাই গঠন করিবে। বৈষ্ণবেরা ইহা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে এবং হিন্দুবহির্ভূত জাতি হইতেও অনেকে আসিয়া এই বৈষ্ণব জাতি গঠন করিয়াছে—আর ইহাঁদের, সমাজে বেশ একটু প্রতিপত্তিও আছে। রামানুজাচার্য্য হইতে চৈতন্যদেব পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপ করিয়াছেন।

প্র। ইহারা কোথায় বিবাহ করিবে?

উ। অবশ্য এখন যেমন করিয়া থাকে, নিজেদের মধ্যে।

প্র। যাহারা বিধর্ম্মী হইয়া গিয়াছে, তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে কি নূতন জাতিগত নাম দিতে হইবে?

উ। হাঁ, নামে যথেষ্ট কায হয় বৈকি।

প্র। উহারা কি হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ ভাবের ভিতর হইতে কোন ভাব নিজেরা বাছিয়া লইবে, না, আপনি তাহাদিগকে কোন বিশেষ ধর্ম্মভাবের উপদেশ দিবেন?

উ। এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? উহারা আপনারাই আপনাদের উপযোগী ধর্ম্ম বাছিয়া লইবে। তাহা না হইলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলভাবেরই উপর আঘাত করা হইবে। হিন্দুধর্ম্মে যে যেরূপ ইচ্ছা, ইষ্ট নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে।

অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ যেরূপ সঙ্কল্প করে, সেইরূপ হইয়া থাকে। বাস্তবিক আমরা যদি নিজেদের অন্তর একটু অভিনিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করি, তবে বুঝিব, প্রকৃতপক্ষে সমুদয় শক্তি আমাদের ভিতর গূঢ়ভাবে রহিয়াছে। আমরা নিজেদের চিনি না বলিয়াই ইচ্ছামত কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারি না। এই স্থূলজগতের পশ্চাতে সূক্ষ্ম জগৎ রহিয়াছে। নিয়ম এখানেও যেমন, সেখানেও তেমন। সূক্ষ্মজগৎ কবিকল্পনা নহে, উহা একটী বাস্তবিক সত্তা। চিন্তাও বস্তুবিশেষ। চিন্তার বলে এক মন অপর মনের উপর অল্লাধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এই শক্তি যখন তীব্রভাবে কার্য্য করে, তখন আমরা যাহাদিগকে অলৌকিক বলি, সেই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয় দ্বারেণ উক্তং সম্যগবধার্য্য অনুষ্ঠায় যোগী পরং প্রকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমুপৈতি প্রতিপদ্যতে আদ্যং আদৌ ভবং কারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ২৮।

ভাষ্যানুবাদ। যোগের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর—সম্যগ্‌ভাবে বেদ অধ্যয়ন করিলে, সর্ব্বাঙ্গের সহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তপস্যা সকল সুতপ্ত হইলে এবং সকল প্রকার দানের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলে, অথবা এই সকল কার্য্য মিলিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে যে পুণ্য ফল অর্থাৎ পুণ্যের ফল সুখাদি হয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সপ্ত প্রশ্নের নির্ণয় দ্বারা উপদিষ্ট যোগবিষয়টী জানিতে পারিলে যোগী সেই সকল পুণ্যফলকে অতিক্রম করিয়া যায় এবং এই যোগের বিষয়ে সম্যক্ প্রকার অবধারণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে যোগী "পরম" প্রকৃষ্ট ঈশ্বরভাবস্বরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থান "আদ্য" আদিতে ভব অর্থাৎ কারণ ব্রহ্মস্বরূপ ইহাই অর্থ। ২৮।

ইতি ভগবদ্‌গীতার শঙ্কর ভাষ্যে তারকব্রহ্ম যোগাধ্যায়ে
ব্রহ্মার নির্দ্দেশনামক অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

নবম অধ্যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১॥

অন্বয়। অনসূয়বে তে ইদং তু গুহ্যতমং বিজ্ঞান সহিতং জ্ঞানং বক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে। ১।

মূলানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন। তুমি অসূয়াশূন্য, তোমাকে এই পরম গোপ্য বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান বলিতেছি, যাহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ১।

ভাষ্য। অষ্টমে নাড়ী দ্বারেণ যোগঃ সগুণ উক্তঃ। তস্য চ ফল মগ্ন্যর্চ্চিরাদি ক্রমেণ কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ মেবানাবৃত্তিরূপং নির্দ্দিষ্টম্। তত্রানেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফল মধিগম্যতে নান্যথেতি তদাশঙ্কা ব্যাবিবৃৎসয়া। (শ্রীভগবানুবাচ) ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণ মুক্তং চ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু তদ্‌বুদ্ধৌ সন্নিধী-কৃত্যেদমিত্যাহ তু শব্দো বিশেষ নির্দ্ধারণার্থঃ। ইদমেব সম্যগ্‌জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষ-প্রাপ্তিসাধনং "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "একমেবা দ্বিতীয়" মিত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। নান্যত্। "অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্য রাজানঃ তে ক্ষয্যলোকাভবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ, তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি অনসূয়বে অসূয়া রহিতায়। কিং তদ্‌জ্ঞানং কিং বিশিষ্টং বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তং। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসে অশুভাৎ সংসার বন্ধনাত্। ১।

ভাষ্যানুবাদ। অষ্টম অধ্যায়ে নাড়ীদ্বারা সগুণধারণাযোগ উক্ত হইয়াছে। অগ্নি ও অর্চ্চিঃ প্রভৃতি মার্গানুসারে কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি লক্ষণ অপুনরাবৃত্তিরূপ ফল ও ধারণাযোগের দ্বারা পাওয়া যায়, তাহাও বলা হইয়াছে। তাহার পর এইক্ষণে এই একই প্রকারে মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হইতে পারে (ইহাতে অন্য কোন উপায় হয় ত নাই) এই প্রকার শঙ্কা নিবৃত্ত করিবার অভিলাষে (ভগবান্ বলিতেছেন যে) "এই" বক্ষ্যমাণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে উক্ত যে

ব্রহ্মজ্ঞান তাহাই মনে করিয়া "এই" এই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। "তু" এই শব্দটীর দ্বারা বিশেষ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্ব জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন। "বাসুদেবই সকল পদার্থ" "এই সকল বস্তু আত্মাই" "একই অদ্বিতীয়" ইত্যাদি স্মৃতি ও শ্রুতি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। "যে সকল সাধারণ নৃপতিগণ এই আত্মাতে ভেদ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুনরাবৃত্তি লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ই মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন হইতে পারে না। "তে" তোমাকে (তুমি কেমন) "অনসূয়ু" অসূয়া রহিত, "গুহ্যতম" গোপ্যতম বলিব। কি তাহা? "জ্ঞান" কিরূপ জ্ঞান? বিজ্ঞান সহিত অনুভবযুক্ত। যে জ্ঞানকে "জানিয়া" পাইয়া (তুমি) "অশুভ" সংসার বন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করিবে। ১।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২॥

অন্বয়। ইদং (আত্মজ্ঞানং) রাজবিদ্যা, রাজগুহ্যং, উত্তমং পবিত্রম্, প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং কর্ত্তুং সুসুখং অব্যয়ং। ২।

মূলানুবাদ। এই (আত্মজ্ঞান) সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এবং সকলপ্রকার রহস্যের সার, ইহা উত্তম পবিত্র ইহা প্রত্যক্ষানুভব ও ধর্ম্মাবহির্ভূত, ইহার সম্পাদন করিতে আয়াস হয় না, ইহার ফল অবিনশ্বর। ২।

ভাষ্য। তচ্চ "রাজবিদ্যা" বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতিশয়বত্ত্বাৎ দীপ্যাতে হীয়মতিশয়েন ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাং। তথা "রাজগুহ্যং" গুহ্যানাং রাজা। পবিত্রং পাবনমিদমুত্তমং সর্ব্বেষাং পাবনানাং শুদ্ধিকারণমিদং ব্রহ্মজ্ঞান মুৎকৃষ্টতমং অনেক জন্ম সহস্রসঞ্চিতমপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমূলং কর্ম্ম ক্ষণমাত্রাদ্ ভস্মী ভবতি যতঃ অতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যং। কিঞ্চপ্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষেণ সুখাদেরিব অবগমঃ যস্য তৎপ্রত্যক্ষাবগমং। অনেকগুণবতোঽপি ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টম্ ন তথা আত্মজ্ঞানং ধর্ম্মবিরোধি—কিন্তু "ধর্ম্ম্যং" ধর্ম্মাদনপেতম্। এবমপি-স্যাদ্দুঃসম্পাদ্যং ইত্যত আহ সুসুখং কর্ত্তুং যথাবস্তু বিবেকজ্ঞানং। তত্র অল্পায়াসানাং কর্ম্মণাং সুখসংপাদ্যানাং অল্পফলত্বং দুষ্করাণাঞ্চমহাফলত্বং দৃষ্টমিতি ইদং তু সুখসংপাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদব্যেতীতিপ্রাপ্তং অত আহ "অব্যয়ং" নাস্য ফলতঃ কর্ম্মবদ্ব্যয়োঽস্তীত্যব্যয়ং অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানং। ২।

ভাষ্যানুবাদ। সেই (আত্মজ্ঞান) "রাজবিদ্যা" বিদ্যা সকলের রাজা, কারণ ইহার দীপ্তি অপর সকল বিদ্যা হইতে অধিক। সকল বিদ্যার মধ্যে এই ব্রহ্মবিদ্যা অতিশয় দীপ্তি পাইয়া থাকে। সেইরূপ (ইহা) "রাজগুহ্য" গুহ্য অর্থাৎ রহস্যসমূহের রাজা। "পবিত্র" পাবন "উত্তম" সকল পাবন বস্তুরও শুদ্ধির কারণ এই ব্রহ্মজ্ঞান, এইজন্য ইহা উৎকৃষ্টতম পবিত্র। অনেক সহস্র জন্মের সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি যাবৎকর্ম্মই মূলের সহিত যে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে ক্ষণমাত্রেই ভস্মীভূত হয়, তাহার পবিত্রতার বিষয়ে আর কি বলা যাইতে পারে? আরও এই ব্রহ্মজ্ঞান "প্রত্যক্ষাবগম" সুখাদি বস্তুর ন্যায় যাহার অনুভব প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষাবগম কহা যায়। বহু-গুণ থাকিলেও কোন কোন বস্তু ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইতে পারে ইহা দেখা যায়, কিন্তু এই আত্মজ্ঞান সেই প্রকার নহে, ইহা "ধর্ম্ম্য" অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে অনপেত। এরূপ হইলেও হয় ত ইহার সাধন করিতে বড়ই ক্লেশ পাইতে হয়, এই প্রকার আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য বলিতেছেন যে,—ইহা করিতে আয়াস হয় না, এই জন্য এই আত্মজ্ঞান সুসম্পাদনীয় যেমন রত্ন-বিবেক জ্ঞান। সংসারে এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কার্য্যে আয়াস অল্প এবং যাহা সুখের সহিত সম্পাদিত হয়, সেই কর্ম্মের ফল অল্প হইয়া থাকে, আর দুষ্কর কর্ম্মসমূহের ফল মহৎ হইয়া থাকে। এই আত্মজ্ঞানও সেই নিয়মানুসারে সুখসম্পাদ্যত্ব নিবন্ধন ক্ষীণ হয় অর্থাৎ ইহার ফল বিনাশী হইতে পারে, এই প্রকার সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য বলিতেছেন, "অব্যয়" ফলের ক্ষয়িত্বনিবন্ধন কর্ম্ম যে প্রকার ক্ষয়ি বলিয়া উক্ত হয়, ইহার সেই প্রকার ক্ষয় হইতে পারে না, এই কারণে ইহা অব্যয়, অতএব এই আত্মজ্ঞানের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা করা উচিত। ২।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

অন্বয়। হে পরন্তপ। অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাং অপ্রাপ্য মৃত্যু-সংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে। ৩।

মূলানুবাদ। হে পরন্তপ। এই ধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস নাই, সেই পুরুষ-গণই আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ৩।

ভাষ্য। যে পুনঃ অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতা আত্মজ্ঞানস্য ধর্মস্যাস্য স্বরূপে

তৎফলে চ নাস্তিকাঃ পাপকারিণঃ অসুরাণামুপনিষদং দেহমাত্রাত্মদর্শনং এব প্রতিপন্না অসুতৃপঃ পুরুষাঃ পরন্তপ অপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কা ইতি মৎপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদ ভক্তিমাত্রমপি অপ্রাপ্য ইত্যর্থঃ। নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েন আবর্ত্তন্তে। ক্ব? মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ মৃত্যুসংসারঃ তস্যবর্ত্ম নরকতির্য্যাগাদিপ্রাপ্তিমার্গস্তস্মিন্নেব বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। ৩।

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা কিন্তু "অশ্রদ্দধান" এই আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্মের স্বরূপ ও ফলে শ্রদ্ধাশূন্য (অর্থাৎ) যাহারা নাস্তিক—পাপকারী—অসুরগণের উপনিষদ্ দেহমাত্রেই আত্মদর্শনকে যথার্থ বলিয়া মানিয়া লয়, সেই ইন্দ্রিয়-প্রীতিনিরত পুরুষগণ আমাকে (অর্থাৎ) পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত না হইয়া, আমার প্রাপ্তির সম্ভাবনাও নাই, কিন্তু আমার প্রাপ্তির প্রতি উপায়ের মধ্যে অন্যতম উপায় যে ভক্তিমাত্র, তাহাও না পাইয়া,—ইহাই অর্থ, নিবৃত্ত হইয়া থাকে—অর্থাৎ তাহা নিশ্চয়ই আবর্ত্তন করে। কোথায়? এই "মৃত্যুসংসারবর্ত্মে" মৃত্যুযুক্তসংসারই মৃত্যুসংসার শব্দের অর্থ, তাহার বর্ত্ম অর্থাৎ নরক বা তির্য্যগ্ জন্ম প্রভৃতির প্রাপ্তিমার্গ—সেই মৃত্যুসংসারবর্ত্মে তাহারা পরিবর্ত্তন করে। ইহাই অর্থ। ৩।

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪॥

অন্বয়। অব্যক্ত মূর্ত্তিনাময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি ন চ অহং তেষু অবস্থিতঃ। ৪।

মূলানুবাদ। আমার মূর্ত্তি অব্যক্ত, আমি এই সকল জগৎকে ব্যাপিয়া আছি, সকল প্রাণীই আমাতে অবস্থিত—আমি কিন্তু সেই প্রাণীগণকে আশ্রয় করি না। ৪।

ভাষ্য। স্তুত্বা অর্জ্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ ময়া মম যঃ পরোভাবস্তেন ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ। অব্যক্তমূর্ত্তিনা ন ব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য মম সোহহমব্যক্তমূর্ত্তিঃ তেন ময়া অব্যক্তমূর্ত্তিনা করণাগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তস্মিন্ ময়ি অব্যক্তমূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি। নহি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায় অবকল্পতে অতো মৎস্থানি ময়া আত্মনা আত্মবত্ত্বেন স্থিতানি অতোময়ি স্থিতানি ইতি উচ্যন্তে। তেষাং ভূতানাং অহমেবাত্মা ইত্যতস্তেষ্বস্থিত ইতি মূঢবুদ্ধীনাং অবভাসতে অতো ব্রবীমি ন চাহং

তেষু ভূতেষু অবস্থিতঃ মূর্ত্তবৎসংশ্লেষাভাবেন আকাশস্যাপি অন্তরতমোহহং। নহ্যসংসর্গিবস্তু কচিদাধেয় ভাবেন অবস্থিতং ভবতি। ৪।

ভাষ্যানুবাদ। আত্মজ্ঞানের প্রশংসাপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে শুনিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া বলিতেছেন, "আমা দ্বারা" আমার যে পরভাব (অর্থাৎ পারমার্থিক-সত্তা) তাহা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব "তত" ব্যাপ্ত রহিয়াছে (আমি কি প্রকার?) "অব্যক্ত মূর্ত্তি" অব্যক্ত (অর্থাৎ) ব্যক্ত নহে, "মূর্ত্তি" স্বরূপ যাহার সেই অব্যক্ত মূর্ত্তি অর্থাৎ আমার স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। সেই অব্যক্ত মূর্ত্তি আমাতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতই অবস্থান করিতেছে, কোন বস্তুই নিরাত্মক হইয়া ব্যবহারার্হ হইতে পারে না। এই কারণে সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে (অর্থাৎ) আমিই সকল বস্তুর আত্মা, সুতরাং আত্মাস্বরূপ আমার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সকল বস্তু আত্মবিশিষ্ট হইয়াছে, এই জন্যই তাহারা আমাতে বর্ত্তমান আছে, ইহা বলা যাইতেছে। সেই সকল প্রাণীর আমিই আত্মা, এই কারণে আমি তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি, এইরূপ মূঢ়বুদ্ধিগণ বুঝিয়া থাকে, এই জন্য আমি বলিতেছি, আমি সেই সকল প্রাণীকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করি না। পরিচ্ছিন্ন বস্তুর সংযোগ আছে বলিয়া তাহা যেমন সংযুক্ত হইয়া কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকে, আমার কিন্তু সেই প্রকার পরিচ্ছেদনিবন্ধন বস্তুবিশেষের সহিত সংযোগ হইতে পারে না। কারণ আমি আকাশেরও অন্তরতম (সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন) যে বস্তুর সংসর্গ নাই, তাহা কখনও কোন আধারের আধেয় হইতে পারে না। ৪।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫॥

অন্বয়। ভূতানি চ (অপি) ন চ মৎস্থানি মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য, মম আত্মা ভূতভাবনঃ ভূতভৃৎ (কিন্তু) ন চ ভূতস্থঃ (ভবতি)। ৫।

মূলানুবাদ। প্রাণীনিচয়ও যে বাস্তবিক আমাতে আছে, তাহা নহে। আমার ঐশ্বরযোগ দেখ, আমার আত্মা ভূতনিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদিগকে ধারণও করিতেছে অথচ তাহাদিগকে ইহা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান নহে। ৫।

ভাষ্য। অতএবাসংসর্গিত্বান্মম ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি পশ্য মে

যোগং যুক্তিং ঘটনং মে মম ঐশ্বরং ঈশ্বরস্যেমং ঐশ্বরং যোগমাত্মনো যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিরসংসর্গিত্বাদসঙ্গতাং দর্শয়তি "অসঙ্গোনহি সজ্জতে" ইতি ইদং চ আশ্চর্য্যমন্যতশ্চ ভূতভৃদসঙ্গোঽপি সন্ ভূতানি বিভর্ত্তি ন চ ভূতস্থো যথোক্তে ন্যায়েন দর্শিতত্বাদ্ ভূতস্থত্বানুপপত্তেঃ। কথং পুনরুচ্যতেঽসৌ মমাত্মেতি বিভজ্যাদেহাদিসঙ্ঘাতং তস্মিন্নহংকারং অধ্যারোপ্য লোকবুদ্ধিমনুসরন্ ব্যপদিশতি মম আত্মেতি ন পুনরাত্মন আত্মাঽন্য ইতি লোকবদজানন্। তথাভূতভাবনঃ ভূতানি ভাবয়তি উৎপাদয়তি বর্দ্ধয়তি ইতি বা ভূতভাবনঃ। ৫।

ভাষ্যানুবাদ। আমার এই প্রকার অসংসর্গিত্ব আছে বলিয়াই, ব্রহ্মাদি প্রাণীনিচয়ও (পারমার্থিক ভাবে) আমাতে সংযুক্তরূপে অবস্থিত নহে। আমার "ঐশ্বরযোগ" দেখ, এইখানে যোগশব্দের অর্থ যুক্তি—ঘটনা, যাহা ঈশ্বরের, তাহাকেই ঐশ্বর বলা যায়। ঐশ্বরযোগ এই শব্দের তাৎপর্য্য পরমাত্মার যথার্থস্বরূপ। "অসঙ্গ এই কারণে আত্মা কোন বস্তুতে সক্ত নহে" এইরূপ শ্রুতি ও অসংসর্গিত্বনিবন্ধন আত্মার অসঙ্গতা প্রতিপাদন করিতেছে। এই আর একটী আশ্চর্য্যও দেখ, আমি অসঙ্গ হইয়াও প্রাণীগণের ভরণ করিয়া থাকি, অথচ আমি ভূতস্থ নহি, আমি যে কেন ভূতস্থ নহি, তাহা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং আমি যে প্রাণীগণকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিব, ইহা কখনই উপপন্ন হইতে না। ইহা আমার আত্মা, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতেছে (ঈশ্বরই আত্মা ঈশ্বরের আবার আত্মা কি প্রকারে হইতে পারে ?) দেহাদি সমষ্টিকে বিভাগ করিয়া তাহার মধ্যে কোন একটীতে লৌকিক পুরুষের ন্যায় অহঙ্কারের আরোপ করিয়া লোকবুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বক ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, আমার আত্মা আত্মার আবার আর একটী আত্মা হইতে পারে না। ইহা যেমন লোকে বুঝে না, ভগবান যে সেইরূপ না বুঝিয়া বলিয়াছেন, তাহা নহে। আরও (আমার আত্মা) "ভূতভাবন" যাহা ভূতগণকে উৎপাদন করে, অথবা তাহাদিগকে বাড়াইয়া থাকে, তাহারই নাম ভূতভাবন। ৫।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বগতোমহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬॥

অন্বয়। যথা আকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ মহান তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়। ৬।

মূলানুবাদ। যেমন সর্ব্বত্র বিচরণশীল মহান্ বায়ু সর্ব্বদা আকাশে অবস্থান করে, সেই সকল ভূতনিচয় সর্ব্বদা আমাতে (অসঙ্গভাবে) বিদ্যমান আছে, ইহা তুমি জান। ৬।

ভাষ্য। যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েন উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ যথালোকে আকাশস্থিত আকাশে স্থিতোনিত্যং সদাবায়ুঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগো মহান্ পরিমাণত স্তথা আকাশবৎ সর্ব্বগতে ময়ি অসংশ্লেষেণৈব স্থিতানীত্যুপধারয়। ৬।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা যে ভাবে পরমার্থ বস্তুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এইক্ষণে সেই ভাবেই দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়া তাহাকে বিশদভাবে বুঝান হইতেছে। যেমন লোকে "আকাশস্থিত" আকাশে অবস্থিত (হইয়াই) "নিত্য" সর্ব্বদা বায়ু "সর্ব্বত্রগ" সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে, (এবং) ঐ বায়ু পরিমাণতঃ মহান্ (ও বটে), সেইরূপ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত আমাতে অসংশ্লিষ্টভাবেই (সর্ব্বভূত) আমাতে অবস্থান করিতেছে, ইহা তুমি জান। ৬।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭॥

অন্বয়। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বভূতানি কল্পক্ষয়ে মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি কল্পাদৌ পুনঃ অহং তানি বিসৃজামি। ৭।

মূলানুবাদ। হে কুন্তীনন্দন! ভূতসমূহ প্রলয়কালে মদীয় প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৭।

ভাষ্য। এবং বায়ুরাকাশইব ময়িস্থিতানি সর্ব্বভূতানি স্থিতিকালে তানি সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকাং অপরাং যান্তি মামিকাং মদীয়াং কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে। পুনর্ভূয়স্তানি ভূতানি উৎপত্তিকালে কল্পাদৌ বিসৃজামি উৎপাদয়ামি অহং পূর্ব্ববৎ। ৭।

ভাষ্যানুবাদ॥ এইরূপ বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ স্থিতিকালে সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করে, সেই ভূতসমূহ "কল্পক্ষয়ে" প্রলয়কালে "মামিকা" মদীয় ত্রিগুণাত্মিকা অপরা প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার সেই ভূতনিচয়কে সৃষ্টিকালে আমি পূর্ব্ববৎ উৎপাদন করিয়া থাকি॥ ৭॥

ধ্রুবচরিত্র।

চতুর্থ অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রসভা।

(দেবগণ বেষ্টিত ইন্দ্র আসীন)

(দূতের প্রবেশ)

ইন্দ্র। কহ দূত। কহ কি সংবাদ।

দূত। নিবেদি চরণে দেব।

অমরের বিজয় নিশান

উড়িতেছে চারিদিকে

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে শান্তি বিরাজিছে।

কিন্তু সুরনাথ।

অপরূপ দেখিলাম এক!

ধরণী ভিতর মধুবনে,

ধ্রুব নামে পঞ্চমবর্ষীয় এক শিশু

কঠোর তপস্যা করে;

দীপ্ত মধুবন তপোতেজে তার।

শঙ্কা হয় দেব।

পাছে শিশু নিজ তপোবলে

লভে ইন্দ্রলোক;

অমরের ঘটে বা দুর্গতি।

ইন্দ্র। সত্য দূত। যা কহিলে তুমি।

অতি বিস্ময়ের কথা।

পঞ্চমবর্ষীয় শিশু,

শৈশবেই এত তপোতেজ!

না জানি যৌবনে কত তেজস্বী হইবে।

দেব সিংহাসন নিশ্চয় লভিবে।

অঙ্কুরে নিপাত করি ভবিষ্য বিপদ।

কহ দেবগণ। কি উপায় করিব আশ্রয়?

বসন্ত। কি ভয় দেবেন্দ্র।

ইন্দ্রত্ব তোমার, রতিপতি বিদ্যমানে

কে পারে লইতে তপোবলে ?

ধ্রুব ত বালক—চিত্ত তার অতীব চঞ্চল,

এক ফুলবাণে ধ্যান ভঙ্গ হবে,

ইন্দ্রত্বের ভয় সামান্য বালক হোতে ?

ইন্দ্র। মদন। যাও তবে

ঋতুরাজ সহ অবনীমণ্ডলে,

সঙ্গে লহ বিদ্যাধরীগণে,

সাবধানে সুরতান লয়ে

ঢালিয়ে সঙ্গীত সুধা

ভুলাবে ধ্রুবের মন,

ধ্যান ভঙ্গ হয় যেন ত্বরা।

মদন। যথা আজ্ঞা সুরনাথ।

যাই মধুবনে, সঙ্গে লয়ে বসন্ত-সখারে।

পঞ্চ ফুলবাণ যুড়িব কার্ম্মুকে,

অপ্সরীগণের মোহিনী সঙ্গীতে

বালকের চিত্ত হইবে মোহিত

বসন্ত, মদন, নারী—

তিন শক্তি হলে সংযোজিত

চঞ্চল বালক চিত্ত হারাবে সংযম,

ধ্যান ভঙ্গ হইবে অচিরে।

(বসন্তের সহিত প্রস্থান)

অপ্সরা। নীল আকাশে, ধীর বাতাসে, চললো সই ভেসে ভেসে।

নীরদ কোলে, শরীর ঢেলে, ঘুমাতে ঘুমাতে ধ্রুবপাশে ॥

তারকা হীরকে গাঁথিয়ে মালা,

নিতম্বে বাঁধি বিজলী মেখলা,

শ্যাম ধনু বাসে আবরি তনু, ভুলাব ধ্রুবে মোহন বেশে ॥

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(তপস্বিনীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া আলু থালু বেশে সুনীতির প্রবেশ।)

সুনী। কত কানন ঢুঁড়িনু সই, হারান মণি মিলল কই?

তপ। নিতি নিতি শোক গীতি, নাহি গাও রোই স্নেহ।
নয়ননীরে, পাবেনা ফিরে, ডাক কাতরে মাধবে নিয়তই॥

সুনী। কোথা শ্রীমধুসূদন, ফিরে দাও ধ্রুব ধন,
ধরিতে পারি না প্রাণ ধ্রুব বই।

তপ। ভয় কি প্রহরী আছে, সে যে ফিরে কাছে কাছে,
সই বল মাভৈঃ মাভৈঃ॥

সুনী। ধ্রুবের খেলনা, ফুলের গহনা, যায় গড়াগড়ি খেলনি নাই।
(আহা) বাছার চরণ রেখা,
মাটীতে রোয়েছে আঁকা,
ধ্রুবের নাহিক দেখা, ধ্রুব এ জগতে নাই,
শূন্য কুটীরে যাবনা ফিরে, যেতে বোলনা বোলনা সই
জলে কি অনলে দিব প্রাণ ফেলে,
ধোরোনা আমারে বনে ফিরে যাই।

তপ। সখি! আত্মহত্যা মহাপাপ।
হেন বাক্য না আনিও মুখে।
ধ্রুবে তবে পাইবে অচিরে।
ঐ শুন দূরে বীণার ঝঙ্কার,
হরিনামস্রোত বাতাসে বহিয়া আসে।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। (মন) জপ জপ সেই মধুর নাম।
আনে প্রাণে যাহে অনন্ত আরাম॥
কভু জ্ঞানে, কভু গানে,
কভু যোগাসনে, ধ্যানে,
কভু বা বীণার তানে, বল হরিনাম অবিরাম॥

মা সুনীতি।
সম্বর রোদন চারুশীলে!
ধ্রুব তব আছে গো জীবিত,
ধ্রুব হেতু না কর বিলাপ।

সুনী। প্রভো। ধ্রুব জীবিত?
কোথা আছে? বাছা আছে বা কেমন?

নারদ। মধুবনে মগ্ন তপস্যায়।

সুনী। শিশু কি জানিবে দেব তপস্যার ক্রিয়া?

নারদ। শিখায়েছি আমি তারে।
অলৌকিক শিশু তব,
বড় ভাগ্যবতী তুমি
হেন হরিভক্ত শিশু ধোরেছ জঠরে।
সার্থক জীবন তব।
কিছু ভয় নাই জীবনে তাহার,
স্বয়ং শ্রীহরি ফিরে তার পাশে পাশে।
ইন্দ্রাদি দেবতা, শঙ্কিত স্তম্ভিত,
তপোতেজে তার।
পুণ্যবান শিশু—
পুণ্যবতী তুমি জননী তাহার।

সুনী। দেবর্ষি। বড় সাধ মনে,
বারেক দেখিতে ধ্রুবে।
ধরি ও চরণে,
ধ্রুব পাশে দুঃখিনীরে লয়ে চল প্রভো।

নারদ। পতিব্রতে।
ধ্রুব দরশন এবে হবে না তোমার—
কিন্তু হইবে অচিরে।
তপঃ পূর্ণ হয়নি তাহার,—
ধ্রুব পাশে যেও না এখন,
যাইলে তপস্যা ভঙ্গ হইবে তাহার,—
সেই হেতু নিবারি তোমায়।

মা! এস মম সনে,
লয়ে যাই তব স্বামীর নিকটে,
বনবাসে আর হবে না থাকিতে।

সুনী। প্রভো! স্বামীর আদেশে,
নির্ব্বাসিতা আমি,
ইচ্ছা আছে,—স্বামীর আদেশে পুনঃ,
ফিরে যাব নিকটে তাঁহার।
স্বেচ্ছায় স্বামীর আজ্ঞা নারিব লঙ্ঘিতে।

নার। সাধ্বী, পতিব্রতা তুমি!
পূর্ণ হোক বাসনা তোমার;
স্বামীরে তোমার কহিব এখনি,
লইয়া যাইতে তোমা বনবাস হতে।

(প্রস্থান)

সুনী। ভগ্নি! দেবর্ষি আশ্বাসে,
আশ্বস্ত হইল প্রাণ;
কথঞ্চিৎ শান্তি পাইনু হৃদয়ে।

তপ। চল ভগ্নি, গৃহে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মধুবন।

(ধ্রুব তপস্যায় নিমগ্ন—দূরে বসন্ত ও মদনের প্রবেশ।)

বসন্ত। সখে মদন। এই সেই মধুবন।

মদন। হের—ঐ অচল শিখরে বিরাজিছে শিশু,
হের—যোড় করে মগ্ন তপস্যায়,
নিমীলিত আঁখি,
হেন তপোতেজ কভু দেখি নাই;
মলিন তপন জ্যোতিঃ তাপসের তেজে।
সখে। বড় শঙ্কা হয় মনে,

সন্নিকটে যাইতে উহার ;
শঙ্করের কথা পড়ে মনে।
সেই তেজ—সেই মহাজ্যোতিঃ
ডরি—পাছে পুনঃ ভস্ম হই।

বসন্ত। কিবা ভয় সখা।
আমার আদেশে, প্রকৃতি এখনি,
নবসাজ করিবে ধারণ ;
কার্য্য তব করহ পালন।
পিনহ প্রকৃতি শ্যামল বসন,
কিশলয় সাজ কর গো ধারণ,
মুঞ্জর মুঞ্জর মাধবী মুঞ্জরী,
আলিঙ্গ তমালে গলে গলে ধরি ;
ফোট্‌রে কুসুম জুড়িয়া কানন,
ছোট্‌রে ভ্রমর করিয়া গুঞ্জন,
ধীরি ধীরি বহ মলয় পবন,
কুসুম সৌরভ কর বিতরণ।
গাওরে পঞ্চমে কোকিল দম্পতি,
ভুলাও ঝঙ্কারে তাপসের মতি,
দিনু আজ্ঞা ত্বরা পাল অনুমতি।

মদন। কই ঋতুরাজ!
তরু না মুঞ্জরে, নাহি ফোটে ফুল,
ভৃঙ্গ না গুঞ্জরে, নাহি গায় পিককুল।
হে বসন্ত! তব আজ্ঞা হইল লঙ্ঘন,
হের—যেমন তেমনি রহিল কানন।

বসন্ত। সখে! বিস্মিত হইনু আমি ;
ব্যর্থ হোল শকতি আমার ;
হেন জ্ঞান হয়—
আমাপেক্ষা মহাশক্তি নিবসে কাননে।
সখে! ধ্যান ভঙ্গ কর তুমি,
যুড় বাণ ফুলের কার্ম্মুকে।

মদন। সখে! এই ত যুড়িনু বাণ,
এড়ি এই বার—
সখে। কাঁপিছে চরণ, কাঁপে বাহুদ্বয়,
কাঁপিছে হৃদয়;
নাহি বুঝি কারণ ইহার।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

বসন্ত। ঐ শুন সখা। মধুর সঙ্গীতধ্বনি,
আসিতেছে বিদ্যাধরীগণ;
উত্তম সুযোগ এই।
বাঁধ বুক নাহি ভয়,
দৃঢ় হস্তে ধর ধনু,
স্থির চিত্তে স্থির নেত্রে,
লক্ষ্যস্থলে কর শরক্ষেপ।

(গাইতে গাইতে অপ্সরীগণের প্রবেশ ও গীতান্তে প্রস্থান)

মদন। এই ফুলশর করিনু নিক্ষেপ। (বাণক্ষেপ)
হের—শর অর্দ্ধ পথে জ্বলিয়া উঠিল,
ভস্মীভূত হোয়ে শূন্যে মিশাইল;
পূর্ণ মহা তপোতেজে শিশু,
অঙ্গে মম লাগিছে উত্তাপ।
চল সখে! ফিরে যাই ইন্দ্রের সমীপে,
নাহি প্রয়োজন ধ্যান ভঙ্গে আর।
বসন্ত। সখে! গাত্র দাহ হইছে আমার,
আর না তিষ্ঠিতে পারি, কানন ভিতর।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

প্রাণের কথা।

মানুষ কি চায়? কি লাভ করিবার জন্য মানুষ দিবারাত্র নানাবিধ চেষ্টা করিতেছে? বিপুল জনমানবময় নগরের এত উল্লাস উৎসব, এত অবিরাম

কর্ম্মচেষ্টা কিসের জন্ম ? এ কি অলক্ষ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে গতি অথবা ইহার পশ্চাতে কোন গূঢ় অর্থ আছে ? যদি থাকে, মানুষ কি তাঁহা জানে ?

যে এই কর্ম্মস্রোতে পতিত নহে, সেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু এ জগতের মধ্যে এমন কে আছে যে, এই কর্ম্মস্রোতে পতিত নহে ?

ভোগবাসনা অহরহ প্রাণকে উত্তেজিত করিতেছে। যশঃস্পৃহা দিবানিশি আমাদিগকে মাতাইয়া কায করাইতেছে। ইহার ভিতর স্থির হইবার অবকাশ কই ? তবু ইহারই ভিতর খানিকক্ষণ মনকে একটু স্থির করি, এস দেখি।

একটী কথা বেশ বুঝিতে পারি, আমাদের এ অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নহে। আমরা একটা না একটা উত্তেজনা না লইয়া থাকিতে পারি না। তাহাতে বেশ প্রমাণ হয় যে, আমাদের স্বরূপের বিশেষ বিকৃতি, বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না কেন ? একটা কিছু 'আমার' সদাই প্রয়োজন হয়।

'আমার' বুদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শান্তিলাভের চেষ্টা বৃথা। কারণ, যাহাকে বা যে বস্তুকে 'আমার' বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই আপনার ভিতর টানিয়া লইতে, আপনার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাহিরের কোন বস্তু, বাহিরের কোন ব্যক্তিকে আপনার সহিত মিশাইয়া ফেলা যায় না। সাংসারিক প্রেম যতই প্রগাঢ় হউক, তাহারও ভিতর লঘুতা ও অসারতা স্পষ্ট বিরাজিত। এক করিতে প্রবল চেষ্টার সফলতা হয় না। সকলেই প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে আপনার আপনার জীবনের ঘটনা লইয়া আলোচনা করিলে এই ব্যাপার বুঝিবেন। যাহা আমা হইতে পৃথক্, তাহার যেমন পূর্ণ ভোগ হয় না, তেমনি সদাই তাহা হারাইবার ভয়—হারাইলে মহা যন্ত্রণা। থাকিলেও স্বস্তি নাই, না থাকিলেও অস্বস্তি। সংসারের এই অদ্ভুত রহস্যকেই শাস্ত্রকারেরা ও জ্ঞানীরা মায়া বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক, এ কি প্রহেলিকা ! হে ভগবন্, কবে এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে ? কবে 'আমি'র দিকে লক্ষ্য পড়িবে ?

অতি রহস্যের বিষয় এই যে, আমরা যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, নিত্য উপভুক্ত, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে সুখের চেষ্টায় ধাবমান। বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়াও জানি না।

এই জন্য, আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য স্থলে পঁহুছিতে হইলে বিপরীত গতি অবলম্বন করিতে হয়, উজান বাহিয়া যাইতে হয়। উপনিষদে আছে, কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্—কোন ধীর ব্যক্তি মুক্তিলাভের

ইচ্ছা করিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের দিক্ হইতে ফিরাইয়া আত্মাকে দর্শন করিলেন। এই জন্যই শাস্ত্রে বৈরাগ্যের উপদেশ। বৈরাগ্য কেমন? যেমন নদীতে উজান বাহিয়া যাওয়া। যে সংস্কারের উপর সংস্কারের বন্ধন পড়িয়াছে, তাহাদিগকে একে একে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, তবেই আত্মা আপন স্বপ্রকাশ মহিমায় প্রকাশ পাইবেন। উপনিষদ্ বলিতেছেন, এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় অতি দুর্গম। কিন্তু নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। শ্রুতি অভয়বাণী ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন, হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর, আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি—সেই হিরণ্ময়, অজ, অবিনাশী, অব্যয়, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময়, অভয় পুরুষকে জানিয়াছি, তিনি এই সংসারান্ধকারের পরপারে অবস্থিত। তাঁহাকে জানিলে আর জন্মমৃত্যুচক্রে ঘুরিতে হয় না। বেদ বলিতেছেন, তত্ত্বমসি—তুমিই সেই, তোমার ভয় কি? তোমার নিরাশ হবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। এই শ্রুতির পদানুসরণ করিয়া ভক্তগণ বলিতেছেন, 'যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা, জাননারে মন, আমি পুত্র তাঁর' 'দূর হয়ে যা যমের ভটা, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা।' ভয় কি? ভগবান্ বলিতেছেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে'—হে পার্থ, তুমি ক্লীবত্ব ভাব ত্যাগ কর, ইহা ত তোমায় সাজে না। তুমি অনন্তশক্তিধর, তোমাকে এই সকল সংসারের মলিনভাব ত সাজে না। দূর পথে যাইতে হইবে বলিয়া ভয় পাইও না। তিনি 'দূরাৎ সুদূরে' আবার 'ইহান্তিকে চ'—অতি নিকট তোমার তিনি।

তিনটী মতের কথা প্রধানতঃ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। এই তিনটী যেন সেই চরম লক্ষ্যে উঠিবার তিনটী সোপানস্বরূপ। দ্বৈতবাদে ভগবান হইতে আপনাকে পৃথক্ বোধ করিতে বলে। কিন্তু দ্বৈতবাদের গূঢ়মর্ম্ম এই তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন কর। প্রথমে তাঁহার দাস হও। সেই দাস ভক্ত শ্রীহনুমানের কথা স্মরণ কর। 'মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠং' যিনি মনের ন্যায় দ্রুতগামী, যাঁহার বল পবনতুল্য, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি বুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রীরামদূত, সেই ভক্তবীর হনুমানকে হৃদয়ে একবার ধারণ কর। যখন জানকী তাঁহাকে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে মুক্তামালা প্রদান করেন, তখন তিনি দন্ত দ্বারা তাহা কাটিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণদেব উপহাস করিয়া 'বানরের গলায় মুক্তার মালা' বলিয়াছিলেন। তাহাতে হনুমান কিছুমাত্র

বিচলিত না হইয়া উত্তর করেন, আমি দেখিতেছি, ইহার মধ্যে আমার সীতা-রাম আছেন কি না? তখন লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, আচ্ছা, তবে তোমার দেহের মধ্যেও ত সীতারাম নাই, তবে দেহকে খণ্ড খণ্ড কর না কেন, এই কথা বলাতে সেই মহাবীর নিজ বক্ষ বিদারণ করিয়া তাহার মধ্যে সীতারাম প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। যখন তিনি রাবণ গৃহে রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তখন রাবণজায়া মন্দোদরী তাঁহাকে ফললীর প্রলোভন দেখাইয়া ঐ বাণ হরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাহাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মত অপূর্ব্ব কথা আর কেহ কখন শুনিয়াছেন বা শুনিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিলেন, 'আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে, আমি পেয়েছি যে ফল, জনম সফল শ্রীরামকল্পতরু রোপিছি হৃদয়ে। আমি শ্রীরামকল্পতরুমূলে রই, যখন যে ফল বাঞ্ছা করি, সে ফল প্রাপ্ত হই, ফলের কথা কই, সে ফল প্রার্থী নই, আমি যাব তোদের প্রতিফল যে দিয়ে।' যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা এই হনুমানের আদর্শ সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। এই হনু-মান একেবারে দ্বেষভাববির্জ্জিত ছিলেন, অথচ তাঁহার অতিশয় ইষ্টনিষ্ঠা ছিল। তাঁহার সেই কথা এখনও সকলের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, 'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি, তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমল-লোচনঃ।'

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম বাস্তবিক পক্ষে এক হইলেও কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব। আবার গোঁড়া দ্বৈতবাদিগণের মত তাঁহার অদ্বৈতবাদে ঘৃণা ছিল না; কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে কি চক্ষে দেখিয়া থাক? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, আমি যখন শ্রীরামচন্দ্র হইতে আপনাকে পৃথক্ বোধ করি, তখন আমি তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি; যখন আপনাকে জীববুদ্ধি করি, তখন আমি তাঁহার অংশস্বরূপ আর যখন আমার দেহবুদ্ধি থাকে না, তখন আমি ও রামচন্দ্র পৃথক্, এ বুদ্ধি আর থাকে না। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভক্ত হইলেও তিনি একঘেয়ে ছিলেন না, তিনি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিন ভাবেই বিচরণ করিতেন। ভক্ত-রাজ প্রহ্লাদও দ্বৈতবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অদ্বৈতবাদকে ঘৃণা করিতেন না। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু বুকে পাষাণ দিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেন, তখন তিনি ভগবানের স্তব করিতে করিতে ক্রমশঃ

এমন তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন যে, আপনাকে ভগবান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এমন কি, যাঁহাদের প্রেম জগতে আদর্শস্থানীয়, সেই মহাভাগা গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে পরিশেষে আপনাদিগকে তন্ময় বোধ করিয়াছিলেন।

ভক্তিসাধনের জন্য যে শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাবের কথা শুনা যায়, তাহাও একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ঐ ভাবগুলি যেন, ভক্তজীবনের ক্রমোন্নতি দেখাইতেছে। শান্তভাব—যখন ভগবান আছেন এবং তাঁহাকে উপাসনা করা উচিত, এই বোধে উপাসনা হয়, তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয় না, সেই ভাবকে শান্তভাব বলে। এই ভাবে ভগবান ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্। ক্রমশঃ দাস্যভাবের বিকাশ হয়, মনে হয়, যিনি রাজরাজেশ্বর, আমি তাঁর দাস, আমি এ ক্ষুদ্র সংসারের দাস নই, আমি কামক্রোধাদিরিপুর দাস নই, আমি মনের দাস নই। আমি তাঁর চাকর, তাঁর সেবায়ই আমি প্রাণপাত করিব। এই দাস্যভাবে আবার প্রভুর নিকট যে কোন মাহিনা পাইব, তাহা নহে, ধনমান যশের জন্য তাঁহার সেবা করিব না—আমি তাঁহার প্রসাদভিখারী; কেবল একবার তাঁহার কৃপাকটাক্ষপাত হইলেই আমি চরিতার্থ হইয়া যাই। এইটুকু বলা আবশ্যক, দাস বলিতে আমরা যে সকল হীনভাব বুঝি, এই দাস্যভাবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যে ভগবানের দাস, সে ভগবান ব্যতীত আর সংসারের অপর কোন বস্তুর দাসত্বস্বীকার করে না। তাহার অতুল তেজ, অতুল সাহস—সুতরাং এই দাসত্ব বন্ধনের কারণ নহে, ইহা মুক্তিরই সোপানমাত্র। তাঁহাকে পিতা অথবা মাতা বলিয়া চিন্তা করা এই দাস্যভাবেরই বিকাশস্বরূপ। সন্তানের একমাত্র কার্য্য, পিতামাতার সেবা, কিন্তু দাসের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য এই, তাঁহার সহিত তাঁহার পিতা বা মাতার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। 'যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা, জাননারে মন আমি পুত্র তাঁর, আমি সামান্য ত নই, রাজপুত্র হই, পিতৃধনে আমার পূর্ণ অধিকার।' দাসের সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক, পুত্রকন্যার সহিত তাঁহার সম্পর্ক তদপেক্ষা গুরুতর। পুত্র শুধু ভিখারী নহে, পুত্রের অধিকার আছে, পুত্রের জোর আছে। তবে আবার এমন পুত্রও আছেন, যিনি কোন অধিকারও চান না, তিনি পিতামাতার সেবা করিয়াই তৃপ্ত—তিনি নিষ্কাম। আবার পিতা অপেক্ষা মাতা সম্বন্ধ আরও

ঘনিষ্ঠতর। পিতার নিকট সন্তান যতটা দূর দূর বোধ করে, মায়ের নিকট তত নহে। মার কাছে আবদার চলে—মায়ের সঙ্গে যে নাড়ীর টান। সেই মায়ের বরপুত্র ভক্তবর শ্রীরামপ্রসাদের কথা স্মরণ কর। মায়ের কাছে তাঁর কি সরল প্রার্থনা—কি আবদার—কি তাঁহার উল্লাস—কি অকপট উৎসাহ। তার পর সখ্যভাব। এইখানে ঘনিষ্ঠতা আরও ঘনীভূত। সখা সখার নিকট প্রাণের উচ্ছ্বাস অকপট ভাবে বিবৃত করেন, তাঁহাদের মাঝখানে ব্যবধান খুব কম। সেই ভক্তবীর শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের কথা স্মরণ কর। সখার নিকট আর তুমি কি চাহিবে? তোমার সখা ও তুমি ত এক। কেবল সখার সঙ্গে আনন্দ কর—এক প্রাণ অভিন্নহৃদয় হইয়া থাক। বাৎসল্যভাবে ভগবানকে কিরূপে চিন্তা করা যায়, তা বুঝা একটু কঠিন। অতি উচ্চসাধক না হইলে এ মর্ম্ম কাহারও নিকট বোধগম্য নহে। সন্তানের নিকট পিতামাতা কি কিছু চায়? না, পিতামাতা সর্ব্বস্ব সেই সন্তানকে দিয়া কেবল তাহাকে ভালবাসিয়া, তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে আদর করিয়াই তৃপ্ত। এখানে আর 'হে ভগবান, তুমি দাও', এ ভাব নাই—নাও, নাও, তুমি আমার সব নাও—আমি তোমায় কেবল দেখি। মধুরভাবের কথা আর কি বলিব? ইহা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ভাব তাঁহাকে স্বামী বলিয়া ভাবা। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকা রাজমহিষী সেই মীরাবাইয়ের নিজ স্বামীর প্রতি একটী উক্তি উদ্ধৃত করিলেই ইহার মধুরভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মেরো গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
সন্তন সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই।
অব ত বাত ফয়েল গোয়ি যো হোনি হো সো হোই॥
আঁখিয়ন জল সিচ সিচ প্রেমবেল বোই।
দধিমথ ঘৃত কাঢ লীন ছাচ পিবে কোই।
যাকো শিখ ময়ূরমুকুট মীরাপতি সোই॥

(হে রাজা)

আমার স্বামী গিরিধারী গোপাল, দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সাধুদের সঙ্গে বসিয়া বসিয়া আমি লোকলজ্জা খোয়াইয়াছি। এখন এই বাক্য চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। চক্ষের জল সেচন করিয়া করিয়া প্রেমের নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দধি মন্থন করিয়া ঘৃত তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, ঘোলটা আর কে খাইবে?

(অর্থাৎ মনপ্রাণ আমার সব ভগবানে তদগত হইয়া রহিয়াছে। দেহটা লইয়া আপনি কি করিবেন ?) হে রাজা, যাঁহার শিরে ময়ূরমুকুট বিরাজিত, তিনিই মীরার পতি।

ইহা হইতে যে উচ্চতর ভাব, শ্রীমতী রাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব, তাহা সেই অভেদ ভাবের এত নিকটবর্ত্তী যে, তথায় আর পাপপুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, সুখ দুঃখ নাই—সে পরম অনুরাগ আমি কিরূপে বর্ণনা করি ? সেখানে মানুষ উন্মাদ হয়, সংসারের সব বন্ধন আপনি খসিয়া যায়—ঘৃণা লজ্জা ভয় কিছু থাকে না। সে পরমানন্দ সম্ভোগে লীন হইয়া আর কোন দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না। তখন সে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, একেবারে সমাধিস্থ। তার পর যাহা হয়, তাহা যাহার হইয়াছে, সেই জানে। তখন

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর ;
ধীরে ধীরে ছায়া দল, মহালয়ে মিশাইল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা নিরন্তর।
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্যে মিশাইল,
অবাঙ্মনসোগোচর, বোঝে প্রাণ বোঝে যার।

এইরূপ হইয়া যায়।

আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবর লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকি। একটুকু সাধন ভজন করিলাম না—অথচ নানা মতমতান্তরের কথা লইয়া তর্কজালবিস্তার করিয়া দ্বেষাদ্বেষীর তরঙ্গ তুলিয়া থাকি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সামঞ্জস্যকারী জীবনের দিকে একবার লক্ষ্য করি আইস। তাঁহার 'সব সত্য' এই মূলমন্ত্র সঙ্গে লইয়া সমুদয় শাস্ত্রসাগর আলোড়ন করিলে তাহার মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। এই যে ষড়্‌দর্শনেরও আপাত প্রতীয়মান মতভেদ, তাহাও এই সামঞ্জস্যবাদের নিকটে একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। ন্যায় বৈশেষিক ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সাংখ্য তাঁহার অপূর্ব্ব দ্বৈতবাদে জগৎকে বিস্মিত করিয়া জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে পুরুষ প্রকৃতির লীলা দেখাইলেন। বেদান্ত তাহাকে এক তত্ত্বে পর্য্যবসিত করিলেন।

বেদান্তের ভিতরও পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ রহিয়াছে। পরিণামবাদী বলিলেন, যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ হইয়াছে, অতএব জগৎ ব্রহ্মের বিকার। বিবর্ত্তবাদী ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বলিলেন, তিনি জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বিবর্ত্তকারণ। তিনিই জগতের নিমিত্ত কারণ, তিনিই আবার উপাদান কারণ।—তিনিই এই জগৎ। যেমন রজ্জু দেখিয়া সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইতেছে, বাস্তবিক তিনি ব্রহ্মই আছেন—আমরা তাঁহাকে দেখিতেছি না মাত্র। যখন আমি কোন পদার্থ দেখিতেছি, শুনিতেছি বা স্পর্শ করিতেছি, তাহাতে ব্রহ্মেরই অনুভূতি হইতেছে। আমি কেবল জানি না মাত্র। একবার যদি জানিতে পারি, তবে বুঝিব, তিনি আমা হইতে দূরে নহেন, তখন সমুদয় নরনারীর উপর প্রবলা ভক্তি হইবে—সকলকে দেখিলেই প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইবে—তখন ব্যাঘ্রকেও হরি বলিয়া আলিঙ্গন করা সম্ভব হইবে। তখন আনন্দে বলিতে পারিব, ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ—তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ—তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ ; হে প্রভু, তুমি সমুদয় জগতে জন্মাইয়াছ—তুমি সব, তোমাকে বারবার প্রণাম—নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্বঃ—তোমার সম্মুখে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, তোমার চতুর্দ্দিকে নমস্কার। তখনই শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি উভয়ই লাভ হয়। তখনই মানুষের অনাদি মায়াবন্ধন একেবারে কাটিয়া যায়।

জগৎকে—সংসারকে সম্ভোগ করিতে আমরা বড় ভালবাসি। এ কথা ভাবি না, সম্ভোগ কত প্রকারের হইতে পারে। একটী সুন্দর ফুল বাগানে ফুটিয়াছে, চারিদিকে সৌন্দর্য্য ও সুবাস বিতরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাহাকে শত শতবার দেখিতেছে, শত শত বার তাহার আঘ্রাণ লইতেছে, শেষে হয়ত তাহার সম্ভোগের জন্য গৃহে ফুলটী লইয়া গেল। আহা! তাহাকে যে গাছ হইতে ছিঁড়িলে তাহার বেদনা হইবে, তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে, এ কথা কি সে একবারও ভাবিল ? আবার কেহ আছেন, যিনি উহাকে একবার মাত্র দেখিয়াই তাহার পশ্চাতে যে অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি রহিয়াছে, ঐ ফুলটী যাহার একটী ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম প্রকাশমাত্র, তাহাতে ডুবিয়া গেলেন। শত শত উদাহরণ কল্পনা করিয়া লউন, দেখিবেন,

ইন্দ্রিয় হইতে যে সুখ লব্ধ হয়, তাহা অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ উচ্চতর সুখ রহিয়াছে। হে মানব, তুমি অসহিষ্ণু, তাই পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিতে ধাবমান হও, একটু সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর দেখি, দেখিবে, জগতে কি সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। কেবল দোকানদারী, কেবল দোকানদারী! এ ভাব ধীরে ধীরে তাড়াইতে হইবে। শুন নাই কি যে, দেবতারা কিছু ভোগ করেন না, ভোগ্যবস্তু দেখিয়াই তাঁহাদের পরম তৃপ্তি হয়?

ভোগেরও একটী উদ্দেশ্য আছে। আমরা তাহা বুঝি না। নিত্যশুদ্ধ আত্মা যেন কি এক কুহকবশে প্রকৃতির অধীনে পড়িলেন। তার পর তাঁর চেষ্টা কেবল নিজের সেই স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য। প্রকৃতি প্রথমে মানুষকে একেবারে ডুবাইবা ভুলাইয়া রাখিতে চাহে। নিদ্রা, তন্দ্রা, প্রমাদ, আলস্যে অভিভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখে, তার পর একটু একটু করিয়া মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে থাকে। তখন মনে হয়, কিছু করি। কিছু করিতে গিয়া প্রথম আত্মসুখের চেষ্টা। এই আত্মসুখের চেষ্টা যেন আত্মার একটু তন্দ্রা ভাঙ্গা মাত্র। সে সর্ব্বদাই অনুভব করিতে চায়, আমি আছি—আমি কিছু করিতে পারি। তাহারই ফলে, প্রথম সেই সকল কর্ম্ম আরম্ভ করে, যাহাকে সচরাচর গর্হিত কর্ম্ম বলে। বাস্তবিক পাপপুণ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট কোন মাপ কাটি নাই। পাপও আপেক্ষিক, পুণ্যও আপেক্ষিক। যে দিবারাত্র কেবল ঘুমাইয়া কাটায়, তদপেক্ষা যে দিবারাত্র অসৎ কর্ম্ম করিতেছে, সে অধিক পুণ্যবান অর্থাৎ উন্নত বলিয়া আমার ধারণা। ক্রমশঃ যখন বুঝিতে পারা যায়, সুখ আমাদের লক্ষ্য নহে, আত্মার স্বরূপ প্রকাশই লক্ষ্য, তখনই যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহার সূত্রপাত হয়। সৎকর্ম্মের সার পরোপকার। পরোপকারে আপনার আপাত স্বার্থে অনেক সময় ব্যাঘাত পড়ে—কিন্তু তাহাতে আত্মপ্রকাশে সাহায্য হয় বলিয়া, আপনাকে অনন্ত ভাবিবার একটু সুবিধা হয় বলিয়া, তাহাতে পরম আত্মপ্রসাদ হয়। ক্রমশঃ সে দেখিতে থাকে, পরোপকার যথার্থ করিতে গেলে প্রথমে অহংকে একেবারে নাশ করিয়া ফেলিতে হয়, দেখিতে থাকে, বাহ্য কর্ম্মাপেক্ষা মানসিক কর্ম্মের শক্তি বেশী। বাহ্য কর্ম্মও মানসিক কর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। তখন তাহার কর্ম্মের ভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইতে থাকে।

জড়ভাবপ্রধান আধুনিকগণ কর্ম্মের অতিশয় প্রাধান্য দিয়া থাকে। দেশ

কাল পাত্র ধরিতে গেলে আজকাল সমুদয়ই তমোভাবে পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এখন কর্ম্মের দিকে ঝোঁক দেওয়া বিশেষ আবশ্যক, তাহার সন্দেহ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্ম সুখ আয়োজনেই যখন যথেষ্ট আত্মপ্রকাশের সহায়তা হয়, তখন বাস্তবিক নিষ্কাম কর্ম্মের চেষ্টায় যে যথেষ্ট আত্মপ্রকাশের সহায়তা হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু দোষের বিষয় এইটুকু যে, কর্ম্মের প্রাধান্য দিতে গিয়া উহা যেন প্রকৃত চিন্তা, ভাব ও ধ্যানের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া না বসে। মূল লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কর্ম্ম কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না।

অনেক স্থলেই এরূপ হয়, একটী প্রকৃত ভাল ভাবের ঘোর বিকৃতি জন্মাইল। স্বাভাবিক নিয়মে তাহার প্রতিক্রিয়া ঘটিল। এই প্রতিক্রিয়াযুগে যেমন একটী মহা মঙ্গল হয়, অর্থাৎ তাহাতে অকপটতা আনিয়া মানুষের হৃদয় অধিকার করে, তেমনি একটী ঘোরতর অনিষ্ট এই হয় যে, আক্রমণ শুধু বিকারটীর উপর না হইয়া যে মহান্ ভাবের, মহান্ আদর্শের উহা বিকার, তাহারই উপর আক্রমণ হইয়া থাকে। এই কারণে আমাদিগকে সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে এই দুইটী বিঘ্নকে সর্ব্বদা দূর করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথম কপটতা, দ্বিতীয়, উচ্চ আদর্শ লোপের প্রবল চেষ্টা। একটী সামান্য উদাহরণ দিই। লোকের সঙ্গে অন্তরের সহিত শিষ্টাচার করা উচিত, ইহা অবশ্য একটী উচ্চ আদর্শ, কিন্তু অনেক সময়েই এই শিষ্টাচার একটা লঘু লৌকিকতায় পরিণত হয়। সত্যপরায়ণতা বলে, এরূপ অসার কপটাচরণ করিও না। আমি অমনি অকপট আচরণ আরম্ভ করিলাম। আমার হৃদয়ের ভিতর যে হলাহল রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বদা উদ্গীরণ করিয়া স্পষ্টবাদী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। অকপট হইলাম বটে, কিন্তু অপরের সহিত মধুর শিষ্টাচারের আদর্শকে একেবারে উড়াইয়া দিলাম। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবর্গের ব্যভিচার অত্যাচারে যখন ঈশার ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া গেল, তখন ধর্ম্মবীর সংস্কারক মার্টিন লুথারের বজ্রবাণীতে সমুদয় ইউরোপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী লুথার—সন্ন্যাসিনী বিবাহ করিয়া ফের গৃহী সাজিলেন। অকপটতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। যুক্তির প্রাধান্য সগর্ব্বে ঘোষিত হইল। কিন্তু লুথার-প্রণয়িনী একদিন লুথারকে বলিয়াছিলেন, প্রিয়, আমরা যখন কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিলাম, তখন যেরূপ গভীরভাবে উপাসনা করিতাম, এখন উপাসনার

সেরূপ গভীরতা আসে না কেন? এই এক কথাতেই সব বুঝিতে পারা যাইতেছে। রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় রোগীকে একেবারে মারিয়া ফেলি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মসাধনের পথ অতি কঠিন। এই সাধনের পথে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অনেক সময় নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। মনে হয়, সেই আদর্শ এত দূরে, আমার মত পাপী ততদূর যাইতে পারিবে কি না। এই ভাবিয়া হয়ত হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হয়। তখন কি কর্ত্তব্য? তখন চিন্তা করিতে হইবে, তিনি ত আমার দূরে নন, তিনি যে আমার অতি নিকটে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে, শুধু তাহাই নহে, আমিই যে তিনি। এই ভাবিয়া নিরাশা তাড়াইতে হইবে। আর একটী বিঘ্ন অহঙ্কার। একটু সাধনা করিয়াই মনে হয়, আমি একটা মস্ত লোক হইয়াছি। ইহা তাড়াইবার উপায়ও নিজের স্বরূপস্মরণ। যে অনন্তস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, তাহার একটু সামান্য কার্য্যের, সামান্য শক্তির অভিমান কিসের? এ অভিমান ত তাঁতে সাজে না। এই ভাবিয়া আপনাকে অভিমানশূন্য করিতে হইবে। তুমি যে লোকটীকে তোমা অপেক্ষা অবনত মনে করিতেছ, সে যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান। তাহাকে তুমি কেন পাপী, কেন হীন মনে করিয়া নিজের উন্নতি পথের কণ্টক কর? আলস্যবশতঃ আর একটী বিঘ্ন আসে। মনে হয়, সাধন ভজন জপ পূজাদি কর্ম্ম কেন করিব? তাঁহার উপর নির্ভর করিলেই ত সব সিদ্ধি হইয়া যায়। অতএব কেন কর্ম্ম করিব? ইহা বাস্তবিক নির্ভর নহে। নির্ভর হইলে হৃদয়ে পরম শান্তির উদয় হয়। এইরূপ আলস্যপরায়ণ নির্ভরবাদীদের কি সে শান্তি থাকে? নিজের সুখের জন্য সব কায করিতেছি, কিন্তু ভগবানের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে গেলেই নির্ভরের দোহাই। বাস্তবিক অহংনাশ একেবারে না হইলে নির্ভর হয় না। এই জন্য প্রথমে ঘোর ক্রিয়াকর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইয়া পরিশেষে নৈষ্কর্ম্ম্যলাভরূপ নির্ভর অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

তার পর আর একটী ভাব সাধনপথের বড় বিঘ্ন হয়, ইহাকে চলিত কথায় অম্বলচাখা বলে। একনিষ্ঠতা নাই, দৃঢ়তা নাই, ভ্রান্ত উদারতার দোহাই দিয়া সব দিক্ একটু একটু করিয়া দেখিতেছি। Jack of all trades, master of none এরূপে কি ভগবান লাভ হইতে পারে? তাই বলিয়া দ্বেষভাবাপন্ন গোঁড়ারও সাধন পথে উন্নতি একেবারে অবরুদ্ধ। তাঁহার

সমুদয় শক্তি অপর ভক্তের ও অপর দেবের নিন্দাবাদে ব্যয়িত। তিনি কখন নিজের ইষ্টদেবতার চিন্তা করিবেন? এইরূপে ক্রমাগত দুই দিক্ বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। তা নয়, হয় ঘোর যুক্তিবাদী হইয়া সংশাস্ত্র, সদ্গুরু পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিলাম—শেষে হয় ত নাস্তিকই হইয়া পড়িলাম। নয় ত অন্ধবিশ্বাসের কুহকে পড়িয়া নিজের বুদ্ধিকে একেবারে বলি দিয়া মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিলাম! হয় ঘোর বিলাসাবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম, নয়, ঘোর কঠোরতায় শরীরকে একেবারে মাটি করিয়া ফেলিলাম, এমন কি, মনকে পর্য্যন্ত নিস্তেজ করিয়া ফেলিলাম। ভক্তি মানিলাম, ত জ্ঞানকে উড়াইলাম—জ্ঞানবাদী হইলাম ত, ভক্তিকে উপহাস করিতে লাগিলাম। নিরাকারবাদী হই ত, সাকারে সর্ব্বনাশ হয়, এই কথা দিবানিশি ঘোষণা করিতে লাগিলাম, আর সাকারবাদী হই ত, নিরাকারের ধ্যান একেবারে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলাম। দেশীয় ভাব মানিলাম ত, বিদেশীয় ভাবের উপর খড়্গহস্ত হইলাম, আবার বিদেশীয় ভাবের পক্ষপাতী হই ত, দেশীয় সমুদয় ভাবকে অবমাননা করাই জীবনের সার ব্রত জ্ঞান করিলাম।

এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ আমাদের প্রাণে আজকাল পরম শান্তি দিতেছে। এমন সর্ব্বভাবসমন্বয়কারী মহাপুরুষের শক্তি আজ সমগ্র জগতে সঞ্চারিত! তাঁহার সেই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যকারী উপদেশে ধর্ম্মজগতে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। মনে হয়, তাঁহার শক্তি বীজ স্বরূপ হইয়া সমগ্র জগতের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিভাগেই মহা যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

ভারতীয় নারীর উন্নতি।

(স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন)

প্রবুদ্ধভারত হইতে গৃহীত।

ভারতের নারীগণের কি উপায়ে উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয় লইয়া স্বামীজিকে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

নারীজাতির আদর্শসম্বন্ধে আর্য্য ও সেমিটিকদের মতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেমিটিক জাতি স্ত্রীলোককে উপাসনার বিঘ্ন জ্ঞান করে ও তাহার

কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্য করিবার অধিকার নাই, কিন্তু আর্য্যগণের মতে পত্নী ব্যতীত কোন ধর্ম্মকার্য্যই হইতে পারে না।

প্র। তবে কি হিন্দুধর্ম্ম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম নহে?

উ। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম অধিক পরিমাণে পৌরাণিক অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের পর উহার উৎপত্তি। দয়ানন্দ স্বামী দেখাইয়া দিয়াছেন, গার্হপত্য অগ্নিতে হোমরূপ বৈদিক কর্ম্মে পত্নীর সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন, কিন্তু আজকাল সে শালগ্রাম শিলা কিম্বা গৃহদেবতাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না, কারণ, এই সকল পূজা পৌরাণিক ধর্ম্মসঙ্গত।

প্র। তাহা হইলে আপনি আজ কাল হিন্দুগণের মধ্যে নরনারীর এত প্রভেদ, একমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হইয়াছে বলেন?

উ। যেখানে এই প্রভেদ বিশেষ বর্ত্তমান, সেখানে নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে বৈ কি। কিন্তু হিন্দু নরনারীর মধ্যে যে এই প্রভেদের কথা বলিতেছ, বাস্তবিক তাহা আছে কি? ইউরোপীয়েরা আমাদের নরনারীর মধ্যে অধিকারের বিশেষ পার্থক্য আছে বলিয়া হিন্দুসমাজের সমালোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের মতে পূর্ণ সায় দিতে পারি না। শত শত শতাব্দী ধরিয়া নানা অবস্থাচক্রের মধ্যে পড়িয়া আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে এইরূপে রক্ষা করার আবশ্যকতা হইয়াছে। এইটী বুঝিলেই আমাদের এই সকল প্রথার রহস্য বুঝা যায়। তাহাদের কোন বিষয়ে হীনতার দরুন এ সকল প্রথার উৎপত্তি হয় নাই।

প্র। স্বামীজি, আপনি কি তবে হিন্দুসমাজের রমণীগণের বর্ত্তমান অবস্থায়ই সন্তুষ্ট?

উ। কখনই নহে। তবে আমাদের তাহাদিগকে কেবল শিক্ষা দিবার মাত্র অধিকার আছে। তার পর তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই পূরণ করিয়া লইবে। শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আমাদের হাত দেওয়ার অধিকার নাই। জগতের অন্যান্য স্থানের নারীগণ যেমন স্বচেষ্টায় নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম, ভারতীয় নারীগণেরও সে শক্তি আছে। আমাদের আবশ্যক—কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া।

প্র। আপনি বলিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দু স্ত্রীলোকগণের অবনতি হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে, বুঝাইয়া দিবেন কি?

উ। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে কিছু অনিষ্ট হয় নাই, বৌদ্ধধর্ম্মের অব-

নতির পর হইতেই অনিষ্টের সূচনা হইতে লাগিল। সকল সম্প্রদায়েরই কোন বিশেষগুণ থাকে, যাহা দ্বারা তাহার প্রথমে খুব উন্নতি সাধিত হয়। অবনতির সময় আবার তাহাই উহার প্রধান দোষে পরিণত হয়। ভগবান বুদ্ধ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত শক্তিবলে সঙ্ঘ (বৌদ্ধ-সমাজ) গঠন করিয়া সমুদয় জগতে তাঁহার ধর্ম্মবিস্তার করিলেন। কিন্তু সেই সম্প্রদায় সন্ন্যাসিসম্প্রদায়মাত্র। তাঁহার ধর্ম্মও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ছিল। এই জন্য ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর বেশ পর্য্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। তিনি আবার সর্ব্ব-প্রথম মঠপ্রথার প্রচলন করেন। তাহা হইতেই স্ত্রীলোককে পুরুষের নিম্নাসন দিতে হইল। কারণ, বড় বড় মঠস্বামিনীরা কোন কোন বিশেষ মঠাধ্যক্ষের উপদেশ ও পরামর্শ না লইয়া কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। আপাততঃ ইহাতে অতি মনোরম ফল ফলিল। বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ সুপ্রণালীবদ্ধ হইল। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার ফল বিষময় হইল

প্র। কিন্তু বেদে ত সন্ন্যাসের কথা আছে !

উ। অবশ্যই আছে, কিন্তু তথায় এ সম্বন্ধে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় নাই। সকলেই সন্ন্যাস লইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজার সভায় গার্গী বাচক্নবী নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন। সেখানে তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার যে প্রশ্ন করিতে অধিকার নাই, এরূপ কোন কথা উত্থাপিতই হয় নাই। আর প্রাচীন আরণ্য পরিষদ্-সমূহে বালক বালিকার সমান অধিকার ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি পাঠ কর, শকুন্তলার উপাখ্যান পাঠ কর। টেনিসনের 'প্রিন্সেস' আমাদিগকে তাহা হইতে অধিক কি শিখাইতে পারে ?

প্র। স্বামিজি, আপনি অতি আশ্চর্য্যরূপে আর্য্যজাতির প্রাচীন গৌরব আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন, দেখিতেছি।

উ। হাঁ, বোধ হয়, তাহার কারণ, আমি প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় ভূভাগই দেখিয়াছি। যে জাতি বৈদেহী সীতাকে প্রসব করিয়াছিল—(কেহ বলে, সীতা ঐতিহাসিক নহেন, কাল্পনিক, তাহা মানিয়া লইয়াও বলিতে পারি) যে জাতি এরূপ কল্পনা করিতেও সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা নারীজাতিকে যেরূপ ভক্তি করে, পৃথিবীর কোন জাতি সেরূপ করে না। পাশ্চাত্য নারীগণের উপর যে সকল নানাপ্রকার আইনের কঠিন বন্ধন চাপান আছে, আমাদের স্ত্রীলোকদের তাহা নাই। অবশ্য আমাদের অনেক অন্যায় প্রথা আছে,

স্বীকার করি, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিরও অনেক আছে। সকল দেশেরই সামাজিক প্রথাগুলি লোকের হৃদয়ের প্রেম, স্বার্থপরতা, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহের প্রকাশের দ্বারস্বরূপ. এ কথা যেন আমরা না ভুলি। পারিবারিক ধর্ম্মসম্বন্ধে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি, আমাদের ভারতীয় প্রথা অন্যান্য অনেক প্রথা হইতে শ্রেষ্ঠ।

প্র। তবে, স্বামীজি, হিন্দুনারীগণের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে কোন সমস্যা আছে কি?

উ। অবশ্য, আমাদের নারীগণের উন্নতি সম্বন্ধীয় অনেক গুরুতর সমস্যা আছে বৈ কি। কিন্তু সকলই শিক্ষার অদ্ভুত শক্তিতে সাধিত হইতে পারে। তবে আমরা যথার্থ শিক্ষা কাহাকে বলে, এখনও বুঝিতে পারি নাই।

প্র। আপনি শিক্ষার 'লক্ষণ' কি করেন?

স্বামীজি হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, আমি কোন বিষয়ের কখন 'লক্ষণ' করি না। তবে বলা যাইতে পারে, কতকগুলি শব্দ মুখস্থ করার নাম শিক্ষা নহে, মনোবৃত্তিগুলির বিকাশকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে। অথবা যে ভাবে মানুষকে গঠন করিলে তাহার সংবিষয়ে—প্রকৃত বিষয়ে ইচ্ছা হয় এবং সেই ইচ্ছা কার্য্যেও পরিণত করিতে পারে, তাহাকেই শিক্ষা বলা যায়। এরূপ শিক্ষা পাইলে ভারতে আবার সেই প্রাচীন সঙ্ঘমিত্রা, লীলা, অহল্যা-বাই, মীরাবাই প্রভৃতি নারীগণের ন্যায় নির্ভীক বীর নারীর অভ্যুদয় হইবে। তখন এমন সকল নারী জন্মাইবেন, যাঁহারা বীরপ্রসবিনী হইবেন, কারণ, তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম স্পর্শবলে শুদ্ধতা, নিঃস্বার্থতা ও দৃঢ়তা লাভ করিবেন।

প্র। তবে আপনার মত দেখিতেছি, শিক্ষার ভিতর ধর্ম্মভাব থাকা আবশ্যক?

স্বামীজি গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমি ধর্ম্মকে সকল শিক্ষার সার শিক্ষা মনে করি। তবে আমার অথবা অপর কাহারও ধর্ম্মমত তাহাকে শিখাইতে হইবে, তাহা নহে। যেমন অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রের অধিকার বুঝিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্রূপ তাহার নিজের ভাবের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সে যাহাতে উন্নতি করিতে পারে, সেই পথে তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে।

প্র। কিন্তু ধর্ম্মানুসারে ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়া জননী ও পত্নীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং যাহারা ঐ সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে,

তাহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া নারীর উপর প্রবল আক্রমণ করা হইয়াছে, বলিতে হইবে।

উ। মনে রাখা উচিত, ধর্ম্মে যেমন নারীর ব্রহ্মচর্য্যকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে, পুরুষের সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিয়াছে। আরও তোমার প্রশ্নে বোধ হইতেছে, তোমার মনেই এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ গোল রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম মতে জীবাত্মার একমাত্র কর্ত্তব্য আছে, তাহা এই, অনিত্যের মধ্যে নিত্যের অন্বেষণ। এখন জোর করিয়া কেহ বলিতে পারে না, এই পথ দিয়াই তাহা সাধন হইতে পারে, অন্য পথে পারে না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্য, ভাল বা মন্দ, বিদ্যা বা মূর্খতা, যে পথ দিয়াই তুমি সেই চরম লক্ষ্যে পঁহুছিতে পার, তাহারই সার্থকতা স্বীকার করিতে হইবে। এই বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ প্রভেদ। বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল বহির্জ্জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে উপদেশ দেন। তাহা মোটামুটী এক উপায়েই সাধিত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম তাহা বলেন না। মহাভারতের কাকী বকী ভস্মের কথা ও ধর্ম্মব্যাধের কথা মনে করিয়া দেখ। ধর্ম্মব্যাধ এবং সেই গৃহস্থজায়া কেমন সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলিই প্রাণপণে সাধন করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

প্র। তবে, স্বামীজি, আপনি এ দেশীয় নারীগণকে কি বলিতে চান?

উ। পুরুষকেও আমি যাহা বলি, নারীগণকেও তাহাই বলিতে চাই। বলিতে চাই, নারীগণ, তোমরা ভারতের উপর বিশ্বাসী হও, ভারতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসী হও। বীর হও, নৈরাশ্য একেবারে ত্যাগ কর, —নিজেদের হিন্দু ভাবিতে লজ্জিত হইও না, আর ইহাও জানিয়া রাখ, আমাদিগকে অপর জাতির নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু অপর জাতিকে আমাদের যথেষ্ট দিবার আছে ও দিতে হইবে।

ঈশোপনিষৎ।

স্থাবর জঙ্গম যাহা কর নিরীক্ষণ,
সকলে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, হে সুজন।
পরধনে লোভ নাহি কর কদাচন,
এরূপে সর্ব্বদা কর আত্মারে রক্ষণ।

ইহাতে অশক্ত যদি—শুভ অনুষ্ঠান
নির্লিপ্ত হইয়া সদা কর হে ধীমান!
এরূপে শতেক বর্ষ দেহ কাটাইয়া,
পরহিতে নিত্যকাল মন মজাইয়া।
না করে ঈশ্বরচিন্তা কিম্বা শুভ কায,
আত্মঘাতী সেই জন—অতি হীনলাজ,
মৃত্যু পরে সে ত অন্ধতম লোকে যায়,
যথা রবিকর নাহি পশিবারে পায়।
এক, অচঞ্চল, দ্রুতগতি মন হতে,
ইন্দ্রিয় সমূহ যাঁরে না পারে ধরিতে,
স্থির তবু বেগবানে অতিক্রম করে,
তাঁর অধিষ্ঠানে বায়ু ধরায় সঞ্চরে।
চল, অচঞ্চল, দূরে অথচ নিকটে
সবার অন্তরে তবু বাহিরে প্রকটে।
আত্মাতেই সর্ব্বভূত নিরখে যে জন,
সর্ব্বভূতে আত্মা সদা করে নিরীক্ষণ,
ঘৃণা তাঁর দূরে যায় প্রাণ প্রেমময়,
অন্তরে আনন্দ তাঁর সদাই উদয়।
যে অবস্থা পেয়ে নর হয়ে জ্ঞানবান,
সর্ব্বভূতে আত্মা বলি করয়ে গেয়ান;
কোথা থাকে শোক তার সে অবস্থা পেলে?
কোথা থাকে মোহ সেই একত্ব দেখিলে?
সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অশরীর,—
বিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সুধীর—
অকায় হইলে কোথা ব্রণের সম্ভব?
স্নায়ুশিরা থাকে কিসে—নাহি অবয়ব—
মনের নিয়ন্তা যিনি উপরি সবার,
আত্মযোনি বলে নাম স্বয়ম্ভু প্রচার,
সেই ব্রহ্ম দিয়াছেন চিরকাল তরে
প্রজাদের যথাযোগ্য ভোগ্য ভাগ করে।
শুধু কর্ম্মে রত, খালি কর্ম্ম আড়ম্বর,
প্রবেশ করয়ে অন্ধতমের ভিতর।

নাহি কর্ম্ম কিন্তু করে জ্ঞান অভিমান
ঘোরতর অন্ধতমে তার অধিষ্ঠান।
করমের ফল এক জ্ঞানফল আর,
ইহা ধীর জন মুখে হয়েছে প্রচার।
উভয়ে একত্র যেবা করে অনুষ্ঠান,
মৃত্যু অতিক্রমি তার অমৃতে প্রয়াণ।
প্রকৃতির উপাসনা করে যেই জন,
অন্ধতম মাঝে হয় তাহার গমন।
প্রকৃতি ছাড়িয়া করে অজ্ঞেয় ভজন,
ঘোরতর অন্ধতমে তাহার গমন।
প্রকৃতির উপাসনে অজ্ঞেয় ভজনে—
এ দুয়ে পৃথক্ ফল, কহে সুধীগণে।
প্রকৃতিরে ঈশ্বরের প্রকাশ জানিয়া,
যে জন ভজন করে আবিষ্ট হইয়া,
জগতে ঈশ্বর যেই করে নিরীক্ষণ,
মৃত্যু অতিক্রমি তার অমৃতে গমন।
হিরণ্ময় পাত্রে তব, সত্য আবরিত,
হে সবিতঃ, মোর তরে কর প্রকাশিত।
সত্যধর্ম্মা আমি যেন দেখিতে হে পাই,
দেখিয়া তাঁহায় মোর পরাণ জুড়াই।
হে পূষণ্, হে একর্ষে, প্রাজাপত্য, যম,
হে সূর্য্য, কর হে কর রশ্মির সংযম;
কর দেব কর তব তেজ সংবরণ।
তব কৃপাবলে তব অত্যন্ত শোভন
রূপ নিরখিয়া হই বিভোর অন্তর,—
এ কি, এ কি, এ কি হেরি তোমার ভিতর!
এ পুরুষে আর মোতে নাহি কিছু ভেদ!
ঘুচে গেল এত দিনে সব দুঃখ খেদ!!
যায় দেহ—যাক উহা ভস্মসাৎ হয়ে—
প্রাণ—সর্ব্বব্যাপী বায়ু অমৃতে মিশায়ে।
ওঁ ওঁ ব্রহ্মনাম স্মর ওরে মন,—
স্মর আর ভবে যাহা, করিলি সাধন।
অগ্নে, তুমি মোর সর্ব্ব কর্ম্ম অবগত,
ফলভোগ তরে মোরে দেখাও সুপথ।
কুটিল পাতক হতে করহ উদ্ধার,
করি তব পদে কোটি কোটি নমস্কার।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। স্বাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য (অহং) প্রকৃতের্বশাৎ অবশং ইমং কৃৎস্নং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি। ৮।

মূলানুবাদ। নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া প্রকৃতির বশে অবশ সকল প্রাণীনিচয়কে আমি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। ৮।

ভাষ্য। এবমবিদ্যালক্ষণাং প্রকৃতিং স্বীয়াং অবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতঃ জাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়মিমং বর্ত্তমানং কৃৎস্নং সমগ্রমবশমস্বতন্ত্রং অবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। এই প্রকার অবিদ্যালক্ষণ স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত এই সকল বর্ত্তমান ভূতসমূহকে আমি সৃষ্টি করিয়া থাকি, (এই সকল ভূতসমুদায়) প্রকৃতির বশে (অর্থাৎ) স্বভাবের বশে "অবশ" অস্বতন্ত্র অবিদ্যাদিদোষের দ্বারাই ইহারা পরবশীকৃত। ৮।

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

অন্বয়। হে ধনঞ্জয়, তেষু কর্ম্মসু অসক্তং উদাসীনবদ্ আসীনং মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি। ৯।

মূলানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত—উদাসীনের ন্যায় আসীন আমাকে সেই কর্ম্মসমূহ বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না। ৯।

ভাষ্য। তর্হি তস্য তে পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামং বিষমং বিদধতস্তন্নিমিত্তাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সম্বন্ধঃ স্যাদিতীদমাহ ভগবান্ ন চ মামীশং তানি ভূতগ্রামস্য বিষম বিসর্গনিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। তত্র কর্ম্মণামসম্বন্ধত্বে কারণমাহ উদাসীনবদাসীনং যথা উদাসীন উপেক্ষকস্তদ্বদাসীনং আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাৎ অসক্তং ফলাসঙ্গরহিতং অভিমানবর্জ্জিত মহং করোমীতি তেষু কর্ম্মসু। অতোঽন্যস্যাপি কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবঃ ফলাসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণ মন্যথা কর্ম্মভির্বধ্যতে মূঢ়ঃ কোষকারবদিত্যভিপ্রায়ঃ। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। তুমি পরমেশ্বর, নানাপ্রকার ভূতসমূহকে তুমি সৃষ্টি করিয়া

থাক, তাহাই যদি হইবে, তবে সেই প্রাণীসৃষ্টি নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে, এই প্রকার শঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ বলিতে-ছেন যে, সেই প্রাণীগণের সৃষ্টিনিমিত্ত কর্ম্মনিচয় আমাকে (অর্থাৎ) ঈশ্বরকে বন্ধন করিতে পারে না, হে ধনঞ্জয়! সেই কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ না হওয়ার কারণ বলিতেছেন—"উদাসীনবৎ আসীন।" যেমন কোন উদাসীন (সকল বস্তুরই) উপেক্ষা করিয়া থাকে, আমিও সেই প্রকার উদাসীন। আত্মার অবিক্রিয় স্বভাব বশতঃ "অসক্ত" ফলাসঙ্গ রহিত (অর্থাৎ) "আমি করিতেছি" এই প্রকার অভিমান আমাতে নাই (কোথায় অভিমান নাই ?) সেই সেই কর্ম্মেতে। এই কারণে অন্য কোন ব্যক্তি যদি এই প্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারও কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন হয় না, কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়াই মূঢ় জন্তু কোষ-কারের ন্যায় বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই অভিপ্রায়। ৯।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অন্বয়। প্রকৃতিঃ ময়া অধ্যক্ষেণ সচরাচরম্ সূয়তে হে কৌন্তেয় অনেন হেতুনা জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। ১০।

মূলানুবাদ। প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতার বশেই এই সচরাচর বিশ্ব প্রসব করে, হে কৌন্তেয়! এই কারণেই জগত পরিবর্ত্তন করিতেছে। ১০।

ভাষ্য। তত্র ভূতগ্রামমিমং বিসৃজামি উদাসীনবদাসীন মিতিচবিরুদ্ধমুচ্যতে ইতি তৎপরিহারার্থমাহ—ময়া সর্ব্বতো দৃশিমাত্র স্বরূপেণ অবিক্রিয়াত্মনা অধ্যক্ষেণ মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়তে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা। কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ইতি হেতুনা নিমিত্তেন অনেন অধ্যক্ষত্বেন কৌন্তেয় জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং বিপরি-বর্ত্ততে সর্ব্বাবস্থাসু। দৃশি কর্ম্মত্বাপত্তিনিমিত্তাহি জগতঃ সর্ব্বাপ্রবৃত্তিঃ অহমিদং ভোক্ষ্যে পশ্যামীদং শৃণোমীদং সুখমনুভবামি দুঃখমনুভবামি তদর্থমিদং করিষ্যামি এতদর্থ মিদং করিষ্যে ইদং জ্ঞাস্যামি ইত্যাদ্যা অবগতিনিষ্ঠা অবগত্যবসানৈব।

"যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্" ইত্যাদয়শ্চ মন্ত্রা এতদর্থং দর্শয়ন্তি। ততশ্চৈকস্য দেবস্য সর্ব্বাধ্যক্ষভূতচৈতন্যমাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্ব্বভোগানভিসম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনান্তরস্যাভাবে ভোক্তুরন্যস্যাভাবাৎ কিং নিমিত্তেয়ং সৃষ্টি বিত্যত্রচ প্রশ্ন প্রতিবচনে অনুপপন্নে। "কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণেভ্যঃ। দর্শিতং চ ভগবতা অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ইতি। ১০।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বোক্তবাক্যসমূহের মধ্যে "আমি প্রাণীসমূহকে সৃষ্টি করি, উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত।" এই দুইটী বাক্য ভগবান্ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া ফেলিয়াছেন, এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য (ভগবান্) বলিতেছেন যে, আমি সকল স্থানেই একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে বিরাজমান, আমার কোন প্রকার বিকার নাই, আমিই অধ্যক্ষরূপে প্রেরণা করি বলিয়া, আমার মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎকে প্রসব করিয়া থাকে, মন্ত্ররূপ বেদেও ইহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"সেই দ্যুতিময় আত্মা অদ্বিতীয়, তিনি সকল প্রাণীতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, তিনি সকলের ব্যাপক এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, তিনি কর্ম্মমাত্রেরই অধ্যক্ষ, সকল ভূতই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে, তিনি সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ এক ও নির্গুণ।" এই আমার অধ্যক্ষতারূপ নিমিত্তের বশেই হে কৌন্তেয়, এই চরাচরাত্মক ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ বিপরিবর্ত্তন করিতেছে অর্থাৎ ব্যাবহারিক নানা অবস্থাতে পরিবর্ত্তন করিতেছে। জগতের যতপ্রকার ব্যবহার হইতে পারে, জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়াই ঐ সকল ব্যবহার আছে বলিয়া স্বীকৃত হয়। "আমি ইহা ভোগ করিব, আমি ইহা দেখিতেছি, আমি ইহা শুনিতেছি, আমি ইহা সুখানুভব করিতেছি, আমি দুঃখানুভব করিতেছি, আমি সুখের জন্য এই কার্য্য করিব, এই দুঃখনিবৃত্তির জন্য আমি ইহা করিব, ইহা জানিব" ইত্যাদি যত প্রকার প্রবৃত্তি আছে, জ্ঞানের অবলম্বনেই ইহারা সৎ বলিয়া অঙ্গীকৃত হয় এবং জ্ঞানেতেই ইহাদের অবসান হইয়া থাকে। "এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের যিনি অধ্যক্ষ, তিনি পরম আকাশে বিরাজমান।" এই সকল মন্ত্রভাগও এই অর্থ প্রদর্শন করিতেছে। তাহাই যদি হইল, তবে ইহা স্থির যে, সেই সর্ব্বাধ্যক্ষ দ্যোতনাত্মা কেবল চৈতন্য স্বভাব পরমার্থত কোনপ্রকার ভোগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই এবং তাঁহা ছাড়া

অন্য কোন ভোক্তা চেতনান্তরও নাই, সুতরাং এই সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল ? এই প্রকার প্রশ্ন এবং ইহার উত্তর দুইটী অনুপপন্ন (অর্থাৎ এই সৃষ্টি পরমার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা যাহা মিথ্যা তাহার সৃষ্টি স্থিতি বা প্রলয়ও মিথ্যা ছাড় আর কি হইতে পারে, তাহাই যদি হইল, তবে সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধন পরমাত্মার বিকার হইবার সম্ভাবনা কোথায় ?) "এই সৃষ্টির তত্ত্ব পরমার্থরূপে কে বুঝে ? কেই বা এ জগতে এই সৃষ্টি বিষয়ে উপদেশ করিল ? এই জগত কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ? কেনই বা এই সৃষ্টি হইল।" এই সকল বেদমন্ত্রের দ্বারাও ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। ভগবান্‌ও দেখাইয়াছেন যে, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত, এই কারণেই জীবসকল মোহ প্রাপ্ত হয়॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১ ॥

অন্বয়। মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাব মজানন্তো মূঢ়া মাং মানুষীং তনুং আশ্রিতং অবজানন্তি॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ। প্রাণীসমূহের উপর সর্ব্বপ্রকারে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আমাকে পরম ভাব বোধে অসমর্থ অজ্ঞব্যক্তিগণ মনুষ্যমূর্ত্তিধারী সামান্য জীব বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ১১।

ভাষ্য। এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমপি সন্তং অবজানন্তি অবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্য সম্বন্ধিনীং তনুং দেহং আশ্রিতং মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তং ইত্যেতৎ। পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পং আকাশস্যাপি অন্তরতম মজানন্তো মম, ভূত মহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেনা-হতা বরাকা স্তে। ১১।

ভাষ্যানুবাদ। আমার স্বভাব নিত্যমুক্ত ও নিত্যবুদ্ধ এবং আমিই সকল জীবের আত্মা, তথাপি "মূঢ়গণ" অবিবেকী জন সমূহ আমাকে "অবজ্ঞা করিয়া থাকে" পরিভূত করিয়া থাকে। "মানুষী" মনুষ্য সম্বন্ধিনী তনুকে আশ্রয় করিলেও অর্থাৎ মনুষ্যদেহকে আশ্রয় করিয়া ব্যবহার করিলেও আমি প্রকৃত-পক্ষে "ভূতমহেশ্বর" জীবসমূহের পরমেশ্বর অর্থাৎ অন্তরাত্মা আমার পরম "ভাব"

পরমাত্মতত্ত্ব যাহা আকাশকল্প অথচ আকাশ হইতেও অন্তরতম তাহাকে না বুঝিয়া আমাকে মূঢ়গণ অবজ্ঞা করিয়া থাকে। আমার প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞাভাবনা করে বলিয়া তাহারা সংসারে অত্যন্ত অকিঞ্চন শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে। ১১।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২॥

অন্বয়। (যে মাং অবজানন্তি তে) রাক্ষসীং আসুরীং চ মোহিনীং প্রকৃতিং এব শ্রিতাঃ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ (চ) ভবন্তি। ১২।

মূলানুবাদ। (যাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে তাহারা) মোহকারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে, তাহাদের আশা নিষ্ফল হয়, তাহাদের কার্য্য সফল হয় না, তাহাদের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন হয় এবং তাহারা বিকৃতচিত্ত হইয়া থাকে। ১২।

ভাষ্য। কথং—মোঘাশা—বৃথা আশা আশিষো যেষাং তে মোঘাশাঃ। তথা মোঘকর্ম্মাণো যানিচ অগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়মানানি কর্ম্মাণি তানি চ তেষাং ভগবতঃ পরিভবাত্ স্বাত্মভূতস্য অবজ্ঞানান্মোঘান্যেব নিষ্ফলান্যেব কর্ম্মাণি ভবন্তি ইতি মোঘকর্ম্মাণঃ। তথা মোঘজ্ঞানা জ্ঞানমপিতেষাং নিষ্ফলমেবস্যাৎ। বিচেতসঃ বিগতবিবেকাশ্চ তে ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং রক্ষসামেব প্রকৃতিং স্বভাবং আসুরীং অসুরাণাঞ্চ প্রকৃতিং মোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং শ্রিতা আশ্রিতাশ্ছিন্ধি ভিন্ধি পিবখাদ পরস্বমপহর ইত্যেবং বদনশীলাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ। "অসূর্য্যানাম তে লোকাঃ" ইতিশ্রুতেঃ। ১২।

ভাষ্যানুবাদ। কেন (তাহারা এমন শোচনীয় দশাগ্রস্ত হয়)? "মোঘোশা" বৃথা হয় যাহাদের "আশা" অভিলাষ তাহাদিগকে মোঘাশ বলা যায় (ঐ সকল ব্যক্তির আশা বৃথা হয়) সেইরূপ তাহারা মোঘকর্ম্মা হইয়া থাকে, আমাকে অর্থাৎ তাহাদের পরমাত্মাকে অবজ্ঞা করে বলিয়া তাহাদের অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ নিষ্ফল হয় সুতরাং তাহারা মোঘকর্ম্মা হইয়া থাকে। সেই প্রকার তাহারা "মোঘ জ্ঞান" নিষ্ফল জ্ঞান হয়, তাহাদের জ্ঞানও নিষ্ফল হইয়া থাকে।

তাহারা বিচেতা হয়, তাহাদের সদসৎ বিবেক থাকে না, ইহাই অভিপ্রায়। আরও তাহারা "রাক্ষসী" রাক্ষসগণের "প্রকৃতি" স্বভাবকে প্রাপ্ত হয় এবং আসুরী অসুরগণের প্রকৃতিকেও প্রাপ্ত হয়। এই রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি "মোহনী" মোহকরী—অর্থাৎ ইহা দেহেতে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেয়, এই প্রকার স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা "ছিন্ন কর, ভিন্ন কর, পান কর, আস্বাদ কর, পরের ধন আহরণ কর, এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিয়া জগতে সকল প্রকার ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাই অর্থ। শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, তাহারা "জ্ঞানহীন লোক প্রাপ্ত হয়"। ১২।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩॥

অন্বয়। হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতা মহাত্মানঃ মাং ভূতাদিং অব্যয়ং জ্ঞাত্বা অনন্যমনসঃ (সন্তঃ) ভজন্তে। ১৩।

মূলানুবাদ। হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় মহাত্মাগণ আমাকে ভূতসমূহের আদি ও ব্যয়রহিত (অবিনাশী) জানিয়াও অনন্যচেতা হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ১৩।

ভাষ্য। যে পুনঃ শ্রদ্দধানা ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তা মহাত্মানস্ত্বক্ষুদ্রচিত্তা মামীশ্বরং পার্থ দৈবীং দেবানাং প্রকৃতিং শম-দম-দয়া-শ্রদ্ধাদি-লক্ষণাং আশ্রিতাঃ সন্তো ভজন্তি সেবন্তে অনন্যমনসঃ অনন্যচিত্তা জ্ঞাত্বা ভূতাদিং ভূতানাং বিয়দাদীনাং প্রাণিনাং চ আদিং কারণমব্যয়ম্। ১৩।

ভাষ্যানুবাদ। যাহারা কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং ভগবদ্ভক্তিরূপ যোগমার্গে প্রবৃত্ত—(সেই সকল) "মহাত্মা" অক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ "দৈবী" দেবতাগণের "প্রকৃতি" শম-দম-দয়া-শ্রদ্ধাদিলক্ষণ স্বভাবকে প্রাপ্ত (হইয়া এবং) "অনন্য-মনা" অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে (অর্থাৎ) ঈশ্বরকে "ভূতগণের" আকাশাদির ও প্রাণীগণের "আদি" কারণ ও অব্যয় জানিয়া "ভজনা" সেবা করিয়া থাকে। ১৩।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪॥

অন্বয়। মাং সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ যতন্তঃ দৃঢ়ব্রতা মাং নমস্যন্তশ্চ ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ উপাসতে। ১৪।

মূলানুবাদ। সর্ব্বদা ব্রহ্মস্বরূপ আমার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ও দৃঢ়ব্রত হইয়া (জ্ঞানলাভের জন্য) প্রযত্ন করিয়া থাকেন—ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাকে নমস্কার করিয়া থাকেন—এই ভাবেই নিত্যযুক্ত হইয়া সাধকগণ আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৪।

ভাষ্য। কথং—সততং সর্ব্বদা ভগবন্তঃ ব্রহ্মস্বরূপং মাং কীর্ত্তয়ন্তো যতন্তশ্চ ইন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াদিলক্ষণৈর্ধর্ম্মৈঃ প্রযতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়ং স্থিরমচাঞ্চল্যং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতা নমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশয়মাত্মানং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে। ১৪।

ভাষ্যানুবাদ। কি প্রকারে? (তাহারা উপাসনা করিয়া থাকেন তাহাই বলা হইতেছে) "সতত" সর্ব্বদা আমাকে (অর্থাৎ) ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্‌কে কীর্ত্তিত করিতে করিতে (এবং) যত্নপর হইয়া (অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, শম, দম, দয়া ও অহিংসাদিরূপ ধর্ম্মদ্বারা (চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার জন্য) প্রযত্নপরায়ণ হইয়া—(এবং) "দৃঢ়ব্রত" দৃঢ় স্থির অর্থাৎ চাঞ্চল্যরহিত ব্রতের অনুষ্ঠান যাহারা করে তাহাদিগকেই দৃঢ়ব্রত বলা যায়। এইরূপ দৃঢ়-ব্রত হইয়া ও সকলের হৃদয়স্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে (সর্ব্বদা) নমস্কার করিতে করিতে নিত্যযুক্ত (যোগী) গণ আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৪।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫॥

অন্বয়। অপিচ অন্যে জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাং উপাসতে (কেচন) এক-ত্বেন (কেচন) পৃথক্ত্বেন (কেচন) বহুধা বিশ্বতোমুখং (মাং উপাসতে ইতি শেষঃ)। ১৫।

মূলানুবাদ। জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া কোন কোন ব্যক্তি আমার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞান কাহারও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ক, কেহ বা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি নানা আকারে ভাবিয়া উপাসনা করেন, কেহ বা বহুভাবে অবস্থিত সর্ব্বব্যাপক ভাবিয়াও আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৫।

ভাষ্য। তে কেন প্রকারেণ উপাসতে ইত্যুচ্যতে—জ্ঞান যজ্ঞেন জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চাপ্যন্যে অন্যা মুপাসনাং পরিত্যজ্য উপাসতে। তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন একমেব পরংব্রহ্ম ইতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত উপাসতে। কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেন আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন সএব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাবস্থিত ইতি উপাসন্তে। কেচিদ্ বহুধা অবস্থিতঃ স এব ভগবান্ বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্ব্বতোমুখং বহুধা বহুপ্রকারেণ উপাসতে। ১৫।

ভাষ্যানুবাদ। তাঁহারা কোন্ কোন্ প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন? তাহাই বলা হইতেছে, "জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা" ভগবদ্বিষয় জ্ঞানই যজ্ঞ (বলিয়া উক্ত হইয়াছে) সেই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিয়া এবং অন্য প্রকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কোন কোন সাধকগণ আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞান (কি প্রকার হয়?) একত্ব প্রকারে অর্থাৎ একমাত্র পরব্রহ্মই সৎ এইরূপ পরমার্থ দৃষ্টি দ্বারাই তাহারা আমার পূজা করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। কোন কোন সাধক পৃথক্ভাবে (অর্থাৎ) আদিত্য বা চন্দ্রাদিভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন—একই সেই ভগবান্ বিষ্ণু আদিত্যাদি নানারূপে অবস্থিত আছেন—ইহাই ভাবিয়া তাহারা উপাসনা করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন সাধক ভাবিয়া থাকেন যে, সেই নানারূপ নানাপ্রকারে অবস্থিত হইলেও ভগবান্ বিষ্ণু "বিশ্বতোমুখ" সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ বিশ্বরূপ, অর্থাৎ সেই সর্ব্বতোমুখ বহুভাবে অবস্থিত ভগবান্‌কে বহুপ্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন। ১৫।

মান্দ্রাজনিবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

মান্দ্রাজনিবাসী স্বদেশী স্বধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুগণ,—

হিন্দুধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের জন্য আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিয়াছি, তাহা যে আপনারা আদরের সহিত অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। এই আনন্দ, আমার নিজের এবং সুদূর বিদেশে আমার প্রচার কার্য্যের ব্যক্তিগত প্রশংসার জন্য নহে। আমার আহ্লাদের কারণ এই ;—আপনারা যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে আনন্দিত, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, যদিও হতভাগ্য ভারতের মস্তকের উপর দিয়া কতবার বৈদেশিক আক্রমণের ঝঞ্ঝাবাত গিয়াছে, যদিও শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমাদের নিজেদের উপেক্ষায় এবং আমাদের বিজেতৃগণের অবজ্ঞায় প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মহিমা স্পষ্টই ম্লান হইয়াছে, যদিও শত শত শতাব্দীব্যাপী বন্যায় হিন্দুধর্ম্মরূপ সৌধের অনেকগুলি মহিমাময় অবলম্বনস্তম্ভ, অনেক সুন্দর সুন্দর খিলান ও অনেক অপূর্ব্ব পার্শ্বপ্রস্তর ভাসিয়া গিয়াছে, তথাপি উহার ভিত্তি অটলভাবে এবং উহার সন্ধিপ্রস্তর অটুটভাবে বিরাজমান ; যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর হিন্দুজাতির ঈশ্বরভক্তি ও সর্ব্বভূতহিতৈষণারূপ অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত, তাহা পূর্ব্ববৎ অটুট ও অবিচলিত ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহার অতি অনুপযুক্ত দাস আমি, ভারতে ও সমগ্র জগতে তাঁহার যে উপদেশ প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি, তোমরা তাহা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছ ; তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তাঁহাতে এবং তাঁহার উপদেশে সেই মহতী আধ্যাত্মিক বন্যার প্রথম অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়াছ, যাহা নিশ্চিত অনতিদীর্ঘকালে ভারতে দুর্দ্দমনীয় বেগে উপস্থিত হইবে, অনন্ত শক্তিস্রোতে যাহা কিছু দুর্ব্বল ও দোষযুক্ত, সব ভাসাইয়া দিবে আর হিন্দুজাতির শত শত শতাব্দী ধরিয়া নীরব সহিষ্ণুতার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে অতীত হইতেও উজ্জ্বলতর গৌরবমুকুটে ভূষিত করিয়া তাহাদের বিধিপ্রাপ্য সত্ব স্বরূপ, উচ্চপদবীতে উন্নীত করিবে এবং সমগ্র মানব জাতির সম্বন্ধে উহার যে কার্য্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিকপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবজাতির বিকাশ, তাহাও সম্পাদন করিবে।

দাক্ষিণাত্যবাসী তোমাদের নিকট আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ বিশেষ ঋণী, কারণ,

ভারতে আজ যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশেরই মূল দাক্ষিণাত্য। শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকারগণ, যুগপ্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ, যথা, শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, (১) ইহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছিলেন। মহাত্মা শঙ্কর, জগতের প্রত্যেক অদ্বৈতবাদীই যাঁহার নিকট অমোচ্য ঋণজালে আবদ্ধ; মহাত্মা রামানুজ, যাঁহার স্বর্গীয় স্পর্শ, পদদলিত পরিয়াগণকেও আলওয়ারে (২) পরিণত করিয়াছিল; মহাত্মা মধ্ব, সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্য্যাবর্ত্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্ত্তিগণও যাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্য ইহাঁদের সকলেরই জন্মস্থান। বর্ত্তমানকালেও বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ মন্দিরসমূহে দাক্ষিণাত্যবাসীরই প্রাধান্য, তোমাদের ত্যাগই হিমালয়ের সুদূরবর্ত্তী চূড়াস্থিত পবিত্র দেবালয়সমূহকে শাসন করিতেছে। অতএব মহাপুরুষগণের পূতশোণিতে পূরিতধমনী, তথাবিধ আচার্য্যগণের আশীর্ব্বাদে ধন্যজীবন, তোমরা যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সর্ব্ব প্রথম বুঝিবে ও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

দাক্ষিণাত্যই চিরদিন বেদবিদ্যার ভাণ্ডার, সুতরাং তোমরা বুঝিবে যে, অজ্ঞ হিন্দুধর্ম্ম-আক্রমণকারী সমালোচকগণের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদসত্ত্বেও এখনও শ্রুতিই (৩) হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ।

জাতিবিদ্যাবিৎ বা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের (৪) যতই মূল্য হউক, 'অগ্নিমীলে', 'ইষেত্বোর্জ্জেত্বা', 'শন্নো-

(১) রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও বেদান্তদর্শনের উপর ঐ মতসঙ্গত ব্যাখ্যাযুক্ত শ্রীভাষ্যের রচয়িতা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে চিৎ (জীব) অচিৎ (জড়) ও তাহাদের অন্তর্যামী ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব আছে। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

(২) দাক্ষিণাত্যের চণ্ডালতুল্য অস্পৃশ্য নীচ জাতিবিশেষকে পরিয়া বলে। আলওয়ার শব্দের অর্থ ভক্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্তগণকে আলওয়ার বলে।

(৩) বেদ।

(৪) চতুর্ব্বেদের প্রত্যেকটীতে তিনটী করিয়া অংশ আছে। (১) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের উদ্দেশ্যে স্তোত্রাত্মক মন্ত্রসমূহের নাম সংহিতা। (২) এই সকল মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনাত্মক বেদভাগের নাম ব্রাহ্মণ। (৩) অরণ্যে ঋষিগণদ্বারা আলোচিত তত্ত্বসমূহের নাম আরণ্যক। উপনিষদ্‌সমূহ এই আরণ্যকের অন্তর্গত।

দেবীরভীষ্টয়ে', (১) প্রভৃতি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বেদীযুক্ত বিভিন্ন যজ্ঞে নানাবিধ আহুতি দ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহ যতই বাঞ্ছনীয় হউক, সমুদয়ই ভোগৈকফল; আর কেহই কথন এগুলি মোক্ষজনক বলিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং, আধ্যাত্মিকতা ও মোক্ষমার্গের উপদেশক জ্ঞানকাণ্ড, যাহা আরণ্যক বা শ্রুতিশির বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ভারতে চিরকাল শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছে ও চিরকাল করিবে।

সনাতন ধর্ম্মের নানামতমতান্তররূপ গোলকধাঁধায় দিগ্‌ভ্রান্ত,—একমাত্র যে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন উপযোগিতা তৎপ্রচারিত অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মের অবিকল প্রতিবিম্বস্বরূপ—পূর্ব্বভ্রান্তসংস্কারবশবর্ত্তী হইয়া তদ্ধর্ম্মমর্ম্ম-বোধে অক্ষম, জড়বাদসর্ব্বস্ব জাতির নিকট ঋণসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ডাবলম্বনে অন্ধকারে অন্বেষণপরায়ণ, আধুনিক হিন্দুযুবক বৃথাই তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং হয় ঐ চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়েন অথবা স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় পশুজীবনযাপনে অসমর্থ হইয়া প্রাচ্যগন্ধি বিবিধ পাশ্চাত্য জড়বাদের নির্য্যাস অসাবধানে পান করেন এবং শ্রুতির এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেন;—

পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। (২)

তাঁহারই কেবল বাঁচিয়া যান, যাঁহাদের আত্মা সদ্‌গুরুর জীবনপ্রদ স্পর্শ-বলে জাগ্রত হয়।

ভগবান ভাষ্যকার (৩) ঠিকই বলিয়াছেন,

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ (৪)

পরমাণু, দ্ব্যণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তপ্রস্থ বৈশেষিক-

(১) এই তিনটী যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদের প্রথম শ্লোকের অংশস্বরূপ।

(২) কঠোপনিষদ্। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের-ন্যায় মূঢ়েরা নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

(৩) শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

(৪) বিবেকচূড়ামণি, ৩। এই তিনটী অতি দুর্লভ, দেবানুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে,—মনুষ্যজন্মলাভ, মোক্ষের প্রবল ইচ্ছা ও মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ।

দের (১) সূক্ষ্ম বিচারসমূহই হউক, অথবা নৈয়ায়িকদের জাতিদ্রব্যগুণ-সমবায় (২) প্রভৃতি বস্তুসম্বন্ধীয় অপূর্ব্বতর বিচারাবলিই হউক, অথবা পরিণামবাদের জনকস্বরূপ সাংখ্যদিগের তদপেক্ষা গভীরতর চিন্তাগতিই হউক অথবা এই বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণাবলির সুপক্ক ফলস্বরূপ ব্যাসসূত্রই হউক, মনুষ্যমনের এই সকল বিবিধ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের একমাত্র ভিত্তি শ্রুতি। এমন কি, বৌদ্ধ বা জৈনদিগের দার্শনিক গ্রন্থাবলিতেও শ্রুতির সহায়তা পরিত্যক্ত হয় নাই, আর অন্ততঃ কতকগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়ে এবং জৈনদের অধিকাংশ গ্রন্থে শ্রুতির প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা শ্রুতির কোন কোন অংশকে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 'হিংসক' শ্রুতি আখ্যা দেন—এবং সে গুলির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান কালেও স্বর্গীয় মহাত্মা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও (৩) এইরূপ মত পোষণ করিতেন।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমুদয় ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্র কোথায়, যদি কেহ নানাবিধ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মেরুদণ্ড কি, জানিতে চান, তবে অবশ্যই ব্যাসসূত্রই এই কেন্দ্র, এই মেরুদণ্ড বলিয়া প্রদর্শিত হইবে।

---

(১) দ্ব্যণুক—দুইটী অণুর সম্মিলিত অবস্থা। ত্রসরেণু তিনটী অণুর সম্মিলিত অবস্থা। বৈশেষিক—হিন্দুদর্শন প্রধানতঃ ছয়টী। ১। বৈশেষিক—কণাদপ্রণীত, ২। ন্যায়—গোতমপ্রণীত; ৩। সাংখ্য—কপিল প্রণীত; ৪। যোগ—পতঞ্জলিপ্রণীত, ৫। পূর্ব্বমীমাংসা (ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মীমাংসা আছে)—জৈমিনিপ্রণীত, ৬। বেদান্ত বা ব্যাসসূত্র—ব্যাসপ্রণীত।

(২) দ্রব্য—ন্যায়মতে দ্রব্য নয়টী, যথা,—পৃথিবী, জল তেজ, বায়ু, আকাশ, দেশ, কাল, আত্মা ও মন। জাতি কতকগুলি বস্তুর সাধারণ ধর্ম্ম, যাহা দ্বারা শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে, যেমন পশুত্ব, মনুষ্যত্ব। গুণ - ন্যায মতে গুণ বলিতে - রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ, এই কয়েকটীকে বুঝায়। সমবায়—যেমন ঘটে ও যে মৃত্তিকায় উহা নির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ।

(৩) আর্য্যসমাজের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। ইহার মত পঞ্জাবে খুব প্রচলিত। এখানকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে ইহার অনেক বিষয়ে একমত।

হিমাচলস্থিত অরণ্যানীর হৃদয়স্তম্ভকারী গাম্ভীর্য্যের মধ্যে স্বর্ণদীর গভীর ধ্বনিমিশ্রিত অদ্বৈতকেশরীর অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ (১) বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করুন, অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জসমূহে 'পিয়া পীতম্' (২) কূজিতই শ্রবণ করুন, বারাণসীধামের মঠসমূহে সাধুদিগের গভীর ধ্যানেই যোগদান করুন, অথবা নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের উন্মাদনৃত্যে যোগদানই করুন; বাদকালী, তেনকালী (৩) প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদমতাবলম্বী আচার্য্যগণের পাদমূলেই উপবেশন করুন, অথবা মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের বাক্যই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন, গৃহী শিখদিগের 'ওয়া গুরু কি ফতে' (৪) রূপ সমরবাণীই শ্রবণ করুন, অথবা উদাসী ও নির্ম্মলাদিগের গ্রন্থসাহেবের (৫) উপদেশই শ্রবণ করুন; কবীরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে সৎসাহেব (৬) বলিয়া অভিবাদনই করুন, অথবা সখীসম্প্রদায়ের ভজনই শ্রবণ করুন; রাজপুতানার সংস্কারক দাদুর অদ্ভুত গ্রন্থাবলি বা তাঁহার শিষ্য রাজা সুন্দরদাস ও তাহা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া বিচারসাগরের বিখ্যাত রচয়িতা নিশ্চলদাসের গ্রন্থই (ভারতে গত

(১) অদ্বৈতকেশরী—অদ্বৈতবাদরূপ সিংহ অর্থাৎ সর্ব্বমতশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত-বাদ। অস্তি, ভাতি ও প্রিয়=সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই তিনটী শব্দ পঞ্চদশীতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) ভাবুক বৈষ্ণবেরা, বৃন্দাবনের কুঞ্জমধ্যে বিহঙ্গগণের গীতিমধ্যে এই ধ্বনি শুনিতে পান—অর্থ রাধাকৃষ্ণ।

(৩) প্রথমোক্তটী সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাচীন বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ও আধুনিক শ্রীভাষ্য প্রভৃতিকে অধিক প্রামাণ্য জ্ঞান করেন। দ্বিতীয়োক্তেরা দিব্যপ্রবন্ধ নামক তামিলভাষায় রচিত গ্রন্থের বিশেষ পক্ষপাতী। আরো অনেক অনেক বিষয়ে উভয়ের মতভেদ আছে।

(৪) গুরুর জয় হউক।

(৫) উদাসী ও নির্ম্মলা দুইটী নানকপন্থী সম্প্রদায়। প্রথমটি নানকের পুত্র শ্রীচাঁদকর্ত্তৃক স্থাপিত; দ্বিতীয়টী গুরুগোবিন্দ স্থাপিত। গ্রন্থ সাহেব—নানকপন্থীদের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে নানক হইতে গুরুগোবিন্দ পর্য্যন্ত দশগুরুর উপদেশ লিখিত আছে। শিখেরা এই গ্রন্থকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। সাহেব শব্দের অর্থ মাননীয়।

(৬) পূজনীয় সাধু।

তিন শতাব্দী ধরিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সকলের অপেক্ষা এই বিচারসাগরগ্রন্থের ভারতীয় জনসমাজে প্রভাব অধিক) পাঠ করুন, এমন কি, আর্য্যাবর্ত্তের ভাঙ্গীমেথরগণকে তাঁহাদের লালগুরুর উপদেশ বিবৃত করিতেই বলুন, তিনি দেখিবেন, এই আচার্য্যগণ ও সম্প্রদায়সমূহ, সকলেই সেই ধর্ম্মপ্রণালীর অনুবর্ত্তী, শ্রুতি যাহার প্রামাণ্যগ্রন্থ, গীতা যাহার ভগবদ্বক্তবিনিঃসৃত টীকা, শারীরক ভাষ্য (১) যাহার সুপ্রণালীবদ্ধ বিবৃতি আর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যগণ হইতে লালগুরুর ঘৃণিত মেথর শিষ্যগণ পর্য্যন্ত ভারতের সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায়, যাহার বিভিন্ন বিকাশ।

অতএব দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, এবং আরো কতকগুলি অনতিপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাযুক্ত এই প্রস্থানত্রয় (২) হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থস্বরূপ, প্রাচীন নারশংসীর (৩) প্রতিনিধিস্বরূপ পুরাণ উহার উপাখ্যানভাগ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণভাগের প্রতিনিধিস্বরূপ তন্ত্র উহার কর্ম্মকাণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্থানত্রয় সকল সম্প্রদায়েরই প্রামাণ্যগ্রন্থ, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ই পৃথক্ পৃথক্ পুরাণ ও তন্ত্রকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্ত্রগুলি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরই একটু পরিবর্ত্তিত আকারমাত্র, আর কেহ উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অসম্বদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ ভাগ, বিশেষতঃ, অধ্বর্য্যুব্রাহ্মণ ভাগের সহিত মিলাইয়া তন্ত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিই, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, তন্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ মন্ত্রই অবিকল ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষে তন্ত্রের প্রভাব কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে যে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মব্যতীত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রচলিত ধর্ম্মই তন্ত্র হইতে গৃহীত আর উহা শাক্ত,শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসনাপ্রণালীকে নিয়মিত করিয়া থাকে।

অবশ্য, আমি এ কথা বলি না যে, সকল হিন্দুই সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের স্বধর্ম্মের এই সকল মূল সম্বন্ধে অবগত আছেন। অনেকে, বিশেষতঃ, নিম্নবঙ্গে, এই সম্প্রদায় ও প্রণালীসমূহের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, কিন্তু জ্ঞাতসারেই

(১) শ্রীশঙ্করপ্রণীত বেদান্তভাষ্য।

(২) উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত। সন্ন্যাসিগণ এই প্রস্থানত্রয় শিক্ষা করিতে বাধ্য।

(৩) সংহিতা।

হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রস্থানের উপদেশানুসারে সকল হিন্দুই চলিয়াছেন।

অপর দিকে, যেখানেই হিন্দী ভাষা কথিত হয়, তথাকার অতি নীচজাতি পর্য্যন্ত নিম্নবঙ্গের অনেক উচ্চতম জাতি হইতে বৈদান্তিক ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ।

ইহার কারণ কি ?

মিথিলাভূমি হইতে নবদ্বীপে আনীত, শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি মনীষিগণের প্রতিভায় সযত্নে লালিত ও পরিপুষ্ট, কোন কোন বিষয়ে সমগ্রজগতের অন্যান্য সমুদয় প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ, অপূর্ব্ব সুনিবদ্ধ বাক্‌শিল্পে রচিত, তর্কপ্রণালীর বিশ্লেষণস্বরূপ বঙ্গদেশীয় ন্যায় শাস্ত্র হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদের চর্চ্চায় বঙ্গবাসীর যত্ন ছিল না, এমন কি, কয়েক বর্ষ মাত্র পূর্ব্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্য(১) পড়াইতে পারেন, এমন কেহ বঙ্গদেশে ছিলেন না বলিলেই হয়। একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' (২) জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবারমাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, কিছু দিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।

একটু বিস্ময়ের বিষয় এই, শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সুতরাং ভারতী (৩) ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাঁহার ধর্ম্মপ্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন।

বোধ হয় যেন পুরীসম্প্রদায় বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য ব্যাসসূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা হয় নষ্ট হইয়াছে,

---

(১) পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্য। বেদশিক্ষা করিতে হইলে পাণিনির বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

(২) ন্যায়ে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়- অবচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ বিশিষ্ট, যাহা দ্বারা সীমাবদ্ধ করে, অবচ্ছেদকের অর্থ যে বিশিষ্ট করে।

(৩) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ দশটী সন্ন্যাসিসম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইঁহাদিগকে দশনামী বলে। যথা,—গিরি, পুরী ভারতী, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর, তীর্থ, সরস্বতী, পদ্ম।

না হয়, এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার শিষ্যেরা দাক্ষিণাত্যের মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলেন। ক্রমশঃ রূপসনাতন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীগণ অধিকার করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের মহান্ সম্প্রদায় ক্রমশঃ ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু আজকাল উহার পুনরভ্যুত্থানের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আশা করি, উহা শীঘ্রই আপন লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।

সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের শক্তি লক্ষিত হয়। যেখানেই লোকে ভক্তিমার্গ জানে, সেখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্ব্বক চর্চ্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য্যসম্প্রদায় (১) শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য্য করিতেছে। কিরূপেই বা জানিবেন? শিষ্যগণ গদিয়ান হইয়াছেন কিন্তু তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।

যে অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা, বঙ্গদেশ এবং অধিক পরিমাণে বঙ্গদেশেই প্রচলিত, তাহাও উহার, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ধর্ম্মজীবন হইতে পৃথক্ থাকিবার আর একটী কারণ।

সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, বঙ্গদেশ, এখন পর্য্যন্ত যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনের প্রতিনিধি ও ভাণ্ডারস্বরূপ, সেই মহান্ সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের জীবন হইতে কখন শক্তিপ্রাপ্ত হয় নাই।

বঙ্গের উচ্চবর্ণেরা ত্যাগ ভাল বাসেন না, তাঁহাদের ঝোঁক ভোগের দিকে। তাঁহারা কিরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবেন? ত্যাগে-নৈকেনামৃতত্বমানশুঃ, (২) অন্যপ্রকার কিরূপে সম্ভব হইবে?

অপর দিকে, সমুদয় হিন্দীভাষী ভারতের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অনেক সুদূর-ব্যাপিপ্রভাবসম্পন্ন মহামহা ত্যাগী আচার্য্যগণ বেদান্তের মত প্রতি গৃহে গৃহে

---

(১) বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। বল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য। এই সম্প্রদায় বোম্বাই অঞ্চলে খুব প্রবল।

(২) একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। একটী বৈদিক শ্লোকের অংশবিশেষ।

মান্দ্রাজনিবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

মান্দ্রাজনিবাসী স্বদেশী স্বধর্ম্মাবলম্বী বন্ধুগণ,--

হিন্দুধর্ম্মপ্রচার কার্যের জন্য আমি যৎকিঞ্চিৎ যাহা করিয়াছি, তাহা যে আপনারা আদরের সহিত অনুমোদন করিয়াছেন, তাহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। এই আনন্দ, আমার নিজের এবং সুদূর বিদেশে আমার প্রচার কার্য্যের ব্যক্তিগত প্রশংসার জন্য নহে। আমার আহ্লাদের কারণ এই,—আপনারা যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে আনন্দিত, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট দেখাইতেছে যে, যদিও হতভাগ্য ভারতের মস্তকের উপর দিয়া কতবার বৈদেশিক আক্রমণের ঝঞ্ঝাবাত গিয়াছে, যদিও শত শত শতাব্দী ধরিয়া আমাদের নিজেদের উপেক্ষায় এবং আমাদের বিজেতৃগণের অবজ্ঞায় প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মহিমা স্পষ্টই ম্লান হইয়াছে, যদিও শত শত শতাব্দব্যাপী বন্যার হিন্দুধর্ম্মরূপ সৌধের অনেকগুলি মহিমাময় অবলম্বনস্তম্ভ, অনেক সুন্দর সুন্দর খিলান ও অনেক অপূর্ব্ব পার্শ্বপ্রস্তর ভাসিয়া গিয়াছে, তথাপি উহার ভিত্তি অটলভাবে এবং উহার সন্ধিপ্রস্তর অটুটভাবে বিরাজমান, যে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর হিন্দুজাতির ঈশ্বরভক্তি ও সর্ব্বভূতহিতৈষণারূপ অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত, তাহা পূর্ব্ববৎ অটুট ও অবিচলিত ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহার অতি অনুপযুক্ত দাস আমি, ভারতে ও সমগ্র জগতে তাঁহার যে উপদেশ প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি, তোমরা তাহা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছ; তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তাঁহাতে এবং তাঁহার উপদেশে সেই মহতী আধ্যাত্মিক বন্যার প্রথম অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়াছ, যাহা নিশ্চিত অনতিদীর্ঘকালে ভারতে দুর্দ্দমনীয় বেগে উপস্থিত হইবে, অনন্ত শক্তিস্রোতে যাহা কিছু দুর্ব্বল ও দোষযুক্ত, সব ভাসাইয়া দিবে আর হিন্দুজাতির শত শত শতাব্দী ধরিয়া নীরব সহিষ্ণুতার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদিগকে অতীত হইতেও উজ্জ্বলতর গৌরবমুকুটে ভূষিত করিয়া তাহাদের বিধিপ্রাপ্য সত্ব স্বরূপ, উচ্চপদবীতে উন্নীত করিবে এবং সমগ্র মানব জাতির সম্বন্ধে উহার যে কার্য্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিকপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবজাতির বিকাশ, তাহাও সম্পাদন করিবে।

দাক্ষিণাত্যবাসী তোমাদের নিকট আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ বিশেষ ঋণী, কারণ,

ভারতে আজ যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশেরই মূল দাক্ষিণাত্য। শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকারগণ, যুগপ্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ, যথা, শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, (১) ইঁহারা সকলেই দাক্ষিণাত্যে জন্মিয়াছিলেন। মহাত্মা শঙ্কর, জগতের প্রত্যেক অদ্বৈতবাদীই যাঁহার নিকট অমোচ্য ঋণজালে আবদ্ধ; মহাত্মা রামানুজ, যাঁহার স্বর্গীয় স্পর্শ, পদদলিত পারিয়াগণকেও আলওয়ারে (২) পরিণত করিয়াছিল; মহাত্মা মধ্ব, সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্য্যাবর্ত্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্ত্তিগণও যাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্য ইঁহাদের সকলেরই জন্মস্থান। বর্ত্তমানকালেও বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ গৌরবস্বরূপ মন্দিরসমূহে দাক্ষিণাত্যবাসীরই প্রাধান্য, তোমাদের ত্যাগই হিমালয়ের সুদূরবর্ত্তী চূড়াস্থিত পবিত্র দেবালয়সমূহকে শাসন করিতেছে। অতএব মহাপুরুষগণের পূতশোণিতে পূরিতধমনী, তথাবিধ আচার্য্যগণের আশীর্ব্বাদে ধন্যজীবন, তোমরা যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সর্ব্ব প্রথম বুঝিবে ও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

দাক্ষিণাত্যই চিরদিন বেদবিদ্যার ভাণ্ডার, সুতরাং তোমরা বুঝিবে যে, অজ্ঞ হিন্দুধর্ম্ম-আক্রমণকারী সমালোচকগণের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদসত্ত্বেও এখনও শ্রুতিই (৩) হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ।

জাতিবিদ্যাবিৎ বা ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগের (৪) যতই মূল্য হউক, 'অগ্নিমীলে', 'ইষেত্বোর্জ্জেত্বা', 'শন্নো-

(১) রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও বেদান্তদর্শনের উপর ঐ মতসঙ্গত ব্যাখ্যাযুক্ত শ্রীভাষ্যের রচয়িতা। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে চিৎ (জীব) অচিৎ (জড়) ও তাহাদের অন্তর্যামী ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব আছে। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

(২) দাক্ষিণাত্যের চণ্ডালতুল্য অস্পৃশ্য নীচ জাতিবিশেষকে পরিয়া বলে। আলওয়ার শব্দের অর্থ ভক্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভক্তগণকে আলওয়ার বলে।

(৩) বেদ।

(৪) চতুর্ব্বেদের প্রত্যেকটীতে তিনটী করিয়া অংশ আছে। (১) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের উদ্দেশ্যে স্তোত্রাত্মক মন্ত্রসমূহের নাম সংহিতা। (২) এই সকল মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনাত্মক বেদভাগের নাম ব্রাহ্মণ। (৩) অরণ্যে ঋষিগণদ্বারা আলোচিত তত্ত্বসমূহের নাম আরণ্যক। উপনিষদ্‌সমূহ এই আরণ্যকের অন্তর্গত।

দেবীরভীষ্টয়ে', (১) প্রভৃতি বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ সহকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-বেদীযুক্ত বিভিন্ন যজ্ঞে নানাবিধ আহুতি দ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহ যতই বাঞ্ছনীয় হউক, সমুদয়ই ভোগৈকফল, আর কেহই কথন এগুলি মোক্ষজনক বলিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হয় নাই। সুতরাং, আধ্যাত্মিকতা ও মোক্ষমার্গের উপদেশক জ্ঞানকাণ্ড, যাহা আরণ্যক বা শ্রুতিশিব বলিয়া কথিত হয়, তাহাই ভারতে চিবকাল শ্রেষ্ঠ আসন অধিকাব করিয়াছে ও চিরকাল কবিবে।

সনাতন ধর্ম্মের নানামতমতান্তবরূপ গোলকধাঁধায় দিগ্‌ভ্রান্ত,—একমাত্র যে ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন উপযোগিতা তৎপ্রচারিত অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান ব্রহ্মের অবিকল প্রতিবিম্বস্বরূপ—পূর্ব্বভ্রান্তসংস্কারবশবর্ত্তী হইয়া তদ্ধর্ম্মমর্ম্ম-বোধে অক্ষম, জড়বাদসর্ব্বস্ব জাতির নিকট ঋণসূত্রে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ডাবলম্বনে অন্ধকারে অন্বেষণপরায়ণ, আধুনিক হিন্দুযুবক বৃথাই তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং হয় ঐ চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়েন অথবা স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় পশুজীবনযাপনে অসমর্থ হইয়া প্রাচ্যগন্ধি বিবিধ পাশ্চাত্য জড়বাদের নির্য্যাস অসাবধানে পান করেন এবং শ্রুতির এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেন ;—

পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। (২)

তাঁহারাই কেবল বাঁচিয়া যান, যাঁহাদের আত্মা সদ্‌গুরুর জীবনপ্রদ স্পর্শ-বলে জাগ্রত হয়।

ভগবান ভাষ্যকার (৩) ঠিকই বলিয়াছেন,

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ (৪)

পরমাণু, দ্ব্যণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তপ্রসূ বৈশেষিক-

---

(১) এই তিনটী যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদের প্রথম শ্লোকের অংশস্বরূপ।

(২) কঠোপনিষদ্। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় মূঢ়েরা নানা দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

(৩) শ্রীশঙ্করাচার্য্য।

(৪) বিবেকচূড়ামণি, ৩। এই তিনটী অতি দুর্লভ, দেবানুগ্রহেই লাভ হইয়া থাকে,—মনুষ্যজন্মলাভ, মোক্ষের প্রবল ইচ্ছা ও মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ।

দের (১) সূক্ষ্ম বিচারসমূহই হউক অথবা নৈয়ায়িকদের জাতিদ্রব্যগুণ-সমবায় (২) প্রভৃতি বস্তুসম্বন্ধীয় অপূর্ব্বতর বিচারাবলিই হউক, অথবা পরিণামবাদের জনকস্বরূপ সাংখ্যদিগের তদপেক্ষা গভীরতর চিন্তাগতিই হউক, অথবা এই বিভিন্নরূপ বিশ্লেষণাবলির সুপক্ব ফলস্বরূপ ব্যাসসূত্রই হউক, মনুষ্যমনের এই সকল বিবিধ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের একমাত্র ভিত্তি শ্রুতি। এমন কি, বৌদ্ধ বা জৈনদিগের দার্শনিক গ্রন্থাবলিতেও শ্রুতির সহায়তা পরিত্যক্ত হয় নাই, আর অন্ততঃ কতকগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়ে এবং জৈনদের অধিকাংশ গ্রন্থে শ্রুতির প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা শ্রুতির কোন কোন অংশকে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 'হিংসক' শ্রুতি আখ্যা দেন—এবং সে গুলির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান কালেও স্বর্গীয় মহাত্মা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীও (৩) এতদ্বিধ মত পোষণ করিতেন।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমুদয় ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্র কোথায়, যদি কেহ নানাবিধ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মেরুদণ্ড কি, জানিতে চান, তবে অবশ্যই ব্যাসসূত্রই এই কেন্দ্র, এই মেরুদণ্ড বলিয়া প্রদর্শিত হইবে।

---

(১) দ্ব্যণু=দুইটী অণুর সম্মিলিত অবস্থা। ত্রসরেণু=তিনটী অণুর সম্মিলিত অবস্থা। বৈশেষিক—হিন্দুদর্শন প্রধানতঃ ছয়টী। ১। বৈশেষিক—কণাদপ্রণীত, ২। ন্যায়—গৌতমপ্রণীত, ৩। সাংখ্য—কপিল প্রণীত, ৪। যোগ—পতঞ্জলিপ্রণীত, ৫। পূর্ব্বমীমাংসা (ইহাতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মীমাংসা আছে)—জৈমিনিপ্রণীত, ৬। বেদান্ত বা ব্যাসসূত্র—ব্যাসপ্রণীত।

(২) দ্রব্য—ন্যায়মতে দ্রব্য নয়টী, যথা,—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দেশ, কাল, আত্মা ও মন। জাতি—কতকগুলি বস্তুর সাধারণ ধর্ম্ম, যাহা দ্বারা শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে, যেমন পশুত্ব, মনুষ্যত্ব। গুণ—ন্যায় মতে গুণ বলিতে—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ, এই কয়েকটীকে বুঝায়। সমবায়—যেমন ঘটে ও যে মৃত্তিকায় উহা নির্ম্মিত, তাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ।

(৩) আর্য্যসমাজের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা। ইহার মত পঞ্জাবে খুব প্রচলিত। এখানকার ব্রাহ্মদের সঙ্গে ইহারা অনেক বিষয়ে একমত।

হিমাচলস্থিত অরণ্যানীর হৃদয়স্তব্ধকারী গাম্ভীর্য্যের মধ্যে স্বর্ণদীর গভীর ধ্বনিমিশ্রিত অদ্বৈতকেশরীর অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ (১) বজ্রগম্ভীর রবই কেহ শ্রবণ করুন, অথবা বৃন্দাবনের মনোহর কুঞ্জসমূহে 'পিয়া পীতম্' (২) কূজিতই শ্রবণ করুন, বারাণসীধামের মঠসমূহে সাধুদিগের গভীর ধ্যানেই যোগদান করুন, অথবা নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের উন্মাদনৃত্যে যোগদানই করুন, বাদকালী, তিনকালী (৩) প্রভৃতি শাখাযুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতাবলম্বী আচার্য্যগণের পাদমূলেই উপবেশন করুন, অথবা মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের বাক্যই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন, গৃহী শিখদিগের 'ওয়া গুরু কি ফতে' (৪) রূপ সমরবাণীই শ্রবণ করুন, অথবা উদাসী ও নির্ম্মলাদিগের গ্রন্থসাহেবের (৫) উপদেশই শ্রবণ করুন; কবীরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে সৎসাহেব (৬) বলিয়া অভিবাদনই করুন, অথবা সখীসম্প্রদায়ের ভজনই শ্রবণ করুন, রাজপুতানার সংস্কারক দাদুর অদ্ভুত গ্রন্থাবলি বা তাঁহার শিষ্য রাজা সুন্দরদাস ও তাঁহা হইতে ক্রমশঃ নামিয়া বিচারসাগরের বিখ্যাত রচয়িতা নিশ্চলদাসের গ্রন্থই (ভারতে গত

(১) অদ্বৈতকেশরী—অদ্বৈতবাদরূপ সিংহ অর্থাৎ সর্ব্বমতশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদ। অস্তি, ভাতি ও প্রিয়=সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই তিনটী শব্দ পঞ্চদশীতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) ভাবুক বৈষ্ণবেরা, বৃন্দাবনের কুঞ্জমধ্যে বিহঙ্গগণের গীতিমধ্যে এই ধ্বনি শুনিতে পান—অর্থ রাধাকৃষ্ণ।

(৩) প্রথমোক্তরা সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাচীন বেদ বেদান্ত প্রভৃতি ও আধুনিক শ্রীভাষ্য প্রভৃতিকে অধিক প্রামাণ্য জ্ঞান করেন। দ্বিতীয়োক্তেরা দিব্যপ্রবন্ধ নামক তামিলভাষায় রচিত গ্রন্থের বিশেষ পক্ষপাতী। আরো অনেক অনেক বিষয়ে উভয়ের মতভেদ আছে।

(৪) গুরুর জয় হউক।

(৫) উদাসী ও নির্ম্মলা দুইটী নানকপন্থী সম্প্রদায়। প্রথমটি নানকের পুত্র শ্রীচাঁদকর্তৃক স্থাপিত, দ্বিতীয়টী গুরুগোবিন্দ স্থাপিত। গ্রন্থসাহেব—নানকপন্থীদের ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে নানক হইতে গুরুগোবিন্দ পর্য্যন্ত দশগুরুর উপদেশ লিখিত আছে। শিখেরা এই গ্রন্থকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। সাহেব শব্দের অর্থ মাননীয়।

(৬) পূজনীয় সাধু।

তিন শতাব্দী ধরিয়া যত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সকলের অপেক্ষা এই বিচারসাগরগ্রন্থের ভারতীয় জনসমাজে প্রভাব অধিক) পাঠ করুন, এমন কি, আর্য্যাবর্ত্তের ভাঙ্গীমেথরগণকে তাঁহাদের লালগুরুর উপদেশ বিবৃত করিতেই বলুন, তিনি দেখিবেন, এই আচার্য্যগণ ও সম্প্রদায়সমূহ, সকলেই সেই ধর্ম্মপ্রণালীর অনুবর্ত্তী, শ্রুতি যাহার প্রামাণ্যগ্রন্থ, গীতা যাহার ভগবদ্বক্ত্রবিনিঃসৃত টীকা, শারীরক ভাষ্য (১) যাহার সুপ্রণালীবদ্ধ বিবৃতি আর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যগণ হইতে লালগুরুর ঘৃণিত মেথর শিষ্যগণ পর্য্যন্ত ভারতের সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায়, যাহার বিভিন্ন বিকাশ।

অতএব দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, এবং আরো কতকগুলি অনতিপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাযুক্ত এই প্রস্থানত্রয় (২) হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থস্বরূপ, প্রাচীন নারশংসীব (৩) প্রতিনিধিস্বরূপ পুরাণ উহার উপাখ্যানভাগ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণভাগের প্রতিনিধিস্বরূপ তন্ত্র উহার কর্ম্মকাণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্থানত্রয় সকল সম্প্রদায়েরই প্রামাণ্যগ্রন্থ, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ই পৃথক্ পৃথক্ পুরাণ ও তন্ত্রকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্ত্রগুলি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরই একটু পরিবর্ত্তিত আকারমাত্র, আর কেহ উহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অসম্বদ্ধ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ ভাগ, বিশেষতঃ, অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ ভাগের সহিত মিলাইয়া তন্ত্র পাঠ করিতে পরামর্শ দিই, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন, তন্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ মন্ত্রই অবিকল ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। ভারতবর্ষে তন্ত্রের প্রভাব কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলে বলা যাইতে পারে যে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মব্যতীত হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমুদয় প্রচলিত ধর্ম্মই তন্ত্র হইতে গৃহীত আর উহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই উপাসনাপ্রণালীকে নিয়মিত করিয়া থাকে।

অবশ্য, আমি এ কথা বলি না যে, সকল হিন্দুই সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের স্বধর্ম্মের এই সকল মূল সম্বন্ধে অবগত আছেন। অনেকে, বিশেষতঃ, নিম্নবঙ্গে, এই সম্প্রদায় ও প্রণালীসমূহের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, কিন্তু জ্ঞাতসারেই

(১) শ্রীশঙ্করপ্রণীত বেদান্তভাষ্য।

(২) উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্ত। সন্ন্যাসিগণ এই প্রস্থানত্রয় শিক্ষা করিতে বাধ্য।

(৩) সংহিতা।

হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রস্থানের উপদেশানুসারে সকল হিন্দুই চলিয়াছেন।

অপর দিকে, যেখানেই হিন্দী ভাষা কথিত হয়, তথাকার অতি নীচ-জাতি পর্য্যন্ত নিম্নবঙ্গের অনেক উচ্চতম জাতি হইতে বৈদান্তিক ধর্ম্মসম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ।

ইহার কারণ কি ?

মিথিলাভূমি হইতে নবদ্বীপে আনীত, শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি মনীষিগণের প্রতিভার সযত্নে লালিত ও পরিপুষ্ট, কোন কোন বিষয়ে সমগ্রজগতের অন্যান্য সমুদয় প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ, অপূর্ব্ব সুনিবদ্ধ বাক্‌শিল্পে রচিত, তর্কপ্রণালীর বিশ্লেষণস্বরূপ বঙ্গদেশীয় ন্যায় শাস্ত্র হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেদের চর্চ্চায় বঙ্গবাসীর যত্ন ছিল না, এমন কি, কয়েক বর্ষ মাত্র পূর্ব্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্য(১) পড়াইতে পারেন, এমন কেহ বঙ্গদেশে ছিলেন না বলিলেই হয়। একবার মাত্র এক মহতী প্রতিভা সেই 'অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদক' (২) জাল ছেদন করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একবারমাত্র বঙ্গের আধ্যাত্মিক তন্দ্রা ভাঙ্গিয়াছিল, কিছু দিনের জন্য উহা ভারতের অপরাপর প্রদেশের ধর্ম্মজীবনের সহভাগী হইয়াছিল।

একটু বিস্ময়ের বিষয় এই, শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন, সুতরাং ভারতী (৩) ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাঁহার ধর্ম্মপ্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন।

বোধ হয় যেন পুরীসম্প্রদায় বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য ব্যাসসূত্রের যে ভাষ্য লিখেন, তাহা হয় নষ্ট হইয়াছে,

---

(১) পাণিনির ব্যাকরণের ভাষ্য। বেদশিক্ষা করিতে হইলে পাণিনির বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

(২) ন্যায়ে ব্যবহৃত শব্দদ্বয়—অবচ্ছিন্ন শব্দের অর্থ বিশিষ্ট, যাহা দ্বারা সীমাবদ্ধ করে, অবচ্ছেদকের অর্থ—যে বিশিষ্ট করে।

(৩) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণ দশটী সন্ন্যাসিসম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইঁহাদিগকে দশনামী বলে। যথা,—গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, সাগর, তীর্থ, সরস্বতী, পদ্ম।

না হয়, এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাঁহার শিষ্যেরা দাক্ষিণাত্যের মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিলেন। ক্রমশঃ রূপসনাতন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আসন বাবাজীগণ অধিকার করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যের মহান্ সম্প্রদায় ক্রমশঃ ধ্বংসাভিমুখে যাইতেছিল, কিন্তু আজকাল উহার পুনরভ্যুত্থানের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আশা করি, উহা শীঘ্রই আপন লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবে।

সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের শক্তি লক্ষিত হয়। যেখানেই লোকে ভক্তিমার্গ জানে, সেখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্ব্বক চর্চ্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে: আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য্যসম্প্রদায় (১) শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য্য করিতেছে। কিরূপেই বা জানিবেন? শিষ্যগণ গদিয়ান হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।

যে অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা, বঙ্গদেশ এবং অধিক পরিমাণে বঙ্গদেশেই প্রচলিত, তাহাও উহার, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ধর্ম্মজীবন হইতে পৃথক্ থাকিবার আর একটী কারণ।

সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, বঙ্গদেশ, এখন পর্য্যন্ত যাঁহারা সর্ব্বোচ্চ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনের প্রতিনিধি ও ভাণ্ডারস্বরূপ, সেই মহান্ সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের জীবন হইতে কখন শক্তিপ্রাপ্ত হয় নাই।

বঙ্গের উচ্চবর্ণেরা ত্যাগ ভাল বাসেন না, তাঁহাদের ঝোঁক ভোগের দিকে। তাঁহারা কিরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিবেন? ত্যাগে-নৈকেনামৃতত্বমানশুঃ, (২) অন্যপ্রকার কিরূপে সম্ভব হইবে?

অপর দিকে, সমুদয় হিন্দীভাষী ভারতের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অনেক সুদূর-ব্যাপিপ্রভাবসম্পন্ন মহামহা ত্যাগী আচার্য্যগণ বেদান্তের মত প্রতি গৃহে গৃহে

---

(১) বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। বল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য। এই সম্প্রদায় বোম্বাই অঞ্চলে খুব প্রবল।

(২) একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। একটী বৈদিক শ্লোকের অংশবিশেষ।

প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজত্ব কালে ত্যাগের যে মহিমা প্রচারিত হয়, তাহাতে অতি নিম্নশ্রেণীর লোকেও বেদান্তদর্শনের উচ্চতম উপদেশ পর্য্যন্ত শিক্ষা পাইয়াছে। প্রকৃত গর্ব্বের সহিত পঞ্জাবী কৃষকবালিকা বলিয়া থাকে, তাহার চরকা পর্য্যন্ত সোহহং সোহহং ধ্বনি করিতেছে। আর আমি হৃষীকেশের (১) জঙ্গলে সন্ন্যাসিবেশ-ধারী মেথরত্যাগীদিগকে বেদান্ত পাঠ করিতে দেখিয়াছি। অনেক গর্ব্বিত উচ্চবর্ণের লোকও তাঁহাদের পদতলে বসিয়া আনন্দের সহিত উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কেনই বা না করিবেন? 'অন্ত্যাদপি পরোধর্ম্মঃ।' (২)

অতএব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাববাসীরা, বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধিবাসিগণ হইতে ধর্ম্মবিষয়ে অধিক শিক্ষিত। দশনামী, বৈরাগী, পন্থী (৩) প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ত্যাগী পরিব্রাজকগণ প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্ম্ম বিলাইতেছেন। মূল্য এক টুক্‌রা রুটিমাত্র। আর তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কি মহৎ ও নিঃস্বার্থচরিত্র! কাচুপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত (স্বাধীন—যাঁহারা প্রচলিত কোন সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে চান না) একজন সন্ন্যাসী আছেন।(৪) তিনি উপলক্ষ্য হইয়া সমুদয় রাজপুতানায় শত শত বিদ্যালয় ও দাতব্য আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। তিনি জঙ্গলের ভিতর হাঁসপাতাল খুলিয়াছেন, হিমালয়ের দুর্গম গিরিনদীর উপরে লৌহসেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কখন মুদ্রা স্পর্শ করেন না; তাঁহার একখানি কম্বল ছাড়া সাংসারিক সম্বল আর কিছুই নাই, এই জন্য তাঁহাকে লোকে কম্‌লী স্বামী বলিয়া ডাকে—তিনি দ্বারে দ্বারে মাধুকরী দ্বারা আহার সংগ্রহ করেন। আমি তাঁহাকে কখন এক বাড়ীতে মুষ্টিভিক্ষা করিতে দেখি নাই, পাছে গৃহস্থের কোন ক্লেশ হয়। আর এরূপ সাধু তিনি একা নহেন, এরূপ শত শত সাধু রহিয়াছেন। তোমরা কি মনে কর, যত দিন এই ভূদেবগণ ভারতে জীবিত থাকিয়া তাঁহাদের দেবচরিত্ররূপ

---

(১) হরিদ্বার হইতে ১২ মাইল দূরে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সাধুদের তপোভূম। এখানে নানা সম্প্রদায়ের সাধু কুটীর বাঁধিয়া বর্ষাকাল ব্যতীত ৮ মাস সাধনভজন শাস্ত্রপাঠাদি করেন।

(২) নীচ ব্যক্তিগণের নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। (মনুসংহিতা)

(৩) বৈষ্ণবসাধুগণকে বৈরাগী বলে। পন্থী, যথা,—কবীরপন্থী, নানক-পন্থী প্রভৃতি।

(৪) ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেছেন, তত দিন এই প্রাচীন ধর্ম্মের বিনাশ হইবে ?

এই দেশে (আমেরিকায়) পাদরিগণ বৎসরের মধ্যে ছয় মাস মাত্র প্রতি রবিবার দুই ঘণ্টা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ৩০০০০, ৪০০০০, ৫০০০০, এমন কি, ৯০০০০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। আমেরিকাবাসিগণ তাঁহাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন আর বাঙ্গালী যুবকগণ শিক্ষা পাইয়াছেন, কম্লি স্বামীর ন্যায় এই সকল দেবতুল্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ব্যক্তিগণ অলস ভবঘুরে মাত্র !

'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।' (১)।

একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত লও—একজন অতি অজ্ঞ বৈরাগীর কথা ধর। তিনিও যখন কোন গ্রামে গমন করেন, তিনিও তুলসীদাস (২) বা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে যাহা জানেন, অথবা দাক্ষিণাত্যে হইলে আলওয়ারদিগের নিকট হইতে যাহা জানেন, তাহা শিখাইতে চেষ্টা করেন। ইহা কি কিছু উপকার করা নহে ? আর এই সমুদয়ের বিনিময়ে তাঁহার প্রাপ্য এক টুকরা রুটি ও একখণ্ড কৌপীন। ইহাঁদিগকে নির্দ্দয়ভাবে সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে, ভ্রাতৃগণ, তোমরা চিন্তা কর, তোমরা তোমাদের স্বদেশবাসিগণের জন্য কি করিয়াছ, যাহাদের ব্যয়ে তোমরা শিক্ষা পাইয়াছ, যাহাদিগকে শোষণ করিয়া তোমাদের পদগৌরব রক্ষা করিতে হয়, ও তোমাদের শিক্ষকগণকে, বাবাজীগণ কেবল ভবঘুরেমাত্র, এই শিক্ষার জন্য বেতন দিতে হয়।

আমাদের কতকগুলি স্বদেশী বঙ্গবাসী হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থানকে হিন্দুধর্ম্মের 'নূতন বিকাশ' বলিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা উহাকে 'নূতন' আখ্যা দিতে পারেন। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম সবে মাত্র বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিতেছে, এখানে এতদিন ধর্ম্ম বলিতে কেবল আহার বিহার ও বিবাহ সম্বন্ধীয় কতকগুলি দেশাচারমাত্রকেই বুঝাইত।

রামকৃষ্ণশিষ্যগণ হিন্দুধর্ম্মের যে ভাব সমগ্রভারতে প্রচার করিতেছেন,

---

(১) আদি পুরাণের এক শ্লোকের অংশ। আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, এই আমার মত।

(২) স্বনামখ্যাত সাধু। ইহার রচিত রামায়ণ হিন্দুস্থানীরা অতি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার দোঁহাগুলিও অতি গভীর উপদেশপূর্ণ।

তাহা সংশাস্ত্রের অনুমোদিত কি না, এই ক্ষুদ্র পত্রে সেই গুরুতর প্রশ্নের বিচারের স্থান নাই। তবে আমি আমার সমালোচকগণকে কতকগুলি সঙ্কেত দিব, যাহাতে তাঁহারা আমাদের মত বুঝিতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

প্রথমতঃ, আমি কখন এরূপ তর্ক করি নাই যে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থ হইতে হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ ধারণা হইতে পারে, যদিও তাঁহাদের কথা 'অমৃতসমান' এবং যাঁহারা উহা শুনেন, তাঁহারা 'পুণ্যবান।' হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে হইলে বেদ ও দর্শন পড়িতে হইবে এবং সমুদয় ভারতের প্রধান প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের উপদেশাবলি জানিতে হইবে।

ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা গোতমসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎস্যায়ন ভাষ্যের আলোকে 'আপ্ত' (১) সম্বন্ধে তাঁহার মত পাঠ কর, শবর ও অন্যান্য ভাষ্যকারগণের সাহায্যে যদি মীমাংসকগণের মত আলোচনা কর, অলৌকিক প্রত্যক্ষ ও আপ্ত সম্বন্ধে এবং সকলেই আপ্ত হইতে পারে কি না এবং এইরূপ আপ্তদিগের বাক্য বলিয়াই যে বেদের প্রামাণ্য, এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের মত যদি অধ্যয়ন কর, যদি তোমাদের মহীধরকৃত যজুর্ব্বেদভাষ্যের উপক্রমণিকা দেখিবার অবকাশ থাকে, তবে দেখিবে, তাহাতে বেদ মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়মাবলি, এ বিষয়ে সুন্দর বিচার আছে। তাঁহারা তাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বেদ অনাদি অনন্ত।

'সৃষ্টির অনাদিত্ব' মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই, ঐ মত, কেবল হিন্দুধর্ম্মের নহে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মেরও উহা একটী প্রধান ভিত্তি।

এক্ষণে, ভারতীয় সমুদয় সম্প্রদায়কে মোটামুটি জ্ঞানমার্গী বা ভক্তিমার্গী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক ভাষ্যের উপক্রমণিকা পাঠ করেন, তবে দেখিবেন, তথায় জ্ঞানের 'নিরপেক্ষতা' সম্পূর্ণভাবে বিচারিত হইয়াছে আর এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মানুভূতি ও মোক্ষ কোনরূপ অনুষ্ঠান, মত, বর্ণ, জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে না। যে কোন ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, (২) সেই ইহার অধিকারী। সাধনচতুষ্টয় সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধিকর কতকগুলি অনুষ্ঠানমাত্র।

(১) যিনি পাইয়াছেন—যিনি আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মনুষ্যস্বভাবসুলভদুর্ব্বলতাবিমুক্ত পুরুষ।

(২) (১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক - ব্রহ্ম নিত্য ও জগৎ অনিত্য—এই

ভক্তিমার্গসম্বন্ধে বক্তব্য এই, বাঙ্গালী সমালোচকগণও বেশ জানেন যে, কতকগুলি ভক্তিমার্গের আচার্য্য বলিয়াছেন, মুক্তির জন্ত জাতি বা লিঙ্গে কিছু আসিয়া যায় না, এমন কি, মনুষ্যজন্ম পর্য্যন্ত আবশ্যক নহে; একমাত্র প্রয়োজন—ভক্তি।

জ্ঞান ও ভক্তি সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং কোন আচার্য্যই এরূপ বলেন নাই যে, মুক্তিলাভে কোন বিশেষ মতাবলম্বীর, বিশেষ বর্ণের বা বিশেষ জাতির অধিকার। এ বিষয়ে 'অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ' (১) এই বেদান্তসূত্রের উপর শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বকৃত ভাষ্য পাঠ কর।

সমুদয় উপনিষদ্ অধ্যয়ন কর; এমন কি, সংহিতা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কর; কোথাও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় মোক্ষের সঙ্কীর্ণ ভাব পাইবে না। অপর ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতির ভাব ত সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। এমন কি, অধ্বর্য্যুবেদের সংহিতাভাগের চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্লোকে আছে,—(যদি আমার ঠিক স্মরণ থাকে) ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং। (২) এই ভাব হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বত্র রহিয়াছে। ভারতে কেহ কি কখন নিজ ইষ্টদেবতা নির্ব্বাচনের জন্য অথবা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হইবার জন্ত নিগৃহীত হইয়াছেন, যতদিন তিনি সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন? সামাজিক নিয়মভঙ্গাপরাধে সমাজ যে কোন ব্যক্তিকে শাসন করিতে পারেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি, এমন কি, অতি নীচ পতিত পর্য্যন্ত কখন হিন্দুধর্ম্মমতে মুক্তির অনধিকারী নহে। এই দুইটী একসঙ্গে মিশাইয়া

তত্ত্বের বিচার। (২) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ—সাংসারিক সুখে ও পারলৌকিক স্বর্গাদিভোগে বিতৃষ্ণা (৩) শমাদি ষট্‌সম্পত্তি (ক) শম—চিত্তসংযম (খ) দম—ইন্দ্রিয়সংযম (গ) উপরতি—সন্ন্যাস ও চিত্তবৃত্তির উপরম (ঘ) তিতিক্ষা—প্রতীকার ও চিন্তাবিলাপশূন্য হইয়া সমুদয় দুঃখসহন (ঙ) শ্রদ্ধা—গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস (চ) সমাধান—ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা। (৪) মুমুক্ষুত্ব—মোক্ষলাভে-জন্য প্রবল ইচ্ছা।

(১) বেদান্তসূত্র। ৩।৪।৩৬। ইহার অর্থ এই, শাস্ত্রে দেখা যায়, অনেক ব্যক্তি কোন আশ্রমবিশেষ অবলম্বন না করিয়াও জ্ঞানে অধিকারী হইয়াছিলেন।

(২) গীতাতেও আছে। অর্থ,—যাহারা কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া কর্ম্মে আসক্ত, সেই অজ্ঞগণকে জ্ঞানের কথা বলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের মতি বিচলিত করিবেন না।

গোল করিও না। ইহার উদাহরণ দেখ। মালাবারে একজন চণ্ডালকে, একজন উচ্চবর্ণের লোকের সঙ্গে এক রাস্তায় চলিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু সে মুসলমান বা খ্রীশ্চিয়ান হইলে তাহাকে অবাধে, সর্ব্বত্র যাইতে দেওয়া হয়, আর এই নিয়ম একজন হিন্দুরাজার রাজ্যে কত শতাব্দী ধরিয়া রহিয়াছে। ইহা একটু অদ্ভুত রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু অতিশয় প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও অপরাপর ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুধর্ম্মের সহানুভূতির ভাব ইহাতে প্রকাশ করিতেছে।

হিন্দুধর্ম্ম এই এক বিষয়ে জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, এই এক ভাব প্রকাশ করিতে সাধুগণ সংস্কৃতভাষার সমুদয় শব্দরাশি প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন যে, মানুষকে এই জীবনেই ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে হইবে আর অদ্বৈত বচনাবলি ইহার উপর এই ন্যায়সঙ্গত কথা যোগ দেন যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

এই মতের ফলস্বরূপ প্রত্যাদেশের অতি উদার ও মহান্ মত আসিতেছে; ইহা শুধু বৈদিক ঋষিগণ বলিয়াছেন, তাহা নহে; শুধু বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ (১) ও অপরাপর প্রাচীন মহাপুরুষেরা ইহা বলিয়াছেন, তাহা নহে, কিন্তু সে দিন সেই দাদুপন্থীসম্প্রদায়ভুক্ত ত্যাগী নিশ্চলদাসও নির্ভীকভাবে তাঁহার 'বিচারসাগর' গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন,

"যো ব্রহ্মবিদ্ ওই ব্রহ্ম তাকু বাণী বেদ।
সংস্কৃত ঔর ভাষামে করত ভ্রমকি ছেদ॥"

যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার বাক্যই বেদ; সংস্কৃত অথবা দেশপ্রচলিত যে কোন ভাষায় তিনি বলুন না কেন, তাহাতেই লোকের অজ্ঞান দূর হয়।

অতএব দ্বৈতবাদানুসারে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং অদ্বৈতবাদমতে ব্রহ্মভাবাপন্ন হওয়াই বেদের সমুদয় উপদেশের লক্ষ্য আর অন্য যে কিছু শিক্ষা বেদে আছে, তাহা সেই লক্ষ্যে পঁহুছিবার সোপানমাত্র। আর ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের এই মহিমা যে, তিনি নিজপ্রতিভাবলে ব্যাসের ভাবগুলি অদ্ভুতভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

নিরপেক্ষ সত্যহিসাবে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; আপেক্ষিক সত্য হিসাবে

(১) মহাভারত, বনপর্ব্ব দেখ।

এই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বা ভারতবহির্ভূত প্রদেশস্থ সমুদয় সম্প্রদায়ই সত্য। তবে কোন কোনটী অপরগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই মাত্র। মনে কর, কোন ব্যক্তি বরাবর সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি সূর্য্যের নূতন নূতন দৃশ্য দেখিবেন। যতদিন না তিনি প্রকৃত সূর্য্যের নিকট পঁহুছিতেছেন, ততদিন সূর্য্যের আকার, দৃশ্য ও বর্ণ প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন হইতে থাকিবে। প্রথমে সূর্য্যকে তিনি একটী বৃহৎ বলের ন্যায় দেখিয়াছিলেন। তার পর উহার আকৃতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। সূর্য্য বাস্তবিক কখন তাঁহার প্রথমদৃষ্ট বলের মত বা তার পর পর দৃষ্ট সূর্য্যসমূহের ন্যায় নহে। কিন্তু তথাপি ইহা কি সত্য নহে যে, সেই যাত্রী বরাবর সূর্য্যই দেখিতেছিলেন, সূর্য্যব্যতীত অপর কিছু দেখেন নাই? এইরূপ, সমুদয় সম্প্রদায়ই সত্য, কোনটী প্রকৃত সূর্য্যের নিকটতর, কোনটী বা দূরতর। সেই প্রকৃত সূর্য্যই আমাদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

আর যখন এই সত্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেষ্টা একমাত্র বেদ—অন্যান্য ঐশ্বরিক ধারণা যাঁহারই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ দর্শনমাত্র, যখন 'সর্ব্বলোকহিতৈষিণী শ্রুতি' সাধকের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে যাইবার সমুদয় সোপানগুলি দিয়া লইয়া যান, আর অন্যান্য ধর্ম্ম যখন ইহাদের মধ্যে কোন একটী রুদ্ধগতি ও স্থিতিশীল সোপান মাত্র, তখন জগতের সমুদয় ধর্ম্ম এই নামরহিত, সীমারহিত, নিত্য বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত।

শত শত জীবন ধরিয়া চেষ্টা কর, অনন্ত কাল ধরিয়া তোমার অন্তরের অন্তস্তল অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তথাপি এমন কোন মহৎ ধর্ম্মভাব আবিষ্কার করিতে পারিবে না, যাহা এই আধ্যাত্মিকতার অনন্ত খনির ভিতর পূর্ব্ব হইতেই নিহিত নাই।

তথাকথিত হিন্দু পৌত্তলিকতাসম্বন্ধে বক্তব্য এই. প্রথমে গিয়া দেখ, ইহা কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে, প্রথমে জান গিয়া, উপাসকগণ কোথায় প্রথমে উপাসনা করেন, মন্দিরে, প্রতিমায় অথবা দেহমন্দিরে।

প্রথমে, নিশ্চয় করিয়া জান, তাহারা কি করিতেছে—(শতকরা নিরনব্বই জনের অধিক নিন্দুকই এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ) তখন উহা বেদান্তদর্শনের আলোকে আপনিই ব্যাখ্যাত হইয়া যাইবে।

তথাপি এ কর্ম্মগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। বরং মনু খুলিয়া দেখ—উহা প্রত্যেক বৃদ্ধকে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছে, আর তাহারা

উহা গ্রহণ করুক বা না করুক, তাহাদিগকে সমুদয় কর্ম্ম অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।

সর্ব্বত্রই ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, এই সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হয়—'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' (ক্রমশঃ)

ধ্রুবচরিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।—প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গোলোকধাম।

(লক্ষ্মী সিংহাসনে উপবিষ্ট ও সখীদিগের গীত)

সখীগণ। ভাস্‌ছে আকাশ নীল আলোকে।

হাস্‌ছে শশী, পূর্ণজ্যোতিঃ, সেই পুলকে॥

তপন তারা গ্রহের মেলা,

ছুটোছুটি জ্যোতির খেলা,

দূরে ভেসে মেঘের মালা,

উঠ্‌ছে তড়িৎ আভা, চমকে চমকে॥

কোথা ভুবন হোচ্ছে বিলয়,

কোথা নব ভুবন উদয়,

অনন্ত লীলা তরঙ্গ বয়,

তোমারই হরি নয়ন পলকে॥

লক্ষ্মী। প্রিয় সখীগণ!

নাথ নাহি আসে কেন?

বহু দিন ধরি শূন্য সিংহাসন;

শূন্য এ গোলোকপুরী প্রাণেশ বিহনে।

ভক্তি। শূন্য নহে কিন্তু হৃদয় তোমার,

পূর্ণ নারায়ণ রূপে।

দিবানিশি, কমলাহৃদয়

ভাবে সেই চরণকমল।

হের, হের—নীলাম্বরে

নীলজ্যোতিঃ সহসা প্রকাশে;

আসে বুঝি হরি,
ক্রমে জ্যোতিঃ উজ্জ্বল উজ্জ্বলতর।

(নারায়ণের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। নাথ! অতীব কাতরা দাসী
বহু দিন হোতে নাহি হেরি শ্রীচরণ।

নারা। প্রিয়ে! তোমা চেয়ে
কাতর হোয়েছে প্রাণ প্রিয় ভক্ত তরে।

লক্ষ্মী। কোন্ ভক্ত, প্রভো!
ভক্তিডোরে পুনঃ বাঁধিল তোমায়?

নারা। দূর পৃথ্বীতলে, যমুনাপুলিনে,
মধুবন মাঝে,
ধ্রুব নামে পঞ্চমবর্ষীয় রাজার কুমার এক,
ডাকিছে আমায়,
অনাহারে, অনিদ্রায় হাহাকার কোরে।
তার তরে ক্ষণমাত্র স্থির না থাকিতে পারি।

লক্ষ্মী। প্রভো! অতি বিস্ময়ের কথা।
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু
করিয়াছে উচাটন তোমা।
কত শত যোগী ঋষি
সহস্র বৎসর ধরি
যে চরণ করি ধ্যান না পায় দর্শন,
রাজার কুমার ধ্রুব, পঞ্চম বরষে,
লভিবে তা কোন্ পুণ্যবলে?

নারা। প্রিয়ে!
পূর্ব্বজন্মে ছিল ধ্রুব ব্রাহ্মণকুমার।
ভক্তি সহকারে
করিত সে পিতৃমাতৃসেবা;
আমাতে একাগ্র মতি করিয়া স্থাপন
নিজ ধর্ম্ম প্রাণপণে করিত পালন।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই পুণ্যবলে,

আর এ জন্মের তীব্র সম্বেগ আবেগে,
করিবেক সিদ্ধিলাভ পঞ্চম বরষে।

লক্ষ্মী। প্রভো! ব্রাহ্মণের বংশে কেন না জনমি,
ক্ষত্রিয় রাজার বংশে জনমিল ধ্রুব?

নারা। প্রিয়ে! পূর্ব্বজন্মে
ধ্রুবের যৌবনকালে,
কোন এক রাজপুত্র মিত্র ছিল তার,
দেখিয়া ঐশ্বর্য্য তার, ধ্রুবের হৃদয়ে,
রাজপুত্র হব বলি জনমে বাসনা;
সেই বাসনার বলে
ক্ষত্রিয় রাজার বংশে লয়েছে জনম।
প্রিয়ে! ভক্ত দুঃখ হেরি
হৃৎপিণ্ড চূর্ণ হোয়ে যায়।
শুধু মুখে তার কোথা পদ্মপলাশলোচন,
সিংহে ব্যাঘ্রে নাহি করে ভয়,
মাতৃস্তন ত্যজি আমার চরণ সুধা,
সদা করিতেছে পান।
ঊর্দ্ধমুখে, আকাশের পানে চেয়ে,
দিবানিশি ডাকিছে আমায়
ভক্তি বারিধারা
বহে অবিরত নয়ন যুগল হোতে।
ভক্ত তবে প্রিয়ে! বিদীর্ণ হোতেছে প্রাণ।
দেখিয়াছি বহু ভক্ত
অনাদি অনন্ত কাল হোতে,
কিন্তু দেখি নাই কভু, শিশুহৃদে,
হেন ভক্তিস্রোত বহিতে প্রবল।

লক্ষ্মী। আহা! অহো! আর কেন তবে নাথ!
শিশু প্রতি হইছ নিঠুর?

নারা। ভক্ত প্রতি নিঠুর বোলো না প্রিয়ে!
বড়ই আঘাত লাগিতেছে প্রাণে।

একটু সাধন চাই ;
সাধন না হোলে,
নাহি পায় দরশন।

লক্ষ্মী। প্রভু! শুনিয়া শিশুর কঠোর সাধনা
বড়ই কাতর হইতেছে প্রাণ।
আজ্ঞা দেহ নাথ,
নিজে আমি যাই মধুবনে,
বড় সাধ
তোমার এমন ভক্তে
স্তনপান করাই আদরে কোলে লয়ে।

নারা। আনন্দ প্রবাহ ঢালিলে হৃদয়ে
ভক্তে মম করুণা প্রকাশি।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। জয় জয় কমলা, কমলারমণ,
জয় জয় পুরুষ প্রকৃতি মিলন।
অনন্ত বিশ্বের তুমি মা প্রকৃতি,
পরমেশ্বর হরি চিতি শকতি,
যুগল চরণে করি গো প্রণতি,
যুগল মিলনে বিশ্বের সৃজন।
রবি শশী গ্রহ চরণে গড়ায়,
ফুট'ছ মুদিছে ঐ রাঙ্গা পায়,
জীব কুল স্রোত অবিরল ধায়,
করুণা সঞ্চারি করিছ পালন।
পুনঃ শূন্যে হবে বিলীন যখন,
ওঁকার রূপেতে তুমিই তখন,
ভাসিবে একাকী ব্যাপি ত্রিভুবন,
নিভিয়া যাইবে শশাঙ্ক তপন।

নারা। কি হেতু আসিলে গোলোকে দেবেন্দ্র?
কুশলে আছে ত ইন্দ্রত্ব তোমার?

ইন্দ্র। ভগবন্! এখন কুশল বটে,

কিন্তু ভাবী অমঙ্গল ভয়ে,
শঙ্কিত হোতেছে প্রাণ।

নারা। কিবা তব শঙ্কার কারণ,
কহ দেবরাজ!

ইন্দ্র। নিবেদি চরণে শ্রীমধুসূদন!
দেখিলাম পৃথ্বীতলে,
মধুবনে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু
করিছে কঠোর তপ।
তপোতেজে তার
বিশ্ব বুঝি উলটিবা যায়।
লুপ্ত হয় বুঝি ইন্দ্রত্ব আমার;
নিষ্প্রভ তপন তাপসের তেজে,
রুদ্ধশ্বাস জীবলোক।
শঙ্কার কারণ কহিনু চরণে,
ত্রাণ কর প্রভো! অনাথতারণ!

নারা। সত্য বটে ইন্দ্র!
কিন্তু নাহি ভয় তব—
যাবে না ইন্দ্রত্ব।
ধ্রুব তরে, ধ্রুবলোক নামে
নবলোক হইছে সৃজন।
সপ্তর্ষি মণ্ডল
ঘেরি তাহে করিছে ভ্রমণ।
বহু তপস্যার ফলে,
ধ্রুব শিশু অবশেষে লভিবে সে লোক।
নির্ভয়ে ইন্দ্রত্ব ভোগ কর গে দেবেশ।

ইন্দ্র। প্রভো! পাইয়া আশ্বাস,
আশ্বস্ত হইল প্রাণ।
দেহ অনুমতি
যাই তবে অমর নগরে।
নমি দোঁহা চরণ যুগলে।   (প্রস্থান)

ভক্তি ইত্যাদি। কমলাকরুণাস্রোত বহিল উজান।
নীরবে কেশব আখিনীরে ভাসমান॥
ফুল ফুটেছে মধুবনে,
স্রোত ছুটেছে ফুলের পানে,
মাত্‌লো জগৎ ফুলের ঘ্রাণে, বিশ্বপ্রাণে দিচ্ছে টান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মধুবনের এক অংশ।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মধুর এ মধুবনে বিরাজিত শ্রীমধুসূদন,
প্রকৃতি পোরেছে যেন চির শান্তি আবরণ।
শান্তি ধারা ঝরে নিশির শিশিরে,
শান্তি বহে ঐ সুধীর সমীরে,
শান্তি স্রোত চলে যমুনার নীরে,
শান্ত কানন আজি যোগে মগন।
শান্তি হোতে উঠি অনাদি ওঁকার,
কাননে গগনে হইছে প্রচার
সে ওকার বীণা কর্‌ রে, ঝঙ্কার,
বলি ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ নারায়ণ।
বিহ্বল বিভুপ্রেমে যমুনা জলে,
ওঁকার নিনাদ তরঙ্গ উথলে,
ফল ফুল দুলে দুলে ওঁ ওঁ বলে,
ওঁ নারায়ণ বল আমার মন।
অনন্ত আকাশ রবি তারা সোম,
তরু শিরে লতা কুঞ্জে বিহঙ্গম,
অচল নির্ঝর বল ওঁ ওঁ
বল প্রতিধ্বনি ওঁ নারায়ণ।
ছয় মাস প্রায় হইল বিগত,
করিছে কঠোর তপ কোমল বালক।

হেরিয়া ধ্রুবের অদ্ভুত তপস্যা,
ত্রিভুবন হোয়েছে বিস্মিত।
তপোতেজে তার
স্থাবর জঙ্গমময় অনন্ত প্রকৃতি
হয়েছে কম্পিত।
ধ্রুবের হৃদয়ে
ভক্তিস্রোত বহিছে প্রবল ;—
কিন্তু যতক্ষণ ভগবান'তরে
ব্যাকুলতা না আসিবে ধ্রুব হৃদে—
নির্ম্মল নিষ্কাম না হবে হৃদয়,
ততক্ষণ নাহি ববে হৃদয়ে তাহার
সাত্ত্বিক ভক্তির স্রোত।
হইলে সাত্ত্বিক ভক্তি হৃদয়ে উদয়,
অহৈতুকী ভক্তি আসিবে আপনি।
সেই ভক্তি মুক্তির সোপান ;
প্রকৃত চরম ভক্তি তাহা।
সেই ভক্তিবলে
নারায়ণ দরশন হইবে ধ্রুবের।
যাই এবে যথা ধ্রুব মগ্ন তপস্যায় ;
দেখি গিয়া ধ্রুবের অবস্থা। (প্রস্থান)

একখানি পত্র।

ভাই, এই সেই বৃন্দাবন—যেখানে গোলোকবিহারী হরি ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী হইয়াছিলেন।

এই সেই যমুনাপুলিন—যেখানে কৃষ্ণবিরহিণী রাই উন্মাদিনী হইয়াছিলেন।

এই সেই বংশীবট—যেখানে ঠাকুর বাঁশী বাজাইয়াছিলেন—যে বাঁশীর রবে যমুনার জল উজান বইত, রাধা পাগলিনী হইত, গোপীগণ ধেয়ে যাইত, রাই কুটিলার যন্ত্রণা সইত, আয়ান ঘোষ লুকাইয়া রইত,—রাইকে পরীক্ষা করিতে।

এই সেই কুঞ্জবন,তাতে আবার বসন্তকাল,যাহার বিষয় কবি বলিয়াছেন,—

"এ সময়ে যদি কুঞ্জবনে যাও,
দেখে শুনে আর আসিতে না চাও।"

এই সেই নিধুবন—যেখানে গোপীগণসহ ঠাকুর খেলা করিয়াছিলেন, যেখানে রাধার পুষ্পশয্যা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে—যেখানে এখনও যাত্রিগণ দুই চারি খানা ইট দিয়া খেলার ঘর তৈয়ার করে।

এই সেই মদনমোহন—যাঁহার রূপে মদন মোহন।

গোবিন্দের বিষয় কি বলিব, যাঁহার দর্শনে এ পাষাণও দ্রব হইয়াছিল, চক্ষে বারিধারা বহিয়াছিল।

গোপীনাথের মাহাত্ম্য গোপীগণ জানেন, এ অধম হইতে তাহা কিরূপে বর্ণন হইবে?

বৃন্দাবন দর্শন করিলাম, এক আধ কথা লিখিতে হয়, তাই লিখিলাম। নতুবা বৈষ্ণব-বেদ ভাগবত যে স্থানের বর্ণন করিতে গিয়া, চকিত, ত্রস্ত, ভীত ও বিমোহিত হইয়াছেন, এ তুচ্ছাতিতুচ্ছ অধম কিরূপে তাহার সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে সমর্থ হইতে পারে?

এখন ঠাকুর বৃন্দাবনলীলা সমাপন করিয়া মথুরায় চলিলেন—যেখানে, জন্মস্থান কংসকারাগার গৃহটী, যাই যাই করিয়া নাম মাত্র রহিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে ঠাকুরকে লইয়া বসুদেব পলাইয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদের ভাগ্যে বা কারাগারই পলায়! কংসবেদীও তথৈবচ—সহরের এক প্রান্তরে ধূ ধূ করিতেছে। তবে যাত্রিপীড়ন-পরিপূরিত হিসাবের খাতাটা সেখানেও পাণ্ডাদের হাতে আছে। আর আছেন, পাতিত কংসোপরি সগদোত্তোলিত-হস্ত মূর্ত্তিস্থিত কৃষ্ণ বলরাম।

অশুষ্কা অভগ্না মাথুরীয়া যমুনা, অতীব সুন্দরী, মনোলোভা, নয়নরঞ্জনী, সুরঙ্গ-তরঙ্গ-ভঙ্গাঙ্গা।

কুব্জানাথের অপরূপ রূপে বুঝি মদনমোহনও মোহিত হন। সমস্তই দর্শন হইল, কেবল মথুরানাথের নহে। জানি না, কি দুরদৃষ্ট ছিল, যতবার যাই, ততবারই কপাট বন্ধ। ভাবিলাম, যেই কুব্জানাথ, যেই গোবিন্দ, যেই মদনমোহন, সেই ত মথুরানাথ, একের দর্শনেই সর্ব্বদর্শন সিদ্ধি।

বৃন্দাবনে ১৫ দিন পূর্ব্বেই দোল আরম্ভ হয়। একাদশীর দিন গোবিন্দের দোল দর্শন করিলাম। বড় রাস্তায় নিবিড় আবিরে রক্তবর্ণের কুজ্ঝটিকা, মধ্যে মধ্যে অভ্রচূর্ণ দ্বারা শ্বেতায়মান হইতে লাগিল। রাস্তায় অজস্রলোক,

কিন্তু কাহারও কাহাকেও দেখিবার যোটী নাই। সর্ব্বময় আবিরে অন্ধকার। হইবেই না কেন? যে বৃন্দাবন লীলার দোল উৎসবে আজ সমগ্র ভারত আনন্দিত, সেই বৃন্দাবনে কেনই বা ঈদৃশ আনন্দ না হইবে? তবে তামসিক লোকদিগদ্বারা অশ্লীলতাটুকুও বেশ ঢুকিয়াছে।

পূর্ণানন্দ লইয়া গত রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় ৺কাশীধামে প্রবেশ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আপনার পত্র পাইয়া অন্য ভাব আসিল, আপনাকে মনে হইল, পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল, চিঠিখানা দেখিয়া বুঝিলাম, আপনার ন্যায় লোকের যোগ্যই ইহা লিখিত হইয়াছে। সংসার-সুখকে এরূপ অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিতে না পারিলে আর ঐশ্বরীয় সুখের আশা আছে?

যে কথা লিখিয়াছেন—"একজন ভগবানের নিত্য বিলাসভূমিতে, আর একজন পিশাচের ক্রীড়াস্থলে! একজন কাশীতে, আর একজন দেখের-নগরেতে। তফাৎ অল্পই * * *।" সকলই ঠিক বটে, কিন্তু স্বর্গে ইন্দ্রের বড ভয়--কখন তাঁহার রাজত্ব যায়—কখন তাঁহাকে দৈত্যগণ আক্রমণ করে—কখন তাঁহাকে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" হইতে হয়। মর্ত্ত্যবাসিজনগণের আশা আছে—এক দিন দুঃখের শান্তি হইবে। এক দিন চন্দ্রত্ব, ইন্দ্রত্ব, এমন কি, মোক্ষপদও লাভ হইতে পারে; কিন্তু ইন্দ্রের সে আশা অতি অল্প। তিনি ভোগেই মত্ত। এখন আমি ৺ কাশীধামে আছি। পরম সুখ ভোগ করিতেছি। কিন্তু ভয় দৈত্য (রিপু) গণের—ভয় মর্ত্ত্য পতনের (কুদেশ গমনের)—ভয় পুণ্যক্ষীণতার।

যিনি প্রহ্লাদের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—কোলে করিয়া, ধ্রুবের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—বর দান করিয়া, দ্রৌপদীর কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—বস্ত্র দান করিয়া, অর্জ্জুনের কান্না ঘুচাইয়াছিলেন—সারথী হইয়া, তিনি কলির কাঙ্গাল আপনার আমার কান্না যে শীঘ্রই ঘুচাইবেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? যদি কাঁদার মত কাঁদিতে পারি। আমি অনেক কাঁদা কাঁদিয়াছিলাম, তাই এখন পরম সুখ লাভ করিতেছি। তাই বলি ভাই, কান্না কখনও বিফল নহে। 'এস ভাই, সকলে মিলিয়া কাঁদি, যাহাতে আর জন্মজন্মান্তর কাঁদিতে হইবে না।

আপনার সেই ভালবাসার মোক্ষদা।

নাস্তিক।

(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।)

দারাপুত্র পরিজনে উজ্জ্বল ভবন,
অর্থের অভাব নাই, সম্মান সকল ঠাঁই,
চেষ্টাবলে করিয়াছি উন্নতি সাধন;
কে ঈশ্বর? দুর্ব্বলের কল্পিত সৃজন!

আসিয়াছে ঝড়বৃষ্টি, নাস্তিক প্রান্তরে,
প্রলয়ের যেন শব্দ, বজ্রনাদে জীব স্তব্ধ,
উপায়বিহীন পান্থ আতঙ্কে শিহরে;
নহে স্থির—দীননাথে প্রত্যয় না করে!

জনপূর্ণ প্রাসাদেতে আজি হাহাকার!
এক মাত্র বংশধরে, শমন লয়েছে হরে,
বিকৃত-মস্তিষ্ক করে নাস্তিক চীৎকার,
ঈশ্বরে নির্ভর নাই কি করিবে আর!

নিশীথে সর্ব্বস্ব দস্যু করিল লুণ্ঠন;
নাস্তিক উন্মত্ত ধায়, প্রাণ ত্যজিবারে চায়,
চিরকাল করিয়াছে অর্থ উপার্জ্জন,
অর্থ বিনা শ্রেয়ঃ তার প্রাণ বিসর্জ্জন।

ঈশ্বরে প্রত্যয় যদি থাকিত তোমার,
অশান্তি লইয়া বুকে, জীবন কি যেত দুখে?
শান্তিহীন হইত কি হৃদয়-আগার,
আক্রমিতে পারিত কি অন্তরে আঁধার?

তিনি পিতা, মোরা সবে তাঁহার তনয়,
এ বিশ্বাস হৃদে যার, সুখে বা বিষাদে তার,
নির্ভয় অন্তর সদা শান্তির আলয়!
নহিলে নাস্তিক সম শুষ্ক মরুময়!!

ভাষ্যমূলম্।—ক্ঙিতি প্রতিষেধে তন্নিমিত্ত গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ক্ঙিন্নিমিত্তে যে গুণ বৃদ্ধীপ্রাপ্নুতস্তে ন ভবত ইতি।

বক্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—'ক্ঙিতি চঙ' সূত্রের স্বভাবতঃ এইরূপ অর্থ হয় যে, গ ইৎ, ক ইৎ এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু বার্ত্তিককার বলিতেছেন যে, এই সূত্রে, প্রতিষেধ বিষয়ে 'নিমিত্ত' শব্দ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে অর্থ এইরূপ হইবে যে, গ, ক, এবং ঙ ইৎ প্রযুক্ত, যে সকল স্থলে, গুণ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত; তাহা হইবে না; এইরূপ বলা উচিত।

তাহার (নিমিত্ত গ্রহণের) প্রয়োজন কি?

বার্ত্তিকমূলম্।—উপধারোরবীত্যর্থম্।

বার্ত্তিকানুবাদ—উপধার জন্য এবং 'রোরবীতি' র জন্য।*

ভাষ্যমূলম্।—উপধার্থং রোরবীত্যর্থং চ।

উপধার্থং তাবৎ। ভিন্নঃ। ভিন্নবানিতি॥ কিং পুনঃ কারণং ন সিদ্ধ্যতি॥ ক্ঙিতীত্যুচ্যতে। যত্র ক্ঙিত্যনন্তরো গুণো ভবিষ্যতি তত্রৈব স্যাৎ। চিতম্। স্তুতম॥ ইহতু নস্যাদ্। ভিন্নঃ ভিন্নবানিতি।

নন্থ চ যস্তগুণ চ্যতে তং ক্ঙিৎপরত্বেন বিশেষয়িষ্যামঃ। পুগন্ত লঘূপধস্যা-ঙ্গস্য গুণ উচ্যতে তচ্চাত্র ক্ঙিৎপরম্।

পুগন্ত লঘূপধস্যেতি নৈবং বিজ্ঞায়তে পুগন্তাঙ্গস্য লঘূপধস্য চেতি॥ কথং তর্হি॥ পুকি অন্তঃ পুগন্তঃ লঘ্বী উপধা লঘূপধা পুগন্তশ্চ লঘূপধাচ পুগন্ত লঘূপধং পুগন্ত লঘূপধস্যেতি॥ অবশ্যং চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ম্। অঙ্গবিশেষণে সতীহ প্রসজ্যেত। ভিনত্তি। ছিনত্তীতি।

রোরবীত্যর্থং চ। ত্রিধাবদ্ধো বৃষভোরোরবীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উপধাকার্য্য সিদ্ধির জন্য এবং 'রোরবীতি' প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য, সূত্রে. 'নিমিত্ত' গ্রহণ কর্ত্তব্য।

উপধা কার্য্যের জন্য, যথা,—'ভিন্নঃ,' 'ভিন্নবান্' ইত্যাদি প্রয়োগ যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে।

'নিমিত্ত' শব্দের গ্রহণ না করিলে; কি কারণেই বা ইহারা সিদ্ধ হইবে না?

এই সকল সিদ্ধ না হইবার কারণ এই,—সূত্রে, এইরূপ বলা হইয়াছে যে,—গ, ক এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হয়। সুতরাং এতদ্বারা এই

রূপ অর্থই প্রকাশিত হইবে যে, যে স্থলে গ্, ক্ বা ঙ্ ইৎএর অব্যবহিত পূর্ব্বে গুণ কর্ত্তব্য রহিয়াছে, সেই স্থলেই (নিষেধ) হইবে। যেমন ;—চিতম্ (‘চিঞ্’ ধাতু ‘ক্ত’ প্রত্যয়), স্তুতম্ (‘স্তুঞ্’ ধাতু ‘ক্ত’ প্রত্যয়) এ সকল স্থলে, ‘ক্’ ইৎ বিশিষ্ট ‘ক্ত’ প্রত্যয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ‘চি’ এবং ‘স্তু’ধাতুর ‘ই’ এবং ‘উ’কার থাকাতে যে, ‘সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ’ সূত্রানুসারে গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাদেরই গুণের নিষেধ করিল। কিন্তু এই সকল স্থলে নিষেধ হইবে না। যেমন,—ভিন্ন (‘ভিদির্’ ধাতু‘ক্ত’প্রত্যয়ে সিদ্ধ) ভিন্নবান্ (‘ক্তবতু’প্রত্যয়ে সিদ্ধ)। এই সকল স্থলে ‘ভিদ’ ধাতুর পরে, ‘ক’ইৎ বিশিষ্ট ‘ক্ত’প্রত্যয় হ লে ও ‘দ’কার ব্যবধানে থাকাতে, ‘পুগন্তলঘূপধস্য’ সূত্রানুসারে যে, ‘ই’কারের গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহার নিষেধ হইবে না ; সুতরাং ‘ভিন্ন’ প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

যদি বল যে, যাহার গুণ বলা হইয়াছে, তাহারই ক্, গ্, ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, নিষেধ হয় ; এইরূপ বিশেষণ করিব। যেমন,—‘পুক্’ অন্ত এবং লঘুউপাধা-বিশিষ্ট অঙ্গের গুণ বলা হইয়াছে। তাহা এই স্থলে, ক্, গ্, ঙ্ ইৎ পর বিশিষ্ট, হইলে হয় না, এইরূপ হইবে।

‘পুগন্তলঘূপধস্য’ এই সূত্রের অর্থ এইরূপ জানিবে না যে,—‘পুগন্ত যে অঙ্গ, তাহার এবং লঘূউপধার,’ এইরূপ সমাস করা হইয়াছে।

তবে কিরূপ ?

পুকেতে যে অন্ত সে পুগন্ত ; আর, লঘূ যে উপধা সে লঘুপধা। পুগন্ত এবং লঘুপধা পুগন্তলঘুপধ, তাহার পুগন্তলঘূপধের।

‘পুগন্ত লঘূপধস্য চ’ সূত্রে, এইরূপ বিগ্রহবাক্য, অবশ্যই জানিতে হইবে। নতুবা ‘অঙ্গের’ বিশেষণ করিলে,। ‘ভিনত্তি,’ ‘ছিনত্তি’ প্রভৃতি স্থলেও (‘ই’কারের) গুণ প্রসঙ্গ হইবে।

‘রোরবীতি’ প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য যে, ‘নিমিত্ত’ গ্রহণ কর্ত্তব্য ; তাহার দৃষ্টান্ত। যথা ;—‘ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি’ এই স্থলে, ‘রোরবীতি’শব্দে, ‘রু’ধাতুর উত্তর ‘যঙ্’ প্রত্যয় করিয়া ‘তিপ্’ প্রত্যয় করিলে, ‘যঙ্’ এর ‘ঙ’ইৎ হওয়াতে, ‘রু’ধাতুর ‘উ’কারের গুণ হইত না, সুতরাং ‘রোরবীতি’ প্রয়োগও সিদ্ধ হইত না। কিন্তু নিমিত্ত গ্রহণ করাতে ; যেহেতু এই স্থলে, ‘যঙ্’ নিমিত্ত গুণ হয় নাই, সেই হেতুই ঙ’ই প্রযুক্ত গুণের নিষেধও হইবে না। (এই স্থলে, ‘তিপ্’ নিমিত্তই গুণ হইয়াছে)।

ভাষ্যমূলম্।—যদি তন্নিমিত্ত গ্রহণং ক্রিয়তে। শচঙন্তে দোষঃ। স্রিয়তি। পিয়তি। ধিয়তি॥ প্রাহুদ্রুবৎ। প্রাসুস্রুবৎ। অত্র ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এই সূত্রে 'নিমিত্ত' গ্রহণ করা যায়; তবে, 'শচঙন্তে' দোষ হইবে। যেমন;—'ব্রি'ধাতুর উত্তর 'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'কর্ত্তরি শপ্' সূত্রানুসারে যেখানে 'শপ্ আগম হইবে; সেখানে, 'রি'র ইকারের 'ইয়ঙ্' আদেশ না হইয়া 'গুণ'. হইবে। অতএব, ('রি'ধাতুর) রিয়তি, ('পি'ধাতুর, ধিয়তি প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না। এইরূপ ('প্র'পূর্ব্বক 'স্রু' ধাতুর উত্তর 'লুঙ্' এর'তিপ্' প্রত্যয় করিলে, 'চঙ্' হইলে, 'চঙ্'এর 'ঙ' ইৎ হওয়াতে, গুণএর নিষেধ হইবে না; সুতরাং প্রাসুস্রুবৎ রূপও সিদ্ধ হইবে না) 'প্র'পূর্ব্বক 'দ্রু'ধাতুর উত্তর 'প্রাদুদ্রুবৎ' এবং 'প্র'-পূর্ব্বক 'স্রু'ধাতুর উত্তর 'প্রাসুস্রুবৎ' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না। ৫৫

বার্ত্তিকমূলম্।—শচঙন্তস্যান্ত লক্ষণত্বাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'শ'কারান্ত এবং চঙন্তের, অন্তরঙ্গ লক্ষণ প্রযুক্ত 'গুণ' হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—অন্তরঙ্গ লক্ষণত্বাদত্রেয়ঙুবঙোঃ কৃতয়োরনুপধাত্বাদ্ গুণো ন ভবিষ্যতি এবং ক্রিয়তে চেদং তন্নিমিত্ত গ্রহণং ন চ কশ্চিদ্দোষো ভবতি। ইমানি চ ভূয় স্তন্নিমিত্ত গ্রহণস্য প্রয়োজনানি। হতো হথঃ। উপোয়তে। ঔয়ত। লৌয়মানিঃ। পৌয়মানিঃ। নেনিক্ত ইতি।

নৈতানি সন্তি প্রয়োজনানি। ইহ তাবৎ হতোহথ ইতি। প্রসক্তস্যানভি-নিবৃত্তস্য প্রতিষেধেন নিবৃত্তিঃ শক্যা কর্ত্তুম্। অয়ং চ ধাতুপদেশাবস্থায়ামেবাকারঃ। ইহচোপেয়তে ঔয়ত লৌয়মানিঃ পৌয়মানিরিতি। রহি'ঙ্গে গুণবৃদ্ধী। অন্তরঙ্গঃ প্রতিষেধঃ। অসিদ্ধংবহিরঙ্গমন্তরঙ্গে। নেনিক্ত ইতি পররূপেণ ব্যবহিত্বান্ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—শপ্ এবং চঙ্ প্রত্যয় পরে থাকিলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, 'ব্রি'ধাতুর উত্তর 'শপ্' প্রত্যয় করিলে, এবং 'প্র'পূর্ব্বক'দ্রু'-ধাতুর উত্তর 'লুঙ'এর 'চঙ্' করিলে, 'ইয়ঙ্'ঃ আদেশ(১) অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রথমতঃ, ইয়ঙ্' আদেশ এবং 'উবঙ' আদেশ হইবে। এইরূপে 'রিয়তি' প্রভৃতি স্থলে, 'ইয়ঙ্' বা উবঙ্'আদেশ হইবার পরে, 'ই'বা 'উ'উপধা না হওয়াতে গুণও হইবে না।

এইরূপে এই 'তন্নিমিনিত্ত' গ্রহণ করা হইবে; এবং কোন দোষও হইবে না, অথচ 'নিমিত্ত'গ্রহণের, রাশি রাশি এই সকল প্রয়োজন রহিয়াছে, যেমন;—

হতঃ ('হন্'ধাতু 'তস্' বা'ক্ত'), হথঃ ('হন'ধাতু 'থস্'), উপোয়তে (উপ-পূর্ব্বক 'আঙ্'পূর্ব্বক 'বেঞ্' ধাতু কর্ম্মণি 'যক্' 'ত' আত্মনেপদের রূপ), ঔয়ত (আ—বেঞ্ + ত), লৌয়মানিঃ ('লুয়মান' শব্দ অপত্যার্থে 'ঞি') পৌয়মানিঃ পূয়মান + ঞি), নেনিক্ত ('নিজির্'ধাতু, 'যঙন্ত ক্ত') ইত্যাদি।

এই সকল কখনও ('নিমিত্ত'গ্রহণের) প্রয়োজন হইতে পারে না।

যদি বল যে 'হতঃ' 'হথঃ' এই সকল প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে? অর্থাৎ 'নিমিত্ত' গ্রহণ যদি না করা যায়, তবে সাধারণতঃ এরূপ অর্থ হইবে যে, গ, ক, এবং ঙ ইৎ পরে থাকিলে, তাহার পূর্ব্বে, গুণসংজ্ঞক কোনও বর্ণই থাকিতে পারিবে না; তবে 'ঙিৎ' (১) 'তস্', 'থস্' প্রভৃতি প্রত্যয়ের 'ত' 'থ' পরে থাকিলে, গুণবাচক 'হন' ধাতুর 'হ'কারস্থিত গুণবাচক অকার, কিরূপে অবস্থান করিবে?

এই স্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, কোনও স্থলে যদি কোনও পদার্থের বা আদেশের প্রসক্ত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহা, অনিভিনিবৃত্ত অর্থাৎ অনিষ্পন্ন হয়; তবেই তাহার প্রতিষেধের দ্বারা, নিবারণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু এই স্থলে (হন) ধাতুর উপদেশ কালেই ('হ'কারে) অকার রহিয়াছে। অতএব এইস্থলে অকারের প্রাপ্তিও নাই, নিষেধও হইবে না।

---

(১) সার্বধাতুকমপিৎ।১।২।৪। 'প'কার ইৎ হয় নাই এথন যে সার্বধাতুক, তাহার 'ঙ' ইৎ এর ন্যায় কার্য্য হয়। এই জন্য তস্, থস্ প্রভৃতি প্রত্যয় অপিৎ সার্বধাতুক হওয়াতে, ঙিৎ হইয়াছে।

উপোয়তে, ঔয়ত, লৌয়মানিঃ, পৌয়মানিঃ এই সকল স্থলেও 'যক্' প্রত্যয়ের 'ক'কার ইৎবিশিষ্ট 'য'কার পরে আছে বলিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞক 'ও'কার এবং 'ঔ'কার নিবৃত্তি হইবে না। কারণ, 'আদ্‌গুণঃ প্রভৃতি সূত্রানুসারে, যে সকল গুণ বা বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহারা 'বহিরঙ্গ' এবং নিষেধ কার্য্য অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ শাস্ত্র অসিদ্ধ হয়। এজন্য অন্তরঙ্গ কার্য্য বহিরঙ্গ কার্য্যকে দেখিতে পায় না বলিয়া গুণ এবং বৃদ্ধি হইল।

'নেনিক্ত' এই স্থলে 'ক' ইৎবিশিষ্ট 'ক্ত' প্রত্যয় পরে থাকিলেও 'গুণ' বাচক 'নে'র একারের পরে, বর্ণ দ্বয় ব্যবধান থাকাতে গুণের নিষেধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—উপধার্থেন তাবন্নার্থঃ। ধাতোরিতিবর্ত্ততে। ধাতুং ক্ঙিতি পরতো বিশেষয়িষ্যামঃ।

যদি ধাতুর্ব্বিশেষ্যতে বিকরণস্থ ন প্রাপ্নোতি। চিনুতঃ। স্তৃনুতঃ। লুনীতঃ। পুনীত ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।—উপধাকার্য্যের জন্য ও 'নিমিত্ত' শব্দগ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, (ন ধাতু লোপ 'আর্ধধাতুকে' সূত্র হইতে 'ধাতু' শব্দের অনুবৃত্তি আনিয়া) 'ধাতুর'ত বর্ত্তমানই আছে। সেই 'ধাতু' শব্দকে, গ্ক্ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ বৃদ্ধি কার্য্য নিষেধ হয়, এইরূপ বিশেষণ করিব। এক্ষণে, এইরূপ অর্থ হইবে যে, ধাতুর পরে ক্, গ্, ঙ্ ইৎ থাকিলে গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না।

যদি ধাতুর বিশেষণ করা যায়; বিকরণের প্রাপ্তি হইবে না? যেমন,—চিনুতঃ ('চিঞ্' চয়নে, স্বাদিগণীয় ধাতু বলিয়া, 'শ্নু' বিকরণ হইয়াছে, অতএব প্রত্যয়ের 'শ্নু' ধাতু না হওয়াতে, তাহার 'উ'কারের গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে না), স্তৃনুতঃ ('ষ্টুঞ্' অভিষবে ধাতু), লুনীতঃ ('লুঞ্' লবনে ক্র্যাদি গণীয় 'শ্না' বিকরণবিশিষ্ট ধাতু), পুনীতঃ ('পূঞ' পবনে) ইত্যাদি।

ভাষ্যমূলম্।—নৈষদোষঃ। বিহিত বিশেষণং ধাতুগ্রহণম্। ধাতোর্যে বিহিত ইতি।

ধাতোরেব তর্হি ন প্রাপ্নোতি।

নৈবং বিজ্ঞায়তে ধাতোর্বিহিতস্য ক্ঙিতীতি।

কথং তর্হি।

ধাতোর্বিহিতে ক্ঙিতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এই সকল স্থলে দোষ হইবে না। কারণ, বিহিত বিশেষণ-বিশিষ্ট, 'ধাতু' শব্দ গ্রহণ করিব। এক্ষণে এই অর্থ হইবে যে, ধাতুর উত্তর বিহিত যে, গ্, ক্, ঙ্ ইৎ প্রত্যয়, তাহা পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না। তাহা হইলেই, 'চি'ধাতুর উত্তর (ঙিৎ বিশিষ্ট) 'তস্' প্রত্যয় করিলে, 'শ্নু' প্রত্যয়ও ধাতুর উত্তর বিহিত করাতে, তাহার 'উ'কারের গুণ বা বৃদ্ধি হইবে না।

যদি এইরূপ হয়, তবে (মধ্যে 'শ্নু' প্রত্যয় ব্যবধান থাকাতে) ধাতুরই (গুণ বা বৃদ্ধি) প্রাপ্তি হইবে না। এইরূপ জানিবে না যে, ধাতুর উত্তর যাহা বিহিত (শ্নু, শ্না প্রভৃতি) হইয়াছে; তাহারই 'ইক্'এর গুণবৃদ্ধির নিষেধ হইবে।

তবে কি ?

গ্, ক্, ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, ই, ধাতুই হউক্ বা তদুত্তর বিহিতই হউক্, তাহার গুণ বা বৃদ্ধির নিষেধ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষং যত্র কার্য্যং তত্র দ্রষ্টব্যম্॥ পুগন্তলঘূপধস্যেত্যুপস্থিত মিদং ভবতি ক্ঙিতি নেতি।

অথবা যদেতস্মিন্‌যোগে ক্ঙিদ্‌গ্রহণং তস্যানবকাশত্বাদ্ গুণবৃদ্ধী ন ভবিষ্যতঃ।

অথবাচার্য্য প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ভবত্যুপধালক্ষণস্য প্রতিষেধ ইতি। যদয়ং ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ। ইকোঝল্ হলন্তাচ্চেতি ক্নুসনৌ কিতৌ করোতি।

কথংকৃত্বা জ্ঞাপকম্॥ কিৎ করণ এতৎপ্রয়োজনং গুণঃ কথং নস্যাদিতি। যদি চাত্র গুণপ্রতিষেধো ন স্যাৎ কিৎকরণ মনর্থকং স্যাৎ। পশ্যতি ত্বাচার্য্যো-ভবত্যুপধালক্ষণস্যাপি গুণস্য প্র তিষেধ ইতি। ততঃ ক্নুসনৌ কিতৌ করোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই নিয়ম করিব যে, কার্য্য-কাল, সংজ্ঞা এবং পরিভাষার হইয়া থাকে; সুতরাং ('ক্ঙিতিচ' এই পরিভাষা সূত্রও) যেখানে কার্য্য ('সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' প্রভৃতি স্থলে) উপস্থিত হইবে, সেখানে ই ইহা দেখা যাইবে। 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' সূত্রেই 'গুণ'কার্য্য প্রাপ্তি হইবে, সেই স্থানেই ('ক্ঙিতিচ' পরিভাষাসূত্র') ইহা উপস্থিত হইবে; সুত াং 'কিৎ,' 'গিৎ' এবং 'ঙিৎ' পরে থাকিলে, গুণ হইবে না।

অথবা এই (ক্ঙিতি চ) সূত্রে যে, গ, ক, বা ঙ্ ইৎ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার কোথাও অবকাশ নাই; তাহার অনবকাশ হেতুই জানা যাইতেছে যে, যেখানে গুণ এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইবে, (ক্ঙিৎপরে থাকিলে) তাহার ই নিষেধ হইবে।

অথবা আচার্য্যের অভিপ্রায় এইরূপই জানা যাইতেছে যে, উপধালক্ষণের ই গুণ বা বৃদ্ধির প্রতিষেধ হয়। যেহেতু তিনি, 'ত্রসিগৃধিধৃষিক্ষিপেঃ ক্নুঃ' ৩।২।১৪০। (১) (সূত্রে, 'ক্নু'প্রত্যয়; 'ইকোঝল্'।১।২।৯। (২) এবং 'হলন্তাচ্চ' ১।২।১০। (৩) 'সন্'প্রত্যয় 'ক' ইৎবিশিষ্ট করা হইয়াছে।

(১) ত্রস্ গৃধ্, ধৃষ্, এবং ক্ষিপ্ ধাতুর উত্তর 'ক্নু'প্রত্যয় হয়।

(২) 'ইক্'প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণ পরে আছে যার, এমন ঝল্‌প্রত্যাহারান্ত-র্গত আদিবিশিষ্ট ধাতুর উত্তর 'সন্' হয় এবং তাহা 'কিৎ' হয়।

(৩) 'ইক্'প্রত্যাহারান্তর্গতবর্ণের সমীপস্থিত হল্‌এর পরে ঝল্‌আদি বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর 'সন্' হয় এবং তাহা কিৎ হয়।

কি করিয়া ইহা জ্ঞাপক হইল?

'ক্নু'প্রত্যয়ে, এবং 'সন্'প্রত্যয়ের এ স্থলে, 'ক'ইৎ করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, কোনও প্রকারে যেন গুণ না হয়। যদি এই স্থলে গুণের নিষেধ না হয়; তবে এই স্থলে 'ক' ইৎ বিশিষ্ট 'ক্নু'প্রত্যয় করা অনর্থক হয়। আচার্য্য, ইহা দেখিয়াছেন যে, উপধালক্ষণ সম্পন্নগুণের ও প্রতিষেধহয়; এবং সেই হেতুই, ক্নু এবং সন্ প্রত্যয় 'ক'ইৎ বিশিষ্ট করিয়াছেন।

ভাষ্যমূলম্।--রোরবীত্যর্থেনাপি নার্থঃ। ক্ঙিতীত্যুচ্যতে। ন চাত্র কিতং ঙিতং বা পশ্যামঃ। প্রত্যয়লক্ষণেন প্রাপ্নোতি॥ ন লুমতা তস্মিন্নিতি প্রত্যয় লক্ষণ প্রতিষেধঃ।

তথাপি ন লুমতাঙ্গস্যেত্যুচ্যতে এবমপি ন দোষঃ।

কথম্। ন লুমতা লুপ্তেঽঙ্গাধিকারঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। কিংতর্হি যোসৌ লুমতা লুপ্যতে তস্মিন্যদঙ্গং তস্য যৎকার্য্যং তন্নভবতীতি। অথাপ্যঙ্গাধিকারঃ প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। এবমপি ন দোষঃ॥ কথম্। কার্য্যকালং সংজ্ঞাপরিভাষং যত্র কার্যং তত্রদ্রষ্টব্যম্। সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুককয়োর্গুণোভবতীত্যুপস্থিতমিদং ভবতি ক্ঙিতি নেতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'রোরবীতি' প্রয়োগসিদ্ধ হইবার জন্য ও নিমিত্ত গ্রহণের প্রয়োজন নাই। কারণ, সূত্রে ক্, গ্, এবং ঙ্ ইৎ পরে থাকিলে, গুণ এবং বৃদ্ধির নিষেধ বলা হইয়াছে; কিন্তু এই স্থলে 'ক'ইৎ ও দেখিতে পাই না বা 'ঙ'ইৎও দেখিতে পাই না। যদি বল যে, ('রু ধাতুর উত্তর যে, 'ঙ'ইৎ বিশিষ্ট 'যঙ্' প্রত্যয় করা হইয়াছে) 'প্রত্যয়লোপে প্রত্যয়লক্ষণম্'। ১।২।৬২। (১) সূত্রানুসারে, প্রত্যয় লক্ষণ মানিয়া 'ঙ'ইৎ হইয়াছে। তাহা হইতে পারে না। কারণ, ন লুমতাঙ্গস্য।১।১।৬৩। (২) সূত্রানুসারে, প্রত্যয়লক্ষণের নিষেধ হইয়া থাকে; সুতরাং এইস্থলে 'যঙ্' প্রত্যয়েরও, 'লুক্' বলিয়া লোপ হওয়ায়, সেই 'লুক্' বিশিষ্ট 'যঙ'প্রত্যয় পরে থাকিলে, প্রত্যয়লক্ষণের প্রতিষেধ হইবে। (১)

(সূত্রকারপক্ষে) অনন্তরযদি, 'নলুমতাঙ্গস্য'ও বলা যায় তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না।

কেন?

(১) প্রত্যয়ের লোপ হইলেও তাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য হইয়া থাকে।

(২) লুক্, শ্লু, এবং লুপ্, ইহারা লুবিশিষ্ট বলিয়া ইহাদিগকে লুমৎ' বলে। লুমৎ শব্দের দ্বারা লোপ্ হইলে তৎ নিমিত্ত অঙ্গকার্য্য হয় না।

'ন লুমতাঙ্গস্ত' সূত্র, অঙ্গাধিকার প্রকরণে প্রতিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব 'লুমতা' শব্দ দ্বারা যাহা লোপ হইবে; তাহাতে যে অঙ্গ অবস্থান করিবে, তাহার যে কার্য্য প্রাপ্তি হয়; তাহা হইবে না। সুতরাং 'ক্ঙিতি চ' সূত্র অঙ্গাধিকারী (৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদ হইতে অঙ্গাধিকার আরম্ভ হইয়াছে) না হওয়াতে প্রাপ্তি হইবে না।

অনন্তর বক্তব্য এই যে, যদি অঙ্গাধিকারের প্রতি নির্দ্দেশ ('নলুমতাঙ্গস্ত' সূত্র) করা যায়, তাহা হইলেও কোন দোষ হইবে না।

কিরূপে?

সংজ্ঞা এবং পরিভাষা, কার্য্যকালে হইয়া থাকে, অতএব যেখানে কার্য্য হইবে, সেখানে ই ইহার ('ক্ঙিতিচ'র) উপস্থিত দেখা যাইবে। অতএব 'সার্ব্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে গুণ হইবে, সেখানে ই এই 'ক্ঙিতিচ' সূত্র উপস্থিত হইয়া গুণের নিষেধ করিবে।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা ছান্দসমেতৎ। দৃষ্টানুবিধিশ্ছন্দসি ভবতি।

অথবা বহিরঙ্গো গুণোঽন্তরঙ্গঃ প্রতিষেধঃ। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

অথবা পূর্ব্বস্মিন্‌যোগে যদার্ধধাতুকগ্রহণং তদনবকাশং তস্তানবকাশত্বাদ্‌গুণো-ভবিষ্যতি।

ইহ কস্মান্ন ভবতি। লৈগবায়নঃ। কাময়তে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা (রোরবীতি), ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ জানিবে। বেদেতে যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, পরবর্ত্তীলোকগণও সেইরূপই বিধান করিয়া থাকেন।

অথবা ('রোরবীতি' এই স্থলে,) গুণকার্য্য বহিরঙ্গ, প্রতিষেধ কার্য্য অন্ত-রঙ্গ। সুতরাং অন্তরঙ্গ কার্য্যকর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গকার্য্য অসিদ্ধ হয় বলিয়া, গুণই হইবে।

অথবা পূর্ব্বসূত্রে ('ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে') যে, 'আর্ধধাতুক' শব্দের গ্রহণ হইয়াছে, তাহা চরিতার্থ হইতে কোথাও অবকাশ পায় নাই। সুতরাং তাহার অনবকাশত্ব প্রযুক্ত গুণই হইবে। (১)

যদি তাহাই হয়, তবে 'লৈগবায়নঃ' (২), 'কাময়তে' (৩) এই সকল

(১) এইটী 'নলুমতাঙ্গস্ত' সূত্রের, বার্ত্তিককারপক্ষে অর্থগ্রহণ করিয়া খণ্ডন করা হইল।

(২) নিরবকাশোবিধির্বলবান্ ভবতি।

মান্দ্রাজনিবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

[৫২৭ পৃষ্ঠার পর]

এই সকল কারণে, অন্যান্য দেশের অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষা একজন হিন্দুকৃষকও অধিক ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন। আমার বক্তৃতাসকলে ইউরোপীয় দর্শন ও ধর্ম্মের অনেক শব্দ ব্যবহারের জন্য কোন বন্ধু সমালোচনাচ্ছলে অনুযোগ করিয়াছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলে আমার পরম আনন্দ হইত। উহা অপেক্ষাকৃত সহজ হইত, কারণ, সংস্কৃত ভাষাই ধর্ম্মভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু বন্ধুটী ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য নরনারীগণ আমার শ্রোতা ছিলেন, আর যদিও কোন ভারতীয় খ্রীশ্চিয়ান মিসনরী বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা তাহাদের সংস্কৃতগ্রন্থের অর্থ ভুলিয়া গিয়াছে, মিসনরীগণই উহার অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তথাপি আমি সেই সমবেত বৃহৎ মিসনরীমণ্ডলীর মধ্যে এক জনকে দেখিতে পাইলাম না, যিনি সংস্কৃত ভাষার একটী পংক্তি পর্য্যন্ত বুঝেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বেদ, বেদান্ত ও হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় পবিত্র শাস্ত্রসম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া বড় বড় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন!

আমি কোন ধর্ম্মের বিরোধী, এ কথা সত্য নহে। আমি ভারতীয় খ্রীশ্চিয়ান মিসনরীদের বিরোধী, এ কথাও তদ্রূপ সত্য নহে। তবে আমি আমেরিকায় তাঁহাদের টাকা তুলিবার কতকগুলি উপায়ের প্রতিবাদ করি।

বালকবালিকার পাঠ্য পুস্তকে অঙ্কিত ঐ চিত্রগুলির অর্থ কি? চিত্রে অঙ্কিত যে, হিন্দুমাতা তাহার সন্তানগণকে গঙ্গায় কুম্ভীরের মুখে নিক্ষেপ করিতেছে। জননী কৃষ্ণকায়া, কিন্তু শিশু শ্বেতাঙ্গরূপে অঙ্কিত; ইহার উদ্দেশ্য, শিশুগণের প্রতি অধিক সহানুভূতি আকর্ষণ ও অধিক চাঁদাসংগ্রহ। ঐ ছবিগুলির অর্থ কি, যাহাতে একজন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে নিজ হস্তে একটী কাষ্ঠস্তম্ভে বাঁধিয়া পুড়াইতেছে, উদ্দেশ্য, সে ভূত হইয়া তাহার স্বামীর শত্রুগণকে পীড়ন করিবে?

বড় বড় রথ রাশি রাশি মনুষ্যকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিতেছে—এ সকল ছবির অর্থ কি? সে দিন এখানে (আমেরিকায়) ছেলেদের জন্য একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহাতে একজন পাদরি ভদ্রলোক তাঁহার কলিকাতা

দর্শনের বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি কলিকাতার রাস্তায় একখানি রথ কতকগুলি ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন।

মেমফিস নগরে আমি একজন পাদরী ভদ্রলোককে প্রচারকার্য্যে বলিতে শুনিয়াছি, ভারতের প্রত্যেক পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র শিশুদের কঙ্কালপূর্ণ একটী করিয়া পুষ্করিণী আছে।

হিন্দুরা খ্রীষ্টশিষ্যগণের কি করিয়াছেন যে, প্রত্যেক খ্রীশ্চিয়ান বালক-বালিকাকেই হিন্দুদিগকে দুষ্ট, হতভাগা ও পৃথিবীর মধ্যে ভয়ানক দানব বলিয়া ডাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয় ?

বালকবালিকাদের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার এক অংশই এই ;— খ্রীশ্চিয়ান ব্যতীত অপর সকলকে, বিশেষতঃ হিন্দুকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া, যাহাতে তাহারা শৈশবকাল হইতেই মিশনে তাহাদের পয়সা চাঁদা দিতে শিখে।

সত্যের খাতিরে না হইলেও অন্ততঃ তাঁহাদের সন্তানগণের নীতির খাতিরেও খ্রীশ্চিয়ান মিসনরীগণের আর এরূপ ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এরূপ বালকবালিকাগণ যে বড় হইয়া অতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর নরনারীতে পরিণত হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? কোন প্রচারক যতই অনন্ত নরকের যন্ত্রণা এবং তথাকার জ্বলমান অগ্নি ও গন্ধকের বর্ণনা করিতে পারেন, গোঁড়াদিগের মধ্যে তাঁহার ততই অধিক প্রতিপত্তি হয়। আমার কোন বন্ধুর একটী অল্পবয়স্কা দাসীকে 'পুনরুত্থান'সম্প্রদায়ের (৩৬) ধর্ম্মপ্রচার শ্রবণের ফলস্বরূপ, বাতুলালয়ে পাঠাইতে হইয়াছিল। তাহার পক্ষে জলন্ত গন্ধক ও নরকাগ্নির মাত্রাটা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছিল !

আবার মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত, হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থগুলি দেখ। যদি কোন হিন্দু খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে এরূপ এক পংক্তি লেখেন, তাহা হইলে মিসনরীগণ স্বর্গমর্ত্ত্য তোলপাড় করিয়া ফেলেন।

স্বদেশবাসিগণ, আমি এই দেশে এক বৎসরের অধিক হইল রহিয়াছি। আমি ইহাঁদের সমাজের প্রায় সকল অংশই দেখিয়াছি। এখন উভয় দেশের তুলনা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি যে, মিসনরীরা জগতে আমাদিগকে

(৩৬) যে সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাচীন ভাব বলিয়া অনুদার মতসমূহের পুনঃস্থাপনে প্রয়াসী। আমেরিকার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়বিশেষ।

যে দৈত্য বলিয়া পরিচয় দেন, আমরা তাহা নহি, আর তাঁহারাও আপনাদিগকে দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা দেবতা নহেন। মিশনরীগণ হিন্দুবিবাহপ্রণালীর দুর্নীতি, শিশুহত্যা ও অন্যান্য দোষের কথা যত কম বলেন, ততই ভাল। এমন অনেক দেশ থাকিতে পারে, যথাকার বাস্তবিক চিত্রের সমক্ষে মিসনরীগণের হিন্দুসমাজের সমুদয় কাল্পনিক চিত্র নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। কিন্তু বেতনভুক্ নিন্দুক হওয়া আমার জীবনের লক্ষ্য নহে। হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এ দাবী আর কেহ করে করুক, আমি ত কখন করিব না। এই সমাজের যে সকল ত্রুটি অথবা শত শত শতাব্দীব্যাপী দুর্ব্বিপাকবশে ইহাতে যে সকল দোষ জন্মিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর কেহই আমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। বৈদেশিক বন্ধুগণ, যদি তোমরা যথার্থ সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করিতে আইস, বিনাশ তোমাদের যদি উদ্দেশ্য না হয়, তবে তোমাদের কার্য্যের খুব উন্নতি হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

কিন্তু যদি এই অবসন্ন পতিত জাতির মস্তকে অনবরত, সময়ে অসময়ে ক্রমাগত গালিবর্ষণ করিয়া স্বজাতির নৈতিক শ্রেষ্ঠতা দেখান তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি স্পষ্টই বলিতে পারি, যদি একটু ন্যায়পর তার সহিত এই তুলনা করা হয়, তবে হিন্দুগণ, নীতিপরায়ণ জাতি হিসাবে জগতের অন্যান্য জাতি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ আসন পাইবেন।

ভারতে ধর্ম্মকে কখন ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই; কোন ব্যক্তিকেই তাহার ইষ্টদেবতা, সম্প্রদায় বা আচার্য্য মনোনয়নে বাধা দেওয়া হয় নাই; সুতরাং ধর্ম্মের এখানে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, অন্য কোথাও সেরূপ হইতে পায় নাই।

অপর দিকে আবার, ধর্ম্মের ভিতর এই নানাভাব বিকাশের জন্য একটী স্থিরবিন্দুর আবশ্যক হইল—সমাজ এই অচল বিন্দুরূপে গৃহীত হইল। ইহার ফল এই হইল যে, সমাজ কঠোরশাসনপূর্ণ ও একরূপ অচল হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়।

পাশ্চাত্য প্রদেশে কিন্তু সমাজ ছিল, বিভিন্নভাব বিকাশের ক্ষেত্র এবং স্থির বিন্দু ছিল ধর্ম্ম। প্রতিষ্ঠিত চর্চ্চের সহিত ঐকমত্য ছিল, ইউরোপীয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—এমন কি, এখনও তাহাই আছে আর যদি কোন সম্প্রদায় প্রচলিত মত হইতে কিছু স্বতন্ত্ররূপ হইতে যাইত, তাহাকেই শোণিতসাগরের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে হাঁটিয়া তবে একটু সুবিধা লাভ করিতে হইত। ইহার

ফল হইয়াছে একটী মহৎ সমাজসংহতি, কিন্তু তাহাতে যে ধর্ম্ম প্রচলিত, তাহা স্থূলতম জড়বাদের উপর কখন উঠে নাই।

আজ পাশ্চাত্য প্রদেশ আপনার অভাব বুঝিতেছে। এখন উন্নত পাশ্চাত্য ঈশ্বরতত্ত্বান্বেষিগণের মূলমন্ত্র হইয়াছে—'মানুষের যথার্থ স্বরূপ ও আত্মা।' সংস্কৃতদর্শন অধ্যয়নকারী মাত্রেই জানেন, এ হাওয়া কোথা হইতে বহিতেছে, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, যতক্ষণ ইহা নূতন জীবন সঞ্চার করিতেছে।

ভারতে আবার নূতন নূতন অবস্থার সংঘর্ষে সমাজসংহতির নবগঠন বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। বিগত শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ ধরিয়া ভারত সমাজ-সংস্কারসভা ও সমাজসংস্কারকে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু হায়! ইহার মধ্যে সকলগুলিই বিফল হইয়াছে। ইহাঁরা সমাজসংস্কারের রহস্য জানিতেন না। ইহাঁরা প্রকৃত শিখিবার জিনিষ শিখেন নাই। ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহারা আমাদের সমাজের যত দোষ, সব ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। প্রবাদবাক্যে যেমন আছে, মশা মাস্তে গালে চড়, তেমনি তাঁহারা সমাজের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া সমাজকেই একেবারে ধ্বংস করিবার যোগাড় করিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে তাঁহারা অটল অচল গাত্রে আঘাত করিয়াছিলেন শেষে উহার প্রতিঘাতবলে নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন। যে সকল মহামন নিঃস্বার্থ পুরুষ এইরূপ বিপথে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি ধন্য। আমাদের নিশ্চেষ্ট সমাজরূপ নিদ্রিত দৈত্যকে জাগরিত করিতে সংস্কারোন্মত্ততার এই বৈদ্যুতিক আঘাতের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

আমরা ইহাদিগকে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া ইহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান হই আইস। তাঁহারা ইহা শিক্ষা করেন নাই যে, ভিতর হইতে বিকাশ আরম্ভ হইয়া বাহিরে তাহার পরিণতি হয়, তাঁহারা শিক্ষা করেন নাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ক্রমসঙ্কোচের পুনর্বিকাশ মাত্র। তাঁহারা জানিতেন না, বীজ উহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূত হইতে উপাদান সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃক্ষ হইয়া থাকে। হিন্দুজাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া নূতন কোন জাতি যতদিন না তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, ততদিন সমাজের এরূপ বিপ্লবকর সংস্কার সম্ভব নহে। যতই চেষ্টা কর না কেন, যতদিন না ভারতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেছে, ততদিন ভারত কখন ইউরোপ হইতে পারে না।

ভারতের কি অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে? সেই ভারত, যাহা সমুদয় মহত্ব, নীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাচীন জননী, যে ভূমিতে সাধুগণ বিচরণ করিতেন, যে ভূমিতে ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তিগণ এখনও বাস করিতেছেন? সেই গ্রীসিয় সাধু সক্রেটিসের নিকট সত্যানুসন্ধান আলোক লইয়া হে ভ্রাতৃগণ, এই বিস্তৃত জগতের প্রত্যেক নগর, গ্রাম, অরণ্য অন্বেষণ করিতে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে রাজি আছি, অপর স্থানে যদি একপ লোক পাও, ত দেখাও। এ প্রবাদ ঠিক যে, ফল দেখিয়া গাছ চেনা যায়। ভারতের প্রত্যেক আম্রবৃক্ষের তলে বসিয়া বৃক্ষ হইতে পতিত ঝুড়ি ঝুড়ি কীটদষ্ট, পক্ক, আম্র কুড়াও ও তাহাদের প্রত্যেকটী সম্বন্ধে একশত করিয়া খুব গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা কর। তথাপি তুমি একটী আম্রসম্বন্ধেও সঠিক তত্ত্ব লিখিতে পারিলে না। একটী সুপক, সরস, সুমিষ্ট আম্রে পাড়িয়া তাহার বর্ণনা করিলেই বুঝিব, তুমি আম্রের প্রকৃত গুণ বিদিত হইয়াছ ও তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিয়াছ।

এই ভাবেই এই ঈশ্বরকল্প মানবগণই হিন্দুধর্ম্ম কি, তাহা প্রকাশ করেন। যে জাতিরূপ বৃক্ষ শত শত শতাব্দী ধরিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত, যাহা সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও অনন্ত তারুণ্যের অক্ষয় তেজে এখনও গৌরবান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইঁহাদের জীবন দেখিলেই তাহার স্বরূপ, শক্তি ও তাহার গূঢ়নিহিত তেজের বিষয় জানা যায়।

ভারতের কি বিনাশ হইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা চলিয়া যাইবে, চরিত্রের মহান্ আদর্শ সমুদয় নষ্ট হইবে, সমুদয় ধর্ম্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিনষ্ট হইবে, সমুদয় ভাবুকতা নষ্ট হইবে, তাহার স্থলে কাম ও বিলাসিতারূপ দেবদেবীর রাজত্ব হইবে; অর্থ হইবেন—তাহার পুরোহিত; প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে—তাহার পূজাপদ্ধতি আর মানবাত্মা হইবেন, তাহার বলি। এরূপ কখন হইতে পারে না। কার্য্যশক্তি হইতে সহশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ; ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান। যাঁহারা মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান পুনরুত্থান কেবল দেশহিতৈষিতাপ্রবৃত্তির একটী বিকাশমাত্র, তাঁহারা ভ্রান্ত।

প্রথমতঃ, আমরা এই অপূর্ব্ব ব্যাপার কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি আইস।

ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, একদিকে যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রবল আক্রমণে পাশ্চাত্য মমতান্ধ ধর্ম্মসমূহের প্রাচীন দুর্গসমূহ ধূলিসাৎ হইতেছে—একদিকে যেমন বর্ত্তমান বিজ্ঞানের হাতুড়ির চোটে, বিশ্বাস অথবা চর্চ্চসমিতির অধিকাংশের সম্মতিই যাহার মূল, সেই সকল ধর্ম্মমতরূপ মৃৎপাত্রকে গুঁড়াইয়া ছাতু করিয়া ফেলিতেছে, একদিকে যেমন আততায়ী আধুনিক চিন্তার ক্রমবর্দ্ধনশীল স্রোতের সহিত আপনাকে মিলাইতে পাশ্চাত্য ধর্ম্মমতসকল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে, একদিকে যেমন অপর সমুদয় ধর্ম্মপুস্তকের মূলগ্রন্থগুলি হইতে আধুনিক চিন্তার ক্রমবর্দ্ধনশীল তাড়নায়, যথাসম্ভব বিস্তৃত ও উদার অর্থ বাহির করিতে হইয়াছে, আর তাহাদের অধিকাংশই ঐ চাপে ভগ্ন হইয়া অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভাণ্ডারে রক্ষিত হইয়াছে; একদিকে যেমন অধিকাংশ পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি চর্চ্চের সঙ্গে সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া অশান্তিসাগরে ভাসিতেছেন, অপর দিকে তেমনি যে সকল ধর্ম্ম সেই বেদরূপ জ্ঞানের প্রস্রবণমূল হইতে প্রাণপ্রদ জল পান করিয়াছে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মেরই কেবল পুনরুত্থান হইতেছে?

অশান্ত পাশ্চাত্য নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী কেবল গীতা বা ধম্মপদেই (৩৭) স্বীয় আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

অদৃষ্টচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে। আর যে হিন্দু নৈরাশ্যাশ্রুপরিপ্লুতনেত্রে নিজ বাসভবনকে আততায়িপ্রদত্ত অগ্নিতে বেষ্টিত দেখিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে বর্ত্তমান চিন্তার প্রখর আলোকে ধূম অপসারিত হইবার পর দেখিতেছেন, তাঁহার গৃহই একমাত্র নিজ বলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে আর অপরগুলি সব হয় ধ্বংস হইয়াছে, নয়, হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত হইতেছে। তিনি এক্ষণে তাঁহার অশ্রুমোচন করিয়াছেন আর দেখিতে পাইয়াছেন, যে কুঠার সেই "ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের" (৩৮) মূলদেশ কাটিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে বাস্তবিক অস্ত্রচিকিৎসকের ক্ষুরীর কার্য্য করিয়াছে।

তিনি দেখিতেছেন, তাঁহার ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ

(৩৭) বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্র।

(৩৮) কঠোপনিষদ্ ও গীতা হইতে গৃহীত—অর্থ—এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে (ব্রহ্ম) আর নিম্নে শাখা প্রশাখা গিয়াছে। এখানে হিন্দুধর্ম্মকে বুঝাইতেছে।

অথবা অন্য কোনরূপ কপটতা করিবার আবশ্যকতা নাই। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার শাস্ত্রের নিম্নাঙ্গগুলিকে নিম্নই বলিতে পারেন, কারণ, তাহা অরুন্ধতীদর্শনন্যায়মতে (৩৯) নিম্নাধিকারিগণের জন্য বিহিত। সেই প্রাচীন ঋষিগণকে ধন্যবাদ, যাঁহারা এরূপ সর্ব্বব্যাপী, সদাবিস্তারশীল ধর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা জড়রাজ্যে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে ও যাহা কিছু হইবে, সবই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে। তিনি সেইগুলিকে নূতন ভাবে বুঝিতে শিখিয়াছেন এবং আবিষ্কার করিয়াছেন যে, যে সকল আবিষ্ক্রিয়া প্রত্যেক সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষে এত ক্ষতিকর হইয়াছে, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের ধ্যানলব্ধ তুরীয় ভূমি হইতে আবিষ্কৃত সত্যসমূহের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ভূমিতে পুনরাবিষ্কার মাত্র।

এই কারণেই তাঁহার কিছুই ত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই অথবা অন্য কোন স্থলে অন্য কিছু খুঁজিবার জন্য তাঁহার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যে অনন্ত ভাণ্ডার তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ লইয়া নিজ কাযে লাগাইলেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহা তিনি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ক্রমশঃ আরো করিবেন। ইহাই কি বাস্তবিক এই পুনরুত্থানের কারণ নহে?

বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমাদিগকে আমি বিশেষ করিয়া আহ্বান করিয়া বলিতেছি,—

ভ্রাতৃগণ, লজ্জার বিষয় হইলেও ইহা আমরা জানি যে, বৈদেশিকগণ যে সকল প্রকৃত দোষের জন্য হিন্দুজাতিকে নিন্দা করেন, তাহার কারণ আমরা। আমরাই ভারতের অন্যান্য জাতির মস্তকে অনেক অনুচিত গালিবর্ষণের কারণ। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা ইহা সম্পূর্ণ জানিতে পারিয়াছি আর তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমরা শুধু আপনাদিগকেই শুদ্ধ করিব, তাহা নহে, সমুদয় ভারতকেই সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত আদর্শানুসারে জীবন গঠন করিতে সাহায্য করিতে পারিব। প্রথমে আইস, প্রকৃতি ক্রীতদাসের কপালে সদাই যে ঈর্ষ্যারূপ তিলক অঙ্কিত করেন, তাহা মোচন করি। কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত

(৩৯) অরুন্ধতী অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র বিশেষ। কাহাকেও এই নক্ষত্র দেখাইতে হইলে প্রথমে উহার নিকটবর্ত্তী বৃহৎ কোন নক্ষত্রকে দেখাইয়া তাহাতে চক্ষু স্থির হইলে তবে অরুন্ধতী দৃষ্টিগোচর হয়। সেইরূপ ধর্ম্মের সূক্ষ্মভাব বুঝিতে হইলে প্রথমে স্থূলভাবের সাহায্য লইতে হয়।

হইও না। সকল শুভকর্ম্মানুষ্ঠায়ীকেই সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক। ত্রিলোকীর প্রত্যেক জীবের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা প্রেরণ কর।

আমাদের ধর্ম্মের এক কেন্দ্রীভূত সত্য—যাহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই সাধারণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, তাহার উপর দণ্ডায়মান হই আইস। সেই কেন্দ্রীভূত সত্য এই মানবাত্মা, অজ, অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত মানবাত্মা, যাঁহার মহিমা স্বয়ং বেদ প্রকাশ করিতে অক্ষম, যাঁহার মহিমার সমক্ষে অনন্ত সূর্য্য চন্দ্র তারকা ও নীহারময় নক্ষত্রপুঞ্জ বিন্দুতুল্য। প্রত্যেক নরনারী, শুধু তাহাই নহে, উচ্চতম দেব হইতে তোমাদের পদতলস্থ ঐ কীট পর্য্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা, হয় উন্নত, নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

আত্মার এই অনন্ত শক্তি, জড়ের উপর প্রয়োগ করিলে ভৌতিক উন্নতি হয়, চিন্তার উপর প্রয়োগ করিলে মনীষার বিকাশ এবং আপনার উপর প্রয়োগ করিলে মানুষকে ঈশ্বর করিয়া তুলে।

প্রথম আমরা ব্রহ্মত্ব লাভ করি আইস, পরে অপরকে ব্রহ্ম হইতে সাহায্য করিব। 'আপনি সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর,' ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। মানুষকে পাপী বলিও না। তাহাকে বল, তুমি ব্রহ্ম। যদিও শয়তান কেহ থাকে, তথাপি আমাদের ব্রহ্মকেই স্মরণ করা কর্ত্তব্য—শয়তানকে নহে।

যদি গৃহ অন্ধকার থাকে, তবে সর্ব্বদা অন্ধকার অন্ধকার বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না। আলো লইয়া আইস। জানিয়া রাখ, যাহা কিছু অভাবাত্মক, যাহা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই নিযুক্ত, যাহা কিছু কেবল দোষদর্শনাত্মক, তাহা চলিয়া যাইবেই যাইবে, যাহা কিছু ভাবাত্মক, যাহা কিছু গড়িতে চেষ্টা করে, যাহা কোন একটী সত্য স্থাপন করে, তাহাই অবিনাশী, তাহাই চিরকাল থাকিবে। এস, আমরা বলিতে থাকি, 'আমরা সৎস্বরূপ, ব্রহ্ম সৎস্বরূপ আর আমরাই ব্রহ্ম, শিবোঽহং শিবোঽহং'—এই বলিয়া অগ্রসর হইয়া যাই, চল। জড় আমাদের লক্ষ্য নহে, চৈতন্য। যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহাই নামরূপহীন সত্তার অধীন। শ্রুতি বলেন, ইহাই সনাতন সত্য। আলোক লইয়া আইস, অন্ধকার আপনিই চলিয়া যাইবে। বেদান্তকেশরী গর্জ্জন করুক, শৃগালগণ তাহাদের গর্ত্তে পলায়ন করিবে। ভাব চারিদিকে ছড়াইতে থাক ; ফল যাহা হইবার, হউক। বিভিন্ন রাসায়নিক [illegible]

বাখিয়া দাও; উহাদের মিশ্রণ আপনা আপনিই হইবে। আত্মার শক্তির বিকাশ কর; উহার শক্তি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দাও; যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা আপনা আপনিই আসিবে।

তোমার আভ্যন্তরিক ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট কর, সমুদয়ই উহার চারিদিকে সামঞ্জস্যভাবে বিন্যস্ত হইবে। বেদে বর্ণিত ইন্দ্রবিরোচনসংবাদ (৪০) স্মরণ কর, উভয়েই তাঁহাদের ব্রহ্মত্বসম্বন্ধে উপদেশ পাইলেন। কিন্তু অসুর বিরোচন তাঁহার দেহকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিলেন, ইন্দ্র কিন্তু দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিক আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তোমরা সেই ইন্দ্রের সন্তান; তোমরা সেই দেবগণের বংশধর। জড় কখন তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না, দেহ কখন তোমাদের ঈশ্বর হইতে পারে না।

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া— সন্ন্যাসীর বেশসহায়ে, অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে। বলিও না, তোমরা দুর্ব্বল, বাস্তবিক, সেই আত্মা সর্ব্বশক্তিমান। রামকৃষ্ণের শ্রীচরণের দেবস্পর্শে যে ঐ কয়েকটী মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহারা আসাম হইতে সিন্ধু ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশামৃত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা পদব্রজে ২০০০০ ফুট উর্দ্ধবর্ত্তী হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিব্বতের রহস্য ভেদ করিয়াছেন। তাঁহারা চীরধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন। কত অত্যাচার তাঁহাদের উপর দিয়া গিয়াছে – এমন কি, তাঁহারা পুলিস দ্বারা অনুসৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অবশেষে যখন গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নির্দ্দোষিতার বিষয়ে বিশেষরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে তাঁহারা বিংশতি জন মাত্র। কালই যেন এই সংখ্যা দ্বিসহস্রে পরিণত হয়। হে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ তোমাদের দেশের জন্য ইহা প্রয়োজন, সমুদয় জগতের জন্য ইহা প্রয়োজন। তোমাদের আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মশক্তি জাগরিত কর, উহা তোমাদিগকে ক্ষুধাতৃষ্ণা শীত উষ্ণ সমুদয় সহ্য করিতে সক্ষম করিবে। বিলাসপূর্ণ গৃহে বসিয়া, সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগে পরিবেষ্টিত

([illegible])...দের শেষাংশ দেখ।

থাকিয়া একটু সুখের ধর্ম্ম করা অন্যান্যদেশের পক্ষে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু ভারতের অস্থিমজ্জায় ইহা হইতে উচ্চতর ভাব জড়িত। সে সহজেই প্রতারণা ধরিয়া ফেলে। তোমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। মহৎ হও। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। পুরুষ স্বয়ং জগৎসৃষ্টি করিবার জন্য আপনার স্বার্থত্যাগ করিলেন, আপনাকে বলি দিলেন। তোমরা সর্ব্বপ্রকার আরাম, সুখসচ্ছন্দ, নাম, যশ অথবা পদ, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া মানবরূপ শৃঙ্খলগঠিত এমন একটী সেতু নির্ম্মাণ কর, যাহার উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক এই জীবনসমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকারী শক্তিকে একত্রীভূত কর। তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া যাত্রা করিতেছ, সে দিকে লক্ষ্য করিও না। তোমার পতাকা নীল, হরিত বা লোহিত, তাহা গ্রাহ্য করিও না, কিন্তু সমুদয় রঙ মিশাইয়া প্রেমরূপ শ্বেতবর্ণের তীব্র জ্যোতির প্রকাশ কর। আমাদের আবশ্যক—কার্য্য করিয়া যাওয়া—ফল যাহা, তাহা আপনা আপনি হইবে। যদি কোন সামাজিক নিয়ম তোমার ব্রহ্মত্বলাভের প্রতিকূল হয়, তাহা আত্মার শক্তির সম্মুখে আর টিকিবে না। আমি ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা দেখিতে পাইতেছি না, দেখিবার জন্য আমার আগ্রহও নাই। কিন্তু আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনামাতা আবার জাগরিতা হইয়াছেন, পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিক মহিমান্বিতা হইয়া পুনর্ব্বার নব-যৌবনশালিনী হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ সহকারে তাঁহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।

কর্ম্ম ও প্রেমে চিরকাল তোমাদেরি

বিবেকানন্দ।

ধ্রুবচরিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মধুবনের অপর পার্শ্ব।

(ধ্রুব তপস্যায় মগ্ন ও নারদের প্রবেশ)

নারদ। আহা! এই মধুবন!
পূর্ণ যেন পবিত্র হাওয়ায়।
বোধ হয়, সব যেন ভক্তিমাখা, দয়ামাখা, শান্তিমাখা হেথা।
ফলভরে নতশির তরুশাখাগুলি
যেন ভক্তিভাবে ভগবানে করিছে প্রণাম।
মৃদুল সমীরে, কভু দুলে ধীরে ধীরে
অলক্ষ্যে দুলায় যেন পাখা,
পাছে কীট পতঙ্গাদি ধ্রুব অঙ্গে বসি
ধ্রুব ধ্যান করে ভঙ্গ।
আহা! কিবা ভক্তির মহিমা।

(নেপথ্যে ভক্তির গীত)

আমারে যে চায়, সেই তারে পায়,
আঁধার খনিতে উজলে মণি।

নারদ। কোমল সঙ্গীত স্রোত কোথা হোতে আসে?
কে গাইছে—"আমারে যে চায় সেই তাঁরে পায়"
কাহারে চাইলে কারে পাওয়া যায়?
ভক্তিরে চাইলে ভগবান মিলে।
"আঁধার খনিতে উজলে মণি"
সত্য বটে—অজ্ঞানতারূপ
অন্ধকারময় হৃদয়খনিতে
জ্বলে উঠে জ্ঞানরূপ মণি।
ধ্রুবের সে ভক্তির প্রবাহে,
জড় প্রকৃতিও যেন হইয়াছে ভক্তিমাখা,
সেই ভক্তি

মূর্ত্তিমতী হোয়ে বুঝি আসিছে নিকটে,
তাহারই এ মিষ্ট কণ্ঠধ্বনি।

(গাইতে গাইতে ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি। আমারে যে চায়, সেই তাঁরে পায়,
আঁধার খনিতে উজলে মণি।
আমি না আইলে, সহজে না মিলে,
নব জলধর সেই রূপ খানি॥
সাধুর বিমল হৃদয় মন্দিরে,
সাধনে প্রবেশ আমি ধীরে ধীরে,
সেখানে আনি, গোলোক স্বামী,
রত্নাসনে নামি আসেন আপনি॥

নারদ। কে—মা ভক্তি এসেছ?

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া তিনটী তনয়া,
তোমারই জননী ভকতি গো।

নারদ। আবার কোমল কণ্ঠধ্বনি।
কে আসিছে পুনঃ?

(অন্যদিক হইতে প্রীতি শ্রদ্ধা ও দয়ার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া, তিনটী তনয়া
তোমারই জননী ভকতি গো।
মা গো তব সনে, মিলি তিন বোনে,
ভক্ত হৃদে করি বসতি গো॥
তিনে এক একে তিন, বাঁধা আছি চিরদিন,
যার টানে যেয়ে আনে, ফুটে উঠে সাধু প্রাণে,
বিমল যোগ জ্যোতিঃ গো॥

নারদ। ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা, দয়া।
বড়ই হইনু প্রীত
হেরি তোমাদের
মূর্ত্তিমতী আজি মধুবনে!

ভক্তি। প্রভো! কৃপাকণে

ভগবান পাদপদ্মে বাস করি মোরা,
ভক্ত আকর্ষণে স্থূলরূপে আমাদের প্রকট প্রকাশ।
ধ্রুব আরাধনে
কম্পিত গোলোকে বিষ্ণু সিংহাসন,
লক্ষ্মী নারায়ণ চরণ যুগল
হোয়েছে চঞ্চল,
কাতরা কমলা, কাতর শ্রীহরি,
বাধা ছিনু মোরা শ্রীহরিচরণে,
ধ্রুবের কঠোর তপঃ আকর্ষণে
সে বন্ধন হইল শিথিল,
সেই আকর্ষণে প্রভো!
আইনু আমরা আজি মধুবনে।

নারদ। ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া
যেই স্থানে করে আগমন,
ত্বরায় আসেন তথা শ্রীমধুসূদন।
আহা! আজি মম কিবা আনন্দের দিন,
ধ্রুব তপোবলে গোলোক আভাস,
মধুবনে ক্ষণে ক্ষণে হইছে প্রকাশ।
ধন্য আমি হেন শিষ্যে মন্ত্রদান করি!
ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া!
চারিজনে ধ্রুবহৃদে হও বদ্ধমূল।
(স্বগতঃ) যাইব এখন ধ্রুবের পিতার কাছে,
সুনীতির বনবাস করিব মোচন
বলিয়া উত্তানপাদে। (প্রস্থান)

ভক্তি আদি। নবীন নীরদ ঐ এল বোলে এল এল।
হেসে হেসে আসে আগে কমলা বিজলী আলো॥
কাঁদে ধ্রুব কাঁদে মেঘ,
বেগে ধারা বহিবে গো,
গলেছে নীরদ হৃদি, আর ত থাকে না জল॥

(ভক্তি আদির প্রস্থান)

ধ্রুব। হৃদয়ের ধন, সে নীল রতন
পদ্মপলাশলোচন কোথা লুকাইল ?
এই যে এখনই
হৃদি মাঝে ছিল বিরাজিত ,
ক্ষণে দেখা দেয়—
আবার লুকায় কেন ?
কোথা হরি পদ্মপলাশলোচন
দাও দেখা ;
তব অদর্শন আর পারিনা সহিতে।

ধ্রুব। সে প্রাণধনে, অতি যতনে, হৃদে রাখিতে চাই।
তবু ক্ষণে ক্ষণে, কেন সে রতনে, হারাই হারাই ॥
এই দেখি কাছে, এই কোথা গেছে,
পুনঃ আসিয়াছে, পুনঃ দেখি নাই,
মেঘে লুকোচুরি, চপলা চাতুরী,
কোরনাক হরি অধীনের ঠাঁই ॥
গভীর আঁধারে, ফেলো না আমারে,
মরম ভিতরে বড় ব্যথা পাই,
(বুঝি) মনের মতন, পাওনা যতন,
তাই কর তুমি পালাই পালাই ॥

লক্ষ্মী। (নেপথ্যে) লও বৎস !
লও লও ঐশ্বর্য্য আমার ;
রাজ্যের আশায় তপস্যা তোমার,
সেই আশা আমি করিব পূরণ।
হের, শূন্যে দোলে ঐ স্বর্ণসিংহাসন
আনিয়াছি তব তরে।
ধর বৎস ! ধর সিংহাসন
ক্ষান্ত হও তপস্যায় ,
রাজা হয়ে সুখে কর রাজ্যভোগ।

ধ্রুব। একি ! একি !
সহসা শিহরি উঠে কেন প্রাণ ?

কাঞ্চনের জ্যোতিঃ
কে আনিল হৃদাকাশে?
ঐ দুলিতেছে শূন্যে স্বর্ণসিংহাসন,
কাঞ্চন রতন, অতুল বৈভব
রহিয়াছে রাশীকৃত।

বৈরাগ্য। (নেপথ্যে) ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা রাজসিংহাসন।

বিবেক। (নেপথ্যে) পাবে না পাবে না হরি দরশন।

ধ্রুব। কি! পাব না পাব না তবে হরি দরশন?
ছার সিংহাসন,
ছার রাজ্যধন নাহি প্রয়োজন,
নিরখি যখন সুন্দর সে রূপরাশি
অন্তরে তখন হয় যে সুখ উদয়,
সে সুখের সনে,
রাজসিংহাসনে হয় না তুলনা।
কে গো তুমি, আনি প্রলোভন
ভুলাও আমায়?
ভুলায়োনা, ভুলায়োনা,
প্রলোভনে ভুলি
ভুলিব না সেই পদ্মপলাশলোচনে।
কোথা হরি পদ্মপলাশলোচন
দাও দেখা,
এই প্রাণে ছিলে,
কোথা লুকাইলে পুনঃ?
উঃ! বুক ভেঙ্গে গেল,
হারাইনু হারাইনু হরি।
শুনিয়াছি পঞ্চতপ করিলে সাধন
হরি দরশন মিলে,
পঞ্চতপ তবে আজি করিব সাধন—
শিরে সূর্য্য রাখি,
জ্বালি অগ্নি চারিভিতে

কেন্দ্রস্থলে করিব আসন :
ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে
ডাকিব ডাকিব বলি, জয় জয় নারায়ণ
দেখি টলে কি না টলে সেই রাজীব চরণ
দেখি পাই কি না পাই পদ্মপলাশলোচন,
দেহের পতন কিম্বা তপস্যা সাধন।
জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ জ্বলন্ত অনল।
প্রসার প্রসার তব জিহ্বা লোল॥
ওহে জ্যোতির্ম্ময় মধ্যাহ্ন তপন,
ঢাল ঢাল শিরে প্রখর কিরণ,
পঞ্চতেজ আজি হোক সম্মিলন,
দীন হীন ধ্রুবে দাও দাও কোল॥

(অগ্নি মধ্যে ঝম্প প্রদান)

(প্রীতি শ্রদ্ধা ও দয়ার সহিত বেগে ভক্তির প্রবেশ)

ভক্তি। অপূর্ব্ব বালক। অপূর্ব্ব তপস্যা!
হেন ভক্ত দেখি নাই কভু!
অনায়াসে অগ্নিমাঝে করিল প্রবেশ।
প্রীতি। শ্রদ্ধা! দয়া।
এস সবে মিলি
নিজ নিজ শক্তিস্রোত সমষ্টি করিয়া
একাধারে ধ্রুবহৃদে ঢালি অবিরাম।
অচিরে ধ্রুবের
যাহে হয় নারায়ণ দরশন লাভ।
কোথা হরি দয়াময়!
রক্ষা কর ভক্তে তব।
আমাদের শক্তিস্রোত ঢালিয়া নিয়ত
হইয়াছি ক্ষীণ মোরা
থাকিতে পারিনা আর।
এস ত্বরা করি—
নতুবা ভকতবৎসল নামে কলঙ্ক হইবে।

(ধ্রুবকে কোলে করিয়া অগ্নিমধ্য হইতে লক্ষ্মীর উত্থান)

লক্ষ্মী। ধন্য শিশু! ধন্য ভক্তি এর।
ধন্য এর গুরুদেব!
ধন্য এর কঠোর সাধন।
হেরিয়া শিশুর এই কঠিন সাধনা,
প্রাণ বড় হইল ব্যাকুল।
কোথা প্রভু। ভক্তে ত্বরা দাও দরশন।
দেখ আসি—তব তরে
কত কষ্ট সহিছে বালক।
আমি নারী,
কতক্ষণ আর দেখিবারে পারি
শিশুর এ তপস্যা কঠিন।
কোথা প্রাণেশ্বর, শ্রীমধুসূদন!
পাষাণ হয়ে কি তুমি রহিলে গোলোকে?
বারেক আসিয়া প্রভো! দেখ না বালকে।

ভক্তি। মাগো! জগতের ভক্তি
যেখানে যা ছিল,
সমষ্টি করিয়া
একাধারে ধ্রুবহৃদে কোরেছি স্থাপন।
করিছে বালক কঠোর সাধনা;
দয়াময় হরি, এখনও তবু
নাহি দিল দরশন।

লক্ষ্মী। তাই তো—এখনও তো
প্রাণনাথ না দিলেন দেখা!
ভক্তি। অচিন্ত্য মনের গতি তাঁর
কে পারে বুঝিতে!

ভক্তি। প্রীতি। শ্রদ্ধা। দয়া।
হের—হের,
অকস্মাৎ ঐ লতিকার শির
নত হয়ে কেন চুমিছে ধরণী?

কেন তরুশাখাগুলি

নত হয়ে করিছে প্রণাম?

নিবিড় নীরদমালা

কেন শূন্যে হয় আলোড়িত?

অন্তরীক্ষে জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী

কেন ক্রমে হইছে নিষ্প্রভ?

নীলাম্বরে নীলবর্ণ জ্যোতির সাগর

তরঙ্গে তরঙ্গে হইতেছে প্রবাহিত।

এতদিনে হরি

পুরাইল বুঝি ধ্রুবের বাসনা।

ভক্তি আদি। ঐ শুন শূন্যে বাজিছে নূপুর।

এল এল এল হরি, আর নাহিক অধিক দূর॥

নেমেছে কাঞ্চন ভাতি,

নামিছে নীলিম জ্যোতিঃ,

আলোকে নূপুর বাজে, আহা কি সুন্দর উজলে মধুর॥

(নারায়ণের আবির্ভাব ও ভক্তি আদির প্রস্থান।) (ক্রমশঃ)

প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

(স্বামী বিমলানন্দ।)

মানুষ কোন কার্য্যে যখন বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা আসক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ, যদি সেই কার্য্যটী তাহার ভাল বলিয়া ধারণা থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা এক প্রকার অসম্ভব। এইরূপ ব্যক্তিকে সহসা যদি কেহ (তাহার যথার্থ কল্যাণ ইচ্ছাতেও) বলে যে, সে যাহা করিতেছে, তাহা অন্যায়, তাহা হইলে উপদেষ্টার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সে ব্যক্তি দৃঢ়তর আসক্তি প্রকাশ করিয়া সেই নিষিদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হয়।

ব্যক্তিগত এই স্বভাব জাতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নিমিত্ত সমাজ বা ধর্ম্মসংস্কারকগণ এত চেষ্টা করিয়াও দেশবিশেষে বদ্ধমূল কোন

সামাজিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করিতে কৃতকার্য্য হন না। যতদিন না অধিকাংশ লোকের মধ্যে প্রচলিত কোন রীতিবিশেষের প্রতি দ্বেষ ভাব আইসে, ততদিন তাহার মূলোৎপাটনকারী কোন বিপ্লব ঘটিতে পারে না। এবং এইরূপ বিপ্লব না ঘটিলে দীর্ঘকালের জাতীয় কোন রীতির পরিবর্ত্তনও হয় না।

সমাজ বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতি নীতি বিশেষের প্রতি সাধারণের ঘৃণা তখনই আইসে, যখন উহা মানবহৃদয়ের পবিত্র ভাব সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া মনুষ্যকে উৎপীড়ন বা অধঃপাতিত করিবার উপায় হইয়া দাঁড়ায়। যে সকল রীতি নীতি সাময়িক অবস্থা বিশেষের উপযোগী করিয়া গঠিত, সে গুলি সেই অবস্থাবিশেষের পরিবর্ত্তন বা বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে। কতকগুলি রীতি নীতি ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তি দ্বারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কেবল ক্ষমতার প্রভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। এরূপ রীতি নীতি স্বভাবতঃই অনিষ্টকর এবং মনুষ্যের নির্ম্মল ধর্ম্মভাববিরুদ্ধ। সেই নিমিত্ত এরূপ রীতি নীতি অতি অল্পসংখ্যক স্বার্থপর ব্যক্তি ব্যতীত সকলের নিকট ঘৃণিত এবং শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। কিন্তু কতকগুলি রীতি নীতি কোন দেশ বা কালবিশেষে প্রবর্ত্তিত হইলেও তাহা মানবান্তঃকরণের কতকগুলি চিরন্তন আধ্যাত্মিক ভাবের উপর স্থাপিত। এই সকল রীতি নীতি সময়ে অজ্ঞানবশতঃ বিকার প্রাপ্ত হইলেও কোন কালে মনুষ্যের শুদ্ধ ধর্ম্মভাবের সহিত একান্ত বিরোধী হয় না, কখনও এরূপ হয় না যে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে সেই সকল রীতি নীতি পালন করিয়া উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে না পারে।

আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজা এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই এবং ইতিহাসেও জানিতে পারি যে, অনেক ব্যক্তি মূর্ত্তিপূজা করিয়াও অতি উচ্চ আদর্শে জীবন গঠিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। যদি ধর্ম্মের সহিত মূর্ত্তিপূজা একেবারে বিরোধী হইত, তাহা হইলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না।

মূর্ত্তিপূজা অনেক স্থলে যে অধর্ম্ম আচরণের উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। কিন্তু এরূপ স্থলে আমরা মূর্ত্তিপূজার উপর দোষারোপ না করিয়া পূজকের দোষ বলিব। বলিব যে, পূজক যথার্থ

ধর্ম্মজীবন লাভে কৃতসঙ্কল্প নয়, এইজন্য তাহার নিকট মূর্ত্তিপূজা ঐরূপ বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে। যাহার যথার্থ ধর্ম্মলাভ উদ্দেশ্য, সে মূর্ত্তি পূজার পবিত্রভাব রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে। আর যাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, সে ধর্ম্মের অতি উচ্চ উচ্চ কথা বলিয়া (অনেক সময় বাহ্য দৃষ্টিতে মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও) ধর্ম্ম-জীবনে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হইতে পারে না। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অনুষ্ঠানের উপর ধর্ম্ম জীবন নির্ভর করে না, উদ্দেশ্য ধর্ম্ম লাভ হইলেই ধর্ম্ম-লাভ হয়। এ কথার উত্তরে আমরা বলিব, উদ্দেশ্য ধর্ম্ম-জীবন লাভের একটী প্রধান কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নয়। উদ্দেশ্য এবং তদনুকূল উপায—এই দুইয়ের মিলনে কার্য্য সিদ্ধ হয়। এ কথা যে কেবল ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সত্য, এমন নয়; মনুষ্য যে কোন বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করুক না কেন, যদি সেই বস্তু লাভের জন্য কোন অনুকূল উপায়ের অনুসরণ না করে, তাহা হইলে তাহা লাভ করিতে পারে না। পণ্ডিত হওয়া যাহার উদ্দেশ্য, তাহাকে পড়িতে হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বল বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে ব্যায়ামাদি করিতে হয়। কিন্তু পাণ্ডিত্যলাভেচ্ছু ব্যক্তি ব্যায়াম দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না; আবার স্বাস্থ্য যাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, পড়া শুনা করিয়া সে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে না। এই নিমিত্তই বলিয়াছি, কেবল উদ্দেশ্য থাকিলে কায হইবে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল উপায়ের অনুসরণ আবশ্যক। ধর্ম্মসম্বন্ধে বলি, ধর্ম্ম-লাভ করিবার কেবল মাত্র ইচ্ছা থাকিলেই হইবে না, সাধন চাই। উদ্দেশ্যরহিত সাধন অতি সহজেই বিকৃত ভাব ধারণ করে। কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলে আজ না হয় দুদিন পরে ঠিক সাধন খুঁজিয়া লয়।

সকল বস্তুতে এক অদ্বিতীয় অনন্ত আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের উপায় স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই সকল সাধন পরস্পর হইতে বিভিন্ন মনে হইলেও, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই সকল গুলিই এক সত্য অবলম্বনে গঠিত। সর্ব্বভূতে ভগবান দেখিতে হইলে প্রথমে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি (যথা গুরু) বস্তু (যথা সূর্য্য) বা স্থানে (যথা হৃদয়) ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ ভাবনা দ্বারা সেই ঈশ্বর বুদ্ধি দৃঢ় করিতে হয়। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা এই ঈশ্বর বুদ্ধি এত দৃঢ় করিতে হয় যে, অবশেষে সেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, বা স্থানের

প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন হইবে। এইরূপ দৃঢ় ঈশ্বর বুদ্ধি হইতে—সেই নির্দ্দিষ্ট বস্ত্ব্যাদিতে যথার্থ ঈশ্বর উপলব্ধি হয়। কোন এক স্থানে ঈশ্বর উপলব্ধি হইলেই জানিতে হইবে যে, তখন ঈশ্বর দর্শনের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে। তখন যে দিকে দেখিবে, সেই দিকে একমাত্র তাঁহাকেই দেখিবে। বাস্তবিক তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমাদের চক্ষু নাই বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। যে দিন এক স্থানে তাঁহাকে দেখিব, সেই দিন সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দেখিব।

এই বস্তুবিশেষে ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপনা করিবার ব্যবস্থা বেদান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম প্রতীক উপাসনা। প্রতিমা উপাসনা এক প্রকার প্রতীকোপাসনা বিশেষ। এই প্রকৃত তাৎপর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রতিমা উপাসনা করিলে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা কোথায় বুঝিতে পারি না।

তর্কের অনুরোধে যদিও স্বীকার করি যে, প্রতিমা উপাসনা উপরোক্ত উচ্চ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই, তথাপি আমরা এ কথা [illegible] করিতে পারি না যে, প্রতিমা উপাসনা এখনও আমাদের দেশের [illegible] সহস্র লোকের প্রাণের জিনিষ। এখন সহস্র যুক্তি দেখাইলেও এই সকল লোক মূর্ত্তিপূজা হইতে ক্ষান্ত হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যতদিন না কোন ধর্ম্ম-রীতির উপর সাধারণের ঘৃণা ও বিদ্বেষ আইসে, ততদিন তাহাকে বিলোপ করিতে কেহই সক্ষম হয় না। সাধারণ লোক যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে না; হৃদয়ের ভাবই (Feeling) তাহাদিগকে চালাইয়া লয়। সেই নিমিত্ত বলি, তর্কের মুখে যদিও স্বীকার করি, মূর্ত্তিপূজা যুক্তিবিরুদ্ধ, তথাপি আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের মূর্ত্তিপূজার প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় আস্থা আছে, তাহাতে মনেও করিতে পারি না যে, মূর্ত্তিপূজা উঠাইয়া দিবার সময় এখনও আসিয়াছে। যখন আরও দেখি যে, এই মূর্ত্তিপূজা এরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, যাহাতে পূজকের ধর্ম্মভাব উত্তরোত্তর হ্রাস না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তখন আমাদের মনে হয় যে, আধুনিক ধর্ম্মপ্রচারক-গণ প্রতিমাদির বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি দিয়া যে শক্তিব্যয় করিতেছেন, সে শক্তি যদি প্রতিমাপূজা কিরূপে সাধিত হইলে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে, জনসাধারণকে ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধন করেন।

ঈশ্বরবুদ্ধি একস্থানে দৃঢ় করিবার পক্ষে প্রতিমার উপকারিতা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টিতে প্রতিমাকে দেখিলে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করার যে আপত্তি, তাহা অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ প্রতীকোপাসকগণ ঈশ্বরকে কস্মিন্ কালে সসীম বলেন না, বরঞ্চ তাঁহার অসীম রূপ সন্দর্শন করিবার নিমিত্তই এই উপাসনা অবলম্বন করেন।

মনুষ্য যতদিন নিজ সসীম মন লইয়া ঈশ্বরকে বুঝিতে যাইবে, ততদিন তাঁহাকে সসীমই দেখিবে। মানুষের ঈশ্বর এক প্রকারের মানুষ ব্যতীত আর কিছু হইতেই পারে না। তবে কাহারও ঈশ্বর অপরের ঈশ্বরের তুলনায় অনেক উচ্চ মানুষ হইতে পারে। আমরা কেহ ত তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা করি নাই ; সকলেই নিজের নিজের মনগড়া ভাব লইয়া বসিয়া আছি। যাহার মনের গড়ন যে প্রকার, তাহার ঈশ্বরও সেইরূপ।

এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে ঈশ্বর বাস্তবিক নাই, তিনি কেবল মনুষ্য-কল্পনা-প্রসূত একটী ভাব মাত্র। ঈশ্বর লাভ কথাটী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক শব্দ[illegible] আমরা বলি, এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। দশ জন লোকের ধন না[illegible] যদি তর্ক কর, (জগতে) ধন নাই, তাহা যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে, আমাদের ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান নাই বলিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, এ কথা মনে করাও ঠিক সেইরূপ। শাস্ত্র বলিতেছেন, যদি সেই অসীম ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, তাহা হইলে তোমার মনকে নির্ম্মল করিতে হইবে। মন যখন একেবারে নির্ম্মল হইয়া যাইবে, তখন ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিবে। সেই নিমিত্ত যে কোন কার্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহাকেই ঈশ্বর লাভের সাধন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রতিমাপূজা দ্বারা এই চিত্তশুদ্ধি কিরূপে সাধিত হইতে পারে, এক্ষণে আমরা সেই বিষয় আলোচনা করিব।

চিত্তশুদ্ধি করিতে হইলে তপস্যা করিতে হয়—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। শরীরকে প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসাইয়া না দিয়া সংযম এবং শৌচ অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বা পরহিতার্থে নিযুক্ত করিলে শারীরিক তপস্যা হয়। পরনিন্দা পরচর্চ্চা কঠোর বাক্য প্রয়োগ মিথ্যা কথা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রপাঠ ঈশ্বরীয় কথোপকথন ও ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তনের নাম বাচিক তপস্যা। মানসিক তপস্যা বলিলে বুঝিতে হইবে, কুচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ চিন্তাদি লইয়া থাকা। প্রতিমাপূজক প্রাতঃকালে

উঠিয়া স্নাত হইয়া, পুষ্প চয়ন, দেবগৃহ মার্জ্জন এবং ভোগাদি সংগ্রহদ্বারা তপস্যা করে। এই কাযগুলির সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার উদ্দেশ্যে এই গুলি সাধিত হইতেছে, তাঁহাকে স্মরণ করা সহজেই হওয়া উচিত। ইহাতে মানসিক তপস্যাও কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হইতে পারে। পূজার সময় পুষ্প সুগন্ধ খাদ্যদ্রব্যাদি নিবেদন করিয়া ভগবান তৃপ্ত হইয়াছেন, এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্তরাত্মাকে কত তৃপ্ত করিতে পারা যায়। এই আন্তরিক তৃপ্তি আসিলে মন কত পবিত্র হইয়া যায়। মন অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আর বাহিরের বস্তুর দিকে সুখ পাইবার আশে ধাবিত হয় না। পূজার পর প্রসাদ লইয়া পাঁচ জন দীন দুঃখীকে খাওয়াইয়া আরও কত তৃপ্ত হওয়া যায়, আরও কত শারীরিক তপস্যা সঞ্চয় করিতে পারা যায়। পূজান্তে জপ এবং স্তোত্র পাঠাদি দ্বারা বাচিক তপস্যা হয়। ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিমার সম্মুখে আসিলে ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন সহজেই হওয়া সম্ভব। পূজা দ্বারা সেই ভাব আরও দৃঢ় হওয়ায় মানসিক তপস্যা হইয়া থাকে।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, যে সকল ব্যক্তি কেবল প্রতিমাদিতে ঈশ্বরকে অবস্থিত মনে করিয়া পূজা করে, তাহারাও ঈশ্বরকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক বড় মনে করে। যদি তাহা না মনে করিত, তাহা হইলে তাহারা পূজা করিত না। পূজা করা অর্থ—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করা। মন পুনঃ পুনঃ যে বিষয় চিন্তা করে, ক্রমশঃ সেই আকার প্রাপ্ত হয়। কোন মহৎ জিনিষের চিন্তা করিতে করিতে মনও উন্নত হয়; তখন তাহাপেক্ষা মহত্তর দ্রব্যের ভাব সহজে তাহার বোধগম্য হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বে যে তপস্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা, সে সেইরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিলেই ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে।

একথা বলিবার তাৎপর্য্য যেন কেহ না বুঝেন যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ভাব লইয়া রহিয়াছে, সে চিরদিন সেই ভাব লইয়াই থাকিবে। যে যত উচ্চভাব ধারণা করিতে সমর্থ, তাহাকে তত উচ্চভাব প্রদান করা ধর্ম্মাচার্য্যগণের কর্ত্তব্য। উন্নতিই ত ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য। যদি সম্ভব হয়, অদ্যই ধর্ম্মসংস্কারকগণ সমস্ত লোককে মূর্ত্তিপূজাদি হইতে উঠাইয়া একেবারে সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবাইয়া দিন। ইহা যদি সম্ভব

হইত, তাহা হইলে সংসারে আর আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু এ মায়ার সংসারে এরূপ কখনও হইতে পারে বলিয়া স্বপ্নেও মনে হয় না। অতি অল্পসংখ্যক বিশেষ উন্নত লোক ব্যতীত সকলেই ধর্ম্মের সহিত কোন না কোন বাহ্য অনুষ্ঠানাদির সম্পর্ক রাখিয়া দিবে। এই সকল লোকের নিকট বাহ্য-প্রকাশ-শূন্য ধর্ম্মের কথা বলিলে, হয় তোমাকে নাস্তিক পাষণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিবে, নচেৎ তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বাহ্য অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করিয়া দুদিনের মধ্যে সমস্ত ধর্ম্মভাব লোপ করিয়া বসিবে। বাহ্যাড়ম্বরের আধিক্য হইতে ধর্ম্ম সহজেই বিকৃত হইয়া উঠে, জানি; কিন্তু এ দিকে আবার দেখিতে পাই, একেবারে বাহ্যচিহ্নশূন্য ধর্ম্ম শীঘ্র লোপ পাইয়া যায়। অনেক সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে এত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যে অদ্যাপি জীবিত আছে, তাহার একটী প্রধান কারণ, হিন্দুদিগের বাহ্যধর্ম্মানুষ্ঠানে নিষ্ঠা। দেখিতে পাওয়া যায়, যে জাতির মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত আছে, সেই জাতির মধ্যেই পবিত্র-চরিত্র ধর্ম্মবীরগণ জন্মগ্রহণ করেন।

যেখানে মূর্ত্তিপূজার বেশে অধর্ম্ম রাজত্ব করিতেছে, সেখানে যথার্থ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া অধর্ম্মের স্রোত বন্ধ করিতে চেষ্টা কর। যদি শিক্ষাতে কিছু না হয়, তাহা হইলে (যদি পার) সেখানে মূর্ত্তিপূজা উঠাইয়া দাও। কিন্তু তা বলিয়া ভুলিও না যে, এখনও আমাদের দেশের হাজার হাজার লোক যথার্থ ধর্ম্মলাভের জন্য মূর্ত্তিপূজা করিয়া থাকে। কেবলমাত্র মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে বলিয়া তাহাদের অপকার ব্যতীত উপকার করিতে পারিবে না। কিরূপ ভাবে মূর্ত্তিপূজা করিলে তাহাদের মঙ্গল হইবে, তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। শিক্ষা দাও, ইন্দ্রিয় সংযম না করিলে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র না হইলে, ভগবান পূজা গ্রহণ করেন না। শিক্ষা দাও, ভগবানের প্রীতিসাধন করিতে হইলে তাঁহার পূজা করিবার পরে তাঁহার দীন দুঃখী সন্তানদিগকে সেবা করিতে হয়, নচেৎ পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আর সকলকে ক্রমশঃ বুঝাইতে চেষ্টা কর যে, এই মূর্ত্তির মধ্য দিয়া সেই অমূর্ত্ত অদ্বিতীয় অনন্ত ব্রহ্মে যাইতে হইবে।

স্থানে, কিরূপে বৃদ্ধি হইল ?

বার্ত্তিকামূলম্।—তদ্ধিতকাম্যোশ্চক্ প্রকরণাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তদ্ধিত প্রত্যয় এবং কম ধাতুর যে বৃদ্ধি, 'ইক্' প্রকরণেতেই প্রাপ্তি হয়। *

ভাষ্যমূলম্।—ইগ্‌লক্ষণয়োর্গুণবৃদ্ধ্যোঃ প্রতিষেধঃ। ন চৈতে ইক্‌লক্ষণে।

ভাষ্যানুবাদ।—ইক্ লক্ষণ সম্পন্ন যে গুণ এবং বৃদ্ধি, ('ক্ঙিতিচ' সূত্রে) তাহারই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ইক্ লক্ষণ সম্পন্ন নহে।

বার্ত্তিকমূলম্।—লকারস্ত ঙিত্ত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাবপ্রসঙ্গঃ।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—লকার সমূহের 'ঙ'ইৎপ্রযুক্ত আদেশেও তাহার স্থানিবদ্ভাবের প্রসঙ্গ হইবে ? *

ভাষ্যমূলম্।—লকারস্ত ঙিত্ত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাবঃ প্রাপ্নোতি। অচিনবম্। অসুনবম্। অকরবম্।

ভাষ্যানুবাদ।—'লঙ্' 'লুঙ্' 'লিঙ্' প্রভৃতি 'ল'কারসমূহের 'ঙ'ইৎ প্রযুক্ত, তাহাদের স্থানে যাহা আদেশ হইবে, তাহাদেরও স্থানিবদ্ভাব প্রাপ্তি হইবে।

যেমন ;—অচিনবম্ ('চিঞ্'ধাতু 'শ্নু'বিকরণ বিশিষ্ট), অসুনবম্ ('ষুঞ্'ধাতু), অকরবম্ ('ডুকৃঞ্'করণে ধাতু) ইত্যাদি স্থলে, 'ঙ' ইৎবিশিষ্ট 'লঙ্' 'ল'কার করিলে, তাহার স্থানিবদ্ভাব মানিয়া গুণ নিষেধ হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—লকারস্ত ঙিত্ত্বাদাদেশেষু স্থানিবদ্ভাব প্রসঙ্গ ইতিচেদ্ যাসুটো ঙিদ্বচনাৎগিদম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—লঙাদি 'ল'কার 'ঙ'ইৎবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, যদি বল যে, আদেশ সমূহেও তাহার স্থানিবদ্ভাবের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে ; তবে 'যাসুট্' প্রত্যয়ে 'ঙ'ইৎকার্য্য করাতেই তাহা (গুণ বৃদ্ধি) সিদ্ধ হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—যদয়ং যাসুটোঙিদ্বচনং শাস্তি তজ্জ্ঞাপয়ত্যাচার্য্যো ন ঙিদাদেশা ঙিতোভবন্তীতি॥ যদ্যেতজ্জ্ঞাপ্যতে কথং নিত্যং ঙিতঃ ইতশ্চেতি। ঙিতো যৎকার্য্যং তদ্ভবতি ঙিতি যৎকার্য্যং তন্নভবতীতি।

কিং বক্তব্যমেতৎ॥ ন হি॥ কথমনুচ্যমানং গংস্যতে। যাসুট এব ঙিদ্বচনাৎ। অপর্যাপ্তশ্চৈবহিযাসুট্ সমুদায়স্ত ঙিত্বে ঙিতং চৈনং করোতি। তত্রৈতৎ প্রয়োজনং ঙিতোযৎকার্য্যং তদ্‌যথাস্যাদ্ ঙিতি যৎ কার্য্যং তন্মাভূদিতি। ক্ঙিতি চ॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেহেতু, 'যাসুট্ পরস্মৈপদেষূদাত্তো ঙিচ্চ' ।৩।৪।১০২। ('লিঙ্' ইহাতে পরস্মৈপদের বিভক্তি সমূহ পরে থাকিলে, 'যাসুট্' আগম হয়; আর তাহা উদাত্তস্বর বিশিষ্ট হয় এবং 'ঙ'ইৎ হয়) এই সূত্রে, (পাণি আচার্য্য) 'য়াসুট্' আগম এবং তাহার 'ঙ'ইৎপ্রযুক্ত কার্য্য উপদেশ করিয়াছেন তাহাতেই আচার্য্য জানাইতেছেন যে, 'লঙ্' 'লিঙ্' প্রভৃতি 'ঙ'ইৎ বিশিষ্ট লকারের স্থানে যাহা আদেশ হয়, তাহাতে "ঙ'ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য হয় না।

যদি এইরূপই জ্ঞাপন করে, তবে 'নিত্যং ঙিতঃ ।৩।৪।৯৯। (১) 'ইতশ্চ' ৩।৪।১০০। (২) প্রভৃতি সূত্রে, 'ঙ'ইৎপ্রযুক্ত যে কার্য্য হওয়া উচিত, তাহা কিরূপে হইয়া থাকে?

এই স্থলে এই নিয়ম করা হইবে যে,—'ঙ'ইৎ হইলে, তাহার স্থানে যে কার্য্য, তাহা ('লঙ্'প্রভৃতিতেও) হইয়া থাকে। কিন্তু 'ঙ'ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয়াদি পরে থাকিলে, যে কার্য্য (গুণ নিষেধাদি), তাহা হইবে না।

এইরূপ কি বলা কর্ত্তব্য?

নহে।

না বলিলে, কিরূপে অবগত হইবে?

'যাসুট্ আগমে, 'ঙ'ইৎ কার্য্য দ্বারাই অবগতি হইবে। কারণ, 'লিঙ'এর স্থানে যে 'যাসুট্' আগম হইয়াছে, তাহা সমুদায় স্থানেই 'ঙ'ইৎএর স্থানিবদ্ভাব করিয়া পর্য্যাপ্তরূপে (সম্পূর্ণরূপে) কার্য্যসিদ্ধি হইবে না বলিয়াই, ঙিত্বসত্ত্বেও পুনারয় 'যাসুট্'প্রত্যয়, ঙিৎ করিয়াছেন। তাহার (এইরূপ করিবার) প্রয়োজন এই যে,—'ঙ'ইৎ প্রযুক্ত যে কার্য্য, তাহা যাহাতে হইতে পারে। কিন্তু 'ঙ'ইৎ পরে থাকিলে যে কার্য্য, তাহা যাহাতে না হয়।

'ক্ঙিতি চ' সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইল॥

---

(১) সকার আছে অন্তে যার, এমন যে ঙ ইৎবিশিষ্ট উত্তম পুরুষ, তাহার নিত্যই লোপ হয়।

(২) ঙইৎ হইয়াছে এমন যে 'ল'কার, সেই লকারের স্থানে পরস্মৈপদস্থি ইকারান্ত, তাহার লোপ হয়।

দীধীবেবীটাম্ । ৬।

দীধী। বেবী। ইটাম্। ৬।

'দীধী'ধাতু, 'বেবী'ধাতু এবং ইট্'এর 'গুণ এবং বৃদ্ধি হয় না।

ভাষ্যমূলম্।—কিমর্থমিদমুচ্যতে॥ গুণবৃদ্ধী মা ভূতামিতি। আদীধ্যনম্ আদীধ্যকঃ। আবেব্যনম্। আবেব্যকঃ। অয়ংযোগঃ শক্যোঽকর্ত্তুম্॥ কথম্।

বার্ত্তিকমূলম্।—দীধীবেব্যোশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদ্ দৃষ্টানুবিধিত্বাচ্চ ছন্দসোঽদীধেদ-দীধয়ুরিতি গুণদর্শনাদপ্রতিষেধঃ। *।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা কেন বলা হইল?

গুণ বা বৃদ্ধি না হয়, এইজন্য বলা হইল। যেমন,—আদীধ্যনম্ ('আ'—'দীধীঙ্' দীপ্তিদেবনয়োঃ ধাতু+'ল্যুট্' প্রত্যয় এই স্থলে গুণ প্রাপ্তি ছিল), আদীধ্যকঃ (আ—দীধীঙ্+ণ্বুল্ প্রত্যয়, এই স্থলে বৃদ্ধি প্রাপ্তি ছিল), আবেব্যনম্ (আ—বেবীঙ্ বেতিনাতুল্যে+ল্যুট্, গুণ প্রাপ্তি ছিল), আবেব্যকঃ (আ—বেবীঙ্×ণ্বুল্, বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ছিল) এই সকল স্থলে, গুণ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্তি ছিল, এই সূত্রানুসারে নিষেধ হইল।

এই সূত্র না করিলেও চলে।

কিরূপে?

বার্ত্তিকানুবাদ।—দীধীঙ্ এবং বেবীঙ্ ধাতু, ছন্দ (বেদ) বিষয়ক, ছন্দে যেরূপ বিধান দেখা যায়, পশ্চাদ্বর্ত্তী গ্রন্থাদিতেও ছন্দেরই অনুকরণ হয় বলিয়া এবং ছন্দেও 'অদীধেৎ' 'অদীধয়ুঃ' প্রভৃতিস্থলে, গুণ দেখা যায় বলিয়া (গুণ বৃদ্ধির) প্রতিষেধ অনাবশ্যক। *।

ভাষ্যানুবাদ।—দীধীবেব্যো ছন্দসো বিষয়ৌ দৃষ্টানুবিধিশ্চ ছন্দসি ভবতি। দাধীবেব্যোশ্ছন্দোবিষয়ত্বাদৃষ্টানুবিধিত্বাচ্চ ছন্দসঃ। অদীধেদদীধয়ুরিত্যত্র চ গুণস্ত দর্শনাদপ্রতিষেধঃ।

অনর্থকঃ প্রতিষেধঃ। অপ্রতিষেধঃ॥

প্রজাপতির্বৈ যৎকিঞ্চন মনসা অদীধেৎ॥ হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ॥ অদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—দীধী এবং বেবী ধাতু বেদের বিষয়। যেরূপ বেদে দেখা যায়, সেইরূপই পরবর্ত্তী গ্রন্থে অনুবিধান হইয়া থাকে। দীধী বেবী ধাতুর বেদ

বিষয়স্থপ্রযুক্ত, পশ্চাদনুকরণকারী প্রয়োগকর্ত্তাগণও বেদের প্রয়োগ দেখিয়াই প্রয়োগ করিবেন। ('আদীধ্যনম্' প্রয়োগও বেদের অনুকরণ করিয়াই সিদ্ধ হইবে)।

(আর বেদের প্রয়োগ সিদ্ধির জন্যও এই সূত্রের প্রয়োজন নাই; কারণ, বেদে, তাহার অন্যথা অর্থাৎ গুণও দেখা যায়। যেমন;—) অদীধেৎ ('লঙ্' এর 'তিপ্'), অদীধয়ুঃ ('লিঙ্'এর 'ঝি'র স্থানে জুস্) এই সকল স্থলে, গুণ দেখা যায় বলিয়া, অপ্রতিষেধ অর্থাৎ গুণ বৃদ্ধির নিষেধ করা নিষ্প্রয়োজন।

('অপ্রতিষেধ' শব্দের অর্থ, এইরূপ নহে যে, কোথাও প্রতিষেধ হয় না; তবে) এইরূপ প্রতিষেধ বিধায়ক সূত্র অনর্থক; এই অর্থে 'অপ্রতিষেধ' শব্দ বলা হইয়াছে। (বেদে, 'গুণ'এর স্থল দেখান হইতেছে),—

"প্রজাপতির্বৈ যৎকিংচন মনসা অদীধেৎ। হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ। অদীধয়ুর্দাশরাজ্ঞে বৃতাসঃ।"

ভাষ্যমূলম্।—ভবেদিদং যুক্তমুদাহরণমদীধেদিতি।

ইদং ত্বযুক্তমদীধয়ুরিতি। অয়ং জুসিগুণঃ প্রতিষেধ-বিষয় আরভ্যতে স যথৈব ক্ঙিতিচেত্যেনং বাধতে। এবমেনমপি বাধেত।

নৈষদোষঃ। জুসিগুণঃ প্রতিষেধবিষয়ঃ আরভ্য মাণস্তুল্যজাতীয়ং প্রতিষেধং বাধতে॥ কশ্চতুল্যজাতীয়ঃ। প্রত্যয়াশ্রয়ঃ। প্রকৃত্যাশ্রয়শ্চায়ম্।

অথবা যেন নাপ্রাপ্তে তস্য বাধনং ভবতি ন চাপ্রাপ্তে ক্ঙিতিনেত্যেতস্মিন্ প্রতিষেধে জুসিগুণ আরভ্যতে। অস্মিন্পুনঃ প্রাপ্তে চাপ্রাপ্তেচ।

যদি তর্হ্যয়ং যোগোনারভ্যতে। কথং দীধ্যদিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'অদীধেৎ' এইটী উপযুক্ত উদাহরণই হইতে পারে, বটে; কিন্তু 'অদীধয়ুঃ, এই উদাহরণটী ত অসঙ্গত? কারণ, জুসিচ ৭।৩।৮৩ এই যে প্রতিষেধ বিষয়ক সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে; তাহা, যেই প্রকারে, (গুণবৃদ্ধি নিষেধক) 'ক্ঙিতিচ' সূত্রকে বাধ করিয়াছে, ('গুণ'বিধান করিয়াছে) সেই প্রকারে ইহাকে ('দীধীবেবীটাম্' সূত্রকে) ও বাধ করিবে।

ইহা, কোনও দোষ নহে। কারণ, প্রতিষেধ বিষয়ক যে 'জুসিগুণঃ' আরভ্যমাণ সূত্র; তাহা, তুল্যজাতীয় প্রতিষেধকেই বাধ করিবে।

কোন্টী তুল্যজাতীয় প্রতিষেধ?

যেইটী প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু এই (দীধীবেবীটাম্) সূত্রটী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে।

তাৎপর্য্যার্থ।—জুসি চ ৭।৩।৮৩। (অজাদি 'জুস্'প্রত্যয় পরে থাকিলে, ইগন্তাঙ্গের গুণ হয়) 'জুস্'প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া গুণ হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্র, যদি কাহাকেও বাধ করে; তবে প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া যে 'ক্ঙিতি চ' সূত্র করা হইয়াছে, তাহাকে ই বাধ করিবে; কিন্তু প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে, 'দীধীবেবীটাম্' সূত্র করা হইয়াছে, তাহাকে (বিষয় ভিন্ন বলিয়া) বাধ করিবে না।

অথবা 'যাহার অপ্রাপ্তে যে বিধি আরম্ভ করা হয়, সে কেবলমাত্র তাহারই বাধক হয়; কিন্তু অন্যের বাধক হয় না'। এই নিয়মানুসারে, 'ক্ঙিতি' সূত্রানুসারেই 'জুস্'প্রত্যয় পরে থাকিলে, গুণের নিষেধ প্রাপ্তি হইয়াছিল; সুতরাং তাহার প্রতিষেধের জন্যই 'জুসি চ' সূত্র করা হইয়াছে। এইস্থলে ('দীধীবেবীটাম্,'এর স্থলে), ('ক্ঙিতি' সূত্রানুসারে) কিন্তু নিষেধ প্রাপ্তেও সূত্রারম্ভ করা প্রয়োজন। নিষেধ অপ্রাপ্তেও সূত্র আরম্ভ করা প্রয়োজন।

অতএব ছন্দ-দৃষ্ট-বিধ্যনুসারে প্রয়োগাদি সিদ্ধ হইবে বলিয়াই এই সূত্র অনাবশ্যক প্রতিপন্ন হইল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি এই যোগ অর্থাৎ সূত্র আরম্ভ না করা যায়; তবে দীধ্যৎ ('দীধীঙ্' ধাতুর 'লেট্' 'ল'কারে 'ই'কারের গুণ না হওয়াতে, 'যণ্' হইয়া অর্থাৎ সন্ধিতে 'ঈ'র স্থানে 'য' হইয়া 'দিধ্যৎ' হইয়াছে) এই প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—দীধ্যদিতি চ শ্যন্ব্যত্যয়েন সিদ্ধম্।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—'দীধ্যৎ' এই প্রয়োগ, গণের ব্যতিক্রম করিয়া 'শ্যন্'প্রত্যয় করিলেই সিদ্ধ হইবে।*

ভাষ্যমূলম্।—দীধ্যদিতি চ শ্যন্ ব্যত্যয়েন সিদ্ধো ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—'দীধ্যৎ' এই প্রয়োগ, ব্যতিক্রম করিয়া 'শ্যন্'প্রত্যয় করিলে ই সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ 'দীধী'ধাতু, অদাদিগণে পাঠ না করিয়া, 'শ্যন্' বিকরণ—বিশিষ্ট দিবাদিগণে পাঠ করিলেই, 'শ্যন্'এর 'ঙ'ইৎ প্রযুক্ত কার্য্য হয় বলিয়া, 'ক্ঙিতি' সূত্রানুসারেই গুণের নিষেধ হইবে; সুতরাং 'দীধীবেবীটাম্' সূত্র করা অনাবশ্যক।

ভাষ্যমূলম্।—ইটশ্চাপিগ্রহণং শক্যমকর্ত্তুম্॥ কথমকণিষমরণিষং কণিতাশ্বো-রণিতাশ্ব ইতি।

আর্দ্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেরিত্যত্র ইতিত্যনুবর্ত্তমানে পুনরিড্ গ্রহণস্য প্রয়োজনম্। ইটি ইডের যথা স্যাৎ যদন্যৎপ্রাপ্নোতি তন্মাভূদিতি।

কিং চান্যৎ প্রাপ্নোতি॥ গুণঃ॥ যদি নিয়মঃ ক্রিয়তে। পিপঠিষতের-প্রত্যয়ঃ পিপঠীঃ। দীর্ঘত্বং ন প্রাপ্নোতি।

নৈষদোষঃ। আঙ্গং যৎকার্য্যং তন্নিয়ম্যতে ন চৈতদাঙ্গম্।

অথবা সিদ্ধং দীর্ঘত্বং তস্যাসিদ্ধত্বান্নিয়মো ন ভবিষ্যতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—'দীধীবেবীটাম্'সূত্রে, 'ইট্'এর গ্রহণও না করিলে চলে।

অকণিষম্ ('কণ' গতৌ 'লঙ্'এর 'সিপ্' 'ইট্'আগম), অরণিষম্ ('রণ'-গতৌ), কণিতাশ্বঃ ('কণ'ধাতু 'লুট্'এর 'বস্'প্রত্যয় 'ইট্'আগম), রণিতাশ্বঃ ('রণ'ধাতু 'বস্'প্রত্যয়) প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হইবে?

আর্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ।৭।২।৩৫। (বল্প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ আদি বিশিষ্ট আর্ধধাতুকের 'ইট্'আগম হয়) এই সূত্রানুসারে ইট্ আগম হইয়া থাকে। কিন্তু এইসূত্রে, পূর্ব্বস্থিত "নেড্‌বশিকৃতি।৭।২।৮।" এই সূত্র হইতে 'ইট্'শব্দের অনুবৃত্তি আনিলেই যাবতীয় কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অথচ এইরূপ অনুবৃত্তি আসাসত্ত্বেও যে, "আর্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ" সূত্রে, পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুবৃত্তি আসাসত্ত্বেও যখন পুনঃ 'ইট্'গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন তাহার ইহাই প্রয়োজন যে, 'ইট্' আগম হইলে, সেই 'ইট্' যাহাতে 'ইট্' এইরূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং অন্য যাহা কিছু প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা না হয়।

('ইট্'এর স্থানে) অন্য কি প্রাপ্তি ছিল?

গুণ অর্থাৎ 'সার্বধাতুকার্ধকয়োঃ' সূত্রানুসারে, গুণ প্রাপ্তি হইয়াছিল।

যদি (এই 'আর্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ') সূত্রে, 'ইট্' গ্রহণ ব্যর্থ হওয়াতে) এইরূপ নিয়মই করা হয়, তবে, 'পঠ'ধাতুর উত্তর 'সন্'প্রত্যয় করিয়া "পিপ-ঠিষতেঃ"র উত্তর অপ্রত্যয় অর্থাৎ সম্যক্ লোপবিশিষ্ট 'কিপ্'প্রত্যয় করিয়া ধাতুত্ব নষ্ট হইয়া প্রাতিপদিক হইলে, তাহার প্রথমার একবচনে, 'পিপঠীঃ' এইস্থলে, দীর্ঘত্ব (র্বোরুপধায়াদীর্ঘইকঃ) প্রাপ্তি হইবে না?

এইস্থলে দোষ হইবে না। কারণ, অঙ্গস্থিত যে কার্য্য তাহারই নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু পিপঠিস্ অন্তবর্ত্তী 'স্'স্থানে 'র'হইলে, 'র্বোরুপধায়াদীর্ঘঃ। ৮।২।৭৬। সূত্রানুসারে যে দীর্ঘ হইয়াছে; তাহা, অঙ্গের উত্তর হয় নাই বলিয়া, ইহা অঙ্গে কার্য্য হয় নাই; সুতরাং 'পিপঠিস্'এর 'ইট্'আগম বিহিত 'ই'কারের দীর্ঘ হইলেও কোন দোষ হইবে না।

অথবা দীর্ঘবিধায়ক "র্বোরুপধায়াদীর্ঘঃ" অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদস্থিত বলিয়া অসিদ্ধ হওয়াতে, দীর্ঘত্বঅসিদ্ধ হওয়াতে তৎপ্রতি নিয়ম হইবে না।

হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ। ৭।

হলঃ। ১। অনন্তরাঃ। ১। সংযোগঃ। ১।

স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবধান না হয় এমন যে হল্ (ব্যঞ্জনবর্ণ), তাহার সংযোগ সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।— অনন্তরা ইতি॥ কথমিদং বিজ্ঞায়তে। অবিদ্যমানমন্তরং যেষামিতি। আহোস্বিদবিদ্যমানা অন্তরা যেষামিতি।

কিংচাতঃ। যদি বিজ্ঞায়তে অবিদ্যমানমন্তরং যেষামিতি।

অবগ্রহে সংযোগ সংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। অপ্সু ত্যপ্স্বিতি। বিদ্যতে হ্যত্রান্তরমিতি।

অথ বিজ্ঞায়তেঽবিদ্যমানা অন্তরা যেষামিতি ন দোষো ভবতি। যথা ন দোষস্তথাস্ত।

অথবা পুনরস্ত অবিদ্যমানমন্তরং যেষামিতি। নম্বুচোক্তং। অবগ্রহে সংযোগ সংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি অপ্স্বিত্যপ্সু ইতি। বিদ্যতে হ্যত্রান্তরমিতি। নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্।

ভাষ্যানুবাদ।—সূত্রস্থিত 'অনন্তরা' শব্দ; কিরূপে ইহা জানা যাইবে যে,—'বিদ্যমান নাই অন্তর (বিলম্বিত কাল) যাহাদের' এইরূপই সমাস হইবে? অথবা 'বিদ্যমান নাই অন্তরা (ভিন্নজাতীয় অর্থাৎ স্বরবর্ণ ব্যবধান) যাহাদের, এইরূপ সমাস হইবে?

ইহাতে অর্থাৎ এইরূপ বিচারে কি ফল হইবে?

যদি এইরূপ মনে করে যে, 'বিদ্যমান নাই অন্তর (ব্যবধান কাল) যাহাদের' তাহাই অনন্তর; তবে, অবগ্রহে (১) সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না।

যেমন,—বেদেতে যে স্থলে পদ বিভাগ করিবার জন্য 'অপসু' শব্দ স্থলে, 'অ প্ সু' পাঠ করা হইয়াছে, সেই স্থলে, 'প'কারের পরে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিয়া 'সু'র পাঠ হয়, বলিয়া উহাদের, সংযোগ সংজ্ঞাও হইবে না।

---

(১) 'অ প্ সু' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বেদে যেখানে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাকে 'অবগ্রহ' বলে।

(সুতরাং 'অপ্সু'র 'অকারের গুরু সংজ্ঞাও হইবে না)। কারণ, এই স্থলে ('প্' এবং 'সু'তে) অন্তর (কালবিলম্ব) ই রহিয়াছে।

অনন্তর, যদি "বিদ্যমান নাই অন্তর (বর্ণ ব্যবধান) যাহাদের, সেই অনন্তর" এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়; তবে, কোনও দোষ হইবে না। অতএব যেরূপ বিগ্রহ করিলে দোষ না ঘটে, তাহাই হউক।

অথবা পুনরায় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে, 'বিদ্যমান নাই অন্তর (কাল যাহাদের', এইরূপই বিগ্রহবাক্য হউক। যদি বল যে, অগ্রহে সংযোগ। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে না। যেমন (পূর্ব্বোক্ত) 'অপ্সু' ইতি 'অপ্সু' ইতি। এই স্থলেত কালই ব্যবধান রহিয়াছে? (এই দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে; কারণ,) এই স্থলে সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, কোন দোষও হইবে না, বা এই স্থলে সংযোগ সংজ্ঞা দ্বারা কোন প্রয়োজনও সাধিত হইবার নাই। অর্থাৎ 'অপ্সু' এই স্থলে, 'অ'কারের 'গুরু' করিয়া "গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাং" সূত্রানুসারে, 'অ'কারকে প্লুত করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

বার্ত্তিকমূলম্।—সংযোগসংজ্ঞায়াং সহবচনং যথান্যত্র।*

বার্ত্তিকানুবাদ।—যেমন অন্যত্র সূত্রকার 'সহ'শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, সেই-রূপ সংযোগ সংজ্ঞায়ও কর্ত্তব্য।*

ভাষ্যমূলম্।—সংযোগসংজ্ঞায়াং সহ গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। হলোঽনন্তাঃ সহেতি-বক্তব্যম্।

কিংপ্রয়োজনম্॥ সহভূতানাং সংযোগসংজ্ঞা যথাস্যাদেকৈকস্যমাভূদিতি। যথান্যত্র॥ তদ্যথা। সহসুপা। উভে অভ্যস্তং সহেতি।

কিং চ স্যাৎ। যদ্যেকৈকস্য সংযোগ সংজ্ঞাস্যাৎ। ইহ নির্যায়াৎ। নির্বায়াৎ বান্যস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং প্রসজ্যেত। ইহ চ সংস্কৃষীষ্টেতি ঋতশ্চ সংযোগাদেরিতীট্ প্রসজ্যেত। ইহ চ সংহ্রিয়ত ইতি গুণোর্ত্তিসংযোগাদ্যোরিতি গুণঃ প্রসজ্যেত। ইহ চ দৃষৎকরোতি সমিৎকরোতীতি সংযোগান্তস্যেতি লোপঃ প্রসজ্যেত। ইহ চ শক্তো বস্তেতি স্কোঃসংযোগাদ্যোরন্তেচেতি লোপঃপ্রসজ্যেত। ইহ চ নির্যাতো নির্বাতঃ সংযোগাদেরাতোধাতোরিতি নিষ্ঠানত্বং প্রসজ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ—সংযোগসংজ্ঞাতে, 'সহ' শব্দেরগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ "হলোনন্তরাঃ সংযোগঃ সহ"

গ্যালিলিও।

(শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।)

"বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দির" প্রতিষ্ঠার পর যে সকল ভক্ত ও সাধক আসিয়া তথায় অর্চ্চনা ও উপাসনা করিতেন, তাঁহাদের মঙ্গলাচরণের সেই মধুর মন্ত্রে, উপাসনার সেই উদাত্ত স্বরে এখনও মন্দির প্রতিধ্বনিত। অনেক দিন হইল, তাঁহাদের দেহাবসান হইয়াছে বটে, তথাপি চিরকালই তাঁহারা আমাদের পরিচিত। মরণ কি করিবে? সমস্ত জীবনব্যাপী কঠোর সাধাসাধনার পর "সেত শয়ন সুন্দর"। কবির ভাষায় "যায় সেই কাল বহি, লহরী খেলিয়া আনন্দে চরণাম্বুজে করিয়া প্রণাম"। এইসকল বিজ্ঞানসেবী-দিগের মধ্যে গ্যালিলিও অন্যতম।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যকালে নিউটনের সময় পর্য্যন্ত ইউরোপে অনেকগুলি মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল ; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই প্রধান ;—রজার বেকন্, কোপার্ণিকাস, টাইকোব্রে, জন কেপলার, ব্যাপটিষ্টা পোর্টা, উইলিয়াম গিলবার্ট, গ্যালিলিও, নেপিয়ার ডেকার্ট, পাস্কাল, এবং গিওয়েরিক্।

গ্যালিলিও গ্যালিলি ১৫৬৪ অব্দে ইটালির অন্তর্গত পাইসা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ। গ্যালিলিও বাল্যে আপ-নার ও বন্ধুবর্গের আমোদের জন্য কলকারখানার ক্ষুদ্রানুকৃতি ও খেলানা নির্ম্মাণ করিতেন। পিতার অবস্থা ভাল ছিল না ; তথাপি বহুকষ্টে সে সময়কার প্রথামত সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। বিশ্রাম সময় সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যার আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। চিত্রাঙ্কন বিদ্যা এত ভাল বাসিতেন যে, ইহাকেই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিলেন। সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যার উৎকর্ষলাভার্থ গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতার অনুরূপ ইচ্ছা হওয়ায় ১৫৮১ অব্দে পাইসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। বিদ্যালয়ে গ্যালিলিও অধ্যাপক-দিগের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন।

এরিষ্টটলের মতোদ্ধার করিয়া তাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দুরূহ বিষয়গুলি বোঝাইবার চেষ্টা করিতেন। গ্যালিলিওর ইহা ভাল লাগিত না। কোন দার্শনিকতত্ত্বের অনুকূল মতোদ্ধার অপেক্ষা স্বাধীন যুক্তি তাঁহার অধিক

প্রিয় ছিল। জ্যামিতি আরম্ভ করিবার সময় তাহার যুক্তিপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রকার যুক্তিতে স্বতঃসিদ্ধ বিষয় ভিন্ন বিশেষ কিছু মানিয়া লইতে হয় না। ইউক্লিড পাঠ সমাপনান্তে আর্কিমিডিসের গ্রন্থপাঠ করিলেন এবং তৎকৃত বারিবিজ্ঞান পাঠ করিতে করিতে "বারিমাপক তুলাযন্ত্র" (Hydrostatic Balance) সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন। এই রচনা পাঠ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত গ্যালিলিওর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন ও "কঠিন পদার্থের ভারকেন্দ্রের অবস্থান" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হওয়ায় ১৫৮৯ অব্দে ২৬ বৎসর বয়সে গ্যালিলিও পাইসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং টাস্কেনির ডিউকের সহিত পরিচিত হন। গ্যালিলিওর সময় এরিষ্টটলের বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় মত সাধারণের উপর প্রভূত অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। গ্যালিলিও অধ্যাপক হইয়াই এরিষ্টটলের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকে এরিষ্টটলের মতগুলি আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এমন ভাবে আক্রমণ করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই। গ্যালিলিও দেখিলেন, অধিকাংশ মতের সহিতই সত্যের বিরোধ, কিন্তু তাঁহার অকাট্য যুক্তির বিশেষ কোন ফল হয় নাই, তাহার সর্ব্বধ্বংসী আক্রমণ অন্ধবিশ্বাসরূপ দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের দুই একটি স্থান ভগ্ন করিল বটে, কিন্তু ফল হইল এই যে, সাধারণে দুর্গমধ্যে আপনাদিগকে একেবারে আবদ্ধ করিল। সে দুর্গ জয় করা অসাধ্য।

এরিষ্টটলের মতে দুইটি পতনশীল বস্তুর মধ্যে যাহার ভার অধিক, তাহার বেগ অন্যটি অপেক্ষা অধিক। কিন্তু গ্যালিলিও বলিলেন, সকল দ্রব্যই সমান বেগে পতিত হয়, এবং যদি বেগের তারতম্য দৃষ্ট হয় বায়ুর প্রতিরোধই ইহার কারণ। উভয় পক্ষে মহাতর্ক উপস্থিত হইল। গ্যালিলিও দেখিলেন যে, অনায়াসে ইহার মীমাংসা হইতে পারে, কারণ, পাইসায় এক উচ্চপ্রাসাদ (Leaning Tower) আছে, তথা হইতে এই বিষয়ের পরীক্ষা করিলেই সত্য নিরূপিত হইবে। তাহাই হইল, গ্যালিলিও যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণিত হইল। বিপক্ষীয়েরা নিজ চক্ষে আপনাদিগের ভ্রান্তি দেখিয়াও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের মতই যথার্থ, "এস্থলে কোন অজ্ঞাত কারণ দ্বারা তাঁহাদের মতের ভিন্নতা প্রমাণিত হইতেছে। এক পাউণ্ড অপেক্ষা ১০ পাউণ্ড দশগুণ বেগে পতিত হয়।"

এই পরীক্ষার বিষময় ফল ফলিল। ইহাতে এরিষ্টটলপক্ষীয়েরা নিজ ভ্রম বুঝিতে না পারিয়া গ্যালিলিওর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হইলেন। গ্যালিলিও পাইসা পরিত্যাগ করিয়া প্যাডুয়ায় গমন করিলেন ও তথায় গণিতের অধ্যাপক হইলেন। এখানে অধ্যাপকের বেতন সামান্য বলিয়া তাঁহাকে গৃহশিক্ষকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। প্যাডুয়ায় আসিয়া গ্যালিলিও কয়েকখানি পুস্তক লিখেন ও এক প্রকার তাপমান যন্ত্রের (Air Thermometer) উদ্ভাবন করেন। যন্ত্রটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। কন্দসমন্বিত এক কাচনলের অগ্রভাগ তরল দ্রব্যপূর্ণ কোন পাত্রের মধ্যে নিমজ্জিত। ঐ তরল দ্রব্যে নলের কিয়দংশ পূর্ণ থাকে; নলের অবশিষ্ট অংশ ও কন্দটি বায়ুপূর্ণ। তাপাধিক্য ও তাপাল্পতা নিবন্ধন ঐ বায়ুর প্রসারণ ও আকুঞ্চন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাপপরিমাণ নির্ণয় করা হইত। এক্ষণে এই যন্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

প্যাডুয়ায় গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনা কালে গ্যালিলিও কোপার্ণিকাস আবিষ্কৃত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় মতই যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। কোপার্ণিকাসের মত কি, বলিবার পূর্ব্বে গ্যালিলিওর সময়ে প্রচলিত মতের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। গ্যালিলিওর সময় যাঁহার জ্যোতিষমতন্ লোকে বিশ্বাস করিত, তাঁহার নাম টলেমি। যদিও গ্যালিলিওর জন্মের একশত বৎসর পূর্ব্বে কোপার্ণিকাস টলেমির মতের খণ্ডন করিয়াছিলেন, তথাপি সাধারণে টলেমির মতই বিশ্বাস করিত। টলেমি ১৫০ খ্রীঃ অব্দে মিশরদেশান্তর্গত এলেকজান্‌ড্রিয়া নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অনেকগুলি জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই প্রধান—পাইথাগোরাস, এরিষ্টার্কাস্, হিপার্কাস্, গ্যালাস্, অলাস্‌গেলাস্ ইত্যাদি। টলেমির মতে আমাদের পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে নিশ্চলভাবে অবস্থিত, ইহার চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই সপ্তগ্রহ বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করে এবং ইহাদিগের বাহিরে নক্ষত্রসমূহের এক বৃত্ত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। টলেমির মতে সূর্য্য সম্বৎসরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঠিক বৃত্তকক্ষায় ভ্রমণ করে না; সূর্য্য নিজে বৃত্তকক্ষায় ভ্রমণ করে এবং এই বৃত্তগুলির কেন্দ্রযোগ করিলে যে ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়, তাহা একটি বৃত্ত এবং এই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে আমাদের পৃথিবী অবস্থিত। সূর্য্যের বৃত্তকক্ষা, কেন্দ্রসমষ্টিকৃত এই বৃত্তের একটি এপিসাইক্‌ল্ (Epicycle)। টলেমি বিশ্বাস

করিতেন যে, পৃথিবী কখন সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে পারে না; কারণ (১) স্থিরনক্ষত্র (Fixed star) গুলিকে ঠিক একই স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় (২) পৃথিবী যদি ঘুরিত,তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বস্তুগুলি পৃথিবী অপেক্ষা অল্প ভারী বলিয়া পিছনে পড়িয়া থাকিত , কারণ,এরিষ্টটলের মতানুসারে যাহার ভার অধিক, তাহারই বেগ অধিক। এই কারণে টলেমির মতে পৃথিবী আপনার অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে পৃথিবীর অধিক বেগ নিবন্ধন পক্ষী ও মেঘসমূহ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত এবং পূর্ব দিকে কোন প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে উহা একটুকুও অগ্রসর হইত না এবং বোধ হইত, পূর্ব্বদিকে না যাইয়া প্রস্তরখণ্ড পশ্চিম দিকে যাইতেছে। কারণ, প্রস্তর অপেক্ষা পৃথিবীর বেগাধিক্য নিবন্ধন প্রস্তর পৃথিবীর পিছনে পড়িবে।

টলেমির এই মতই লোকে বিশ্বাস করিত। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে কোপার্নিকাস নামক একজন পোল্যাণ্ডদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাইথাগোরাস্ ও টলেমির মতের তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া, ইহার জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা উপলব্ধি করিয়া ইহাকে যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া স্থির করিলেন, এবং নিজমতের প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে সূর্য্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, ইহার কোন গতি নাই। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি আপন আপন কক্ষায় ভ্রমণ করে। কোপার্নিকাসের মতে পৃথিবীর কক্ষা বৃত্তাকার * এবং ইহার চতুর্দ্দিকে ইহার উপগ্রহ চন্দ্র পরিভ্রমণ করে এবং ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী আপনার চতুর্দ্দিকে একবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ভ্রমণ করে।

গ্যালিলিও যখন প্যাডুয়ায় গণিতের অধ্যাপক, তখন কোপার্নিকাসের মতই যথার্থ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন ; কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহাকে কিছুকাল টলেমির মত শিখাইতে হইত। প্যাডুয়ায় থাকিতে থাকিতে গ্যালিলিও সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এত লোক তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে আসিত যে, সহস্র লোকের উপযুক্ত গৃহে শ্রোতৃবৃন্দের স্থান সংকুলান হইত না। প্যাডুয়ায় ১৮ বৎসর কাল অধ্যাপনান্তর অনুরুদ্ধ হইয়া আবার পাইসায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্যাডুয়ায় থাকিতে থাকিতে একটি আশ্চর্য্য

* ইহার পর কেপলার নামক একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রহগণের কক্ষাক্ষেত্র বৃত্ত না হইয়া বৃত্তাভাস (Ellipse)।

যন্ত্রের উদ্ভাবন করিলেন, ইহার নাম দূরবীক্ষণ যন্ত্র। কিন্তু অনেকের মতে গ্যালিলিও সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক নহেন। লিপারসে নামক একজন ওলন্দাজ চসমাবিক্রেতা দুইটি স্থূলমধ্য কাচের (Convex lens) সাহায্যে দৈবক্রমে এমন একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন, যদ্দ্বারা দূরবর্ত্তী বস্তু নিকটে দেখা যাইত। ১৬০৯ অব্দে ভিনিসে অবস্থান কালে গ্যালিলিও শুনিলেন যে, হলাণ্ডে একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা দ্বারা দূরবর্ত্তী বস্তু নিকটে দেখা যায়। যন্ত্রটি কি প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাহা শুনেন নাই। চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, দুইটী সূক্ষ্মমধ্য (Concave lens) কিম্বা স্থূলমধ্য কাচখণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি নিজেই এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। লিপারসের মত দুইটি স্থূলমধ্য কাচখণ্ড না লইয়া একটি স্থূলমধ্য আর একটী সূক্ষ্মমধ্য কাচ লইলেন। স্থূলমধ্যটি দর্শনীয় বস্তুর দিকে এবং সূক্ষ্মমধ্যটি দর্শকের চক্ষুর দিকে রহিল। এই দূরবীক্ষণ দ্বারা বস্তুগুলি তিনগুণ বৃহদায়তন দেখাইত। যন্ত্রটি লইয়া গ্যালিলিও ভিনিসে উপস্থিত হইলেন; ভিনিসে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এক মাস ধরিয়া প্রধান প্রধান নাগরিকেরা ইহা দেখিতে আসিতেন। ভিনিস গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী গ্যালিলিওকে বলিলেন যে, ঐ অদ্ভুত যন্ত্রটি পাইলে সেনেট (Senate) আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিবেন। গ্যালিলিও অনুরোধ মত যন্ত্রটি উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। ইহার ফলস্বরূপ চিরজীবনের জন্য প্যাডুয়ার অধ্যাপকপদ পাইলেন এবং বেতন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। এই যন্ত্রটি এত কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছিল যে, নগরের সর্ব্বত্র ইহার অনুকরণে নির্ম্মিত নিকৃষ্ট যন্ত্র বিক্রীত হইতে লাগিল। গ্যালিলিও আর একটি দূরবীক্ষণ তৈয়ার করিলেন; ইহা দ্বারা দূরস্থিত দ্রব্য ৮ গুণ বৃহদায়তন দেখাইত। এই যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক বিষয় আবিষ্কার করিলেন। চন্দ্রেও পৃথিবীর ন্যায় পর্ব্বত ও উপত্যকা নয়নগোচর হইল। গ্যালিলিও চন্দ্রের গাত্রসংলগ্ন কৃষ্ণবর্ণ অংশকে সাগর বলিয়া স্থির করিলেন। এবারও এরিষ্টটলমতাবলম্বীরা বিরক্ত হইলেন। কারণ, তাঁহাদের মতে চন্দ্রের সকল অংশ সমোচ্চ অর্থাৎ ইহা সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তুলাকার। তাঁহারা চাক্ষুষপ্রমাণ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া কৌশলজাল অবলম্বন করিলেন। একজন বলিলেন যে, চন্দ্রের শূন্যগর্ভ অংশটি প্রকৃতপক্ষে শূন্যগর্ভ নহে; উহা একপ্রকার অদৃশ্য স্বচ্ছ স্ফাটিক পদার্থে পূর্ণ। গ্যালিলিও বলিলেন, এ মত বেশ

পন্থীরা ; ইহার দোষ এই যে, ইহা প্রমাণিত নহে এবং প্রমাণ করা যাইতেও পারে না।

১৬১০ অব্দের ৭ই জানুয়ারি তারিখে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণসাহায্যে দেখিলেন যে, বৃহস্পতির সম্মুখে ৩টী জ্যোতিষ্ক রহিয়াছে ; ৮ই তারিখে দেখিলেন যে, তাহারা বৃহস্পতির বিপরীত দিকে রহিয়াছে। ১০ই তারিখে দেখেন যে, তন্মধ্যে ২টি কেবল ৮ই তারিখের ন্যায় রহিয়াছে। ইহা হইতে চিন্তা করিয়া অনুমান করিলেন যে, এই তিনটি জ্যোতিষ্ক নক্ষত্র নহে, ইহারা বৃহস্পতির উপগ্রহ এবং চন্দ্র যেমন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, ইহারাও সেইরূপ বৃহস্পতির চতুর্দ্দিকে আপন আপন কক্ষায় পরিভ্রমণ করে। ১৩ই তারিখে বৃহস্পতির আর একটি উপগ্রহ নয়নগোচর হইল। এইরূপে গ্যালিলিও বৃহস্পতির চারিটি উপগ্রহের আবিষ্কার করেন। *

গ্যালিলিওর এই আবিষ্কার সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এরিষ্টটল-মতাবলম্বীরা ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিলেন না। বহু অনুরোধসত্ত্বেও প্যাডুয়ার দর্শনশাস্ত্রের প্রধানাধ্যাপক দূরবীক্ষণ সাহায্যে বৃহস্পতির উপগ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সম্মত হইলেন না। তর্কশাস্ত্রের অবরোহণ প্রণালী (Deductive reasoning) অবলম্বনে প্রমাণ করিলেন যে, উপগ্রহের অস্তিত্ব অসম্ভব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণে সাতটি মাত্র গ্রহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন— চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। গ্যালিলিওর চারিটি উপগ্রহের কথা শুনিয়া সিজি নামক একজন প্রসিদ্ধ ফ্লোরেন্সবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ এক কৌতুকাবহ যুক্তির অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, সাতটির অধিক গ্রহ বা গ্রহশ্রেণীর জ্যোতিষ্ক (Planetary Bodies) থাকিতে পারে না, কারণ, অধিকাংশ বস্তুই সাতটি করিয়া বর্ত্তমান, যথা (১) মস্তকের সাতটি ছিদ্র— দুইটি নাসারন্ধ্র, দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ এবং একটি মুখবিবর (২) সাতধাতু (৩) সপ্তাহের সাতদিন ইত্যাদি। বিপক্ষীয়দলের একজন বলিলেন, "দূরবীক্ষণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠে আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয় বটে, কিন্তু নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক সকলের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। বিক্ষিপ্ত আলোক-রশ্মিই (Refracted ray of light) এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ। আমার

* ইহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে ১৮৯২ অব্দে লিক্ অবসারভেটারির অধ্যক্ষ প্রোফেসর বারণার্ড (Professor Barnard) বৃহস্পতির আর একটী উপগ্রহের আবিষ্কার করিয়াছেন। অদ্যাবধি বৃহস্পতির এই ৫টি উপগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে।

দেহ মধ্যে আত্মা আছে, এই জ্ঞান অপেক্ষা এক ভ্রান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তথাপি চারিটি নূতন গ্রহের অনুমোদন করিব না"।

দূরবীক্ষণ আবিষ্কারে একটি সুবিধা হইল; এই যন্ত্র সাহায্যে গ্রহমণ্ডল অতি সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, কিন্তু তারকাগুলি কেবল অধিকতর উজ্জ্বল দেখা যায়। পূর্ব্বে গতি দেখিয়া গ্রহের পরিচয় হইত, কিন্তু এখন হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে অনায়াসে গ্রহ ও নক্ষত্র চিনা যাইত।

গ্যালিলিও দেখিলেন যে, বৃহস্পতির উপগ্রহের আবিষ্কারে নাবিকদিগের একটি মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে—সমুদ্রে কোন স্থানের দ্রাঘিমা (Longitude) নির্ণয়। তিনি স্থির করিলেন যে, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বনে দ্রাঘিমা নির্ণীত হইতে পারে। বৃহস্পতির কোন নির্দ্দিষ্ট উপগ্রহের আবর্ত্তন কাল নির্ণয় করিতে হইবে, এবং ফ্লোরেন্স হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, কখন ইহা ঠিক বৃহস্পতির ছায়ায় প্রবেশ করে। ইহা হইতে সম্বৎসরের মধ্যে কতবার ও কোন্ সময় সেই নির্দ্দিষ্ট উপগ্রহ ছায়ায় প্রবেশ করে, গণনা করিতে হইবে। গ্যালিলিও দেখিলেন যে, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় আপনার চতুর্দ্দিকে একবার অর্থাৎ ৩৬০° ডিগ্রি ভ্রমণ করে অথবা ১ ঘণ্টায় ১৫° ডিগ্রি ভ্রমণ করে, অর্থাৎ ফ্লোরেন্সে যখন মধ্যাহ্ন ১২টা, ১৫° পশ্চিমে তখন পূর্ব্বাহ্ন ১১টা। অতএব সময়ের তারতম্য দেখিয়া দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যাইতে পারে। গ্যালিলিও স্থির করিলেন যে, যদি ফ্লোরেন্স ও অপর কোন স্থান হইতে বৃহস্পতির কোন নির্দ্দিষ্ট উপগ্রহের বৃহস্পতির ছায়ায় প্রবেশ পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে উভয় স্থানের ঘটিকা-নির্দ্দিষ্ট সময়ের তারতম্য দৃষ্ট হইবে। ফ্লোরেন্সে পূর্ব্বোক্ত পঞ্জিকানির্দ্দিষ্ট সময় ও দ্বিতীয় স্থানের সময় হইতে অনায়াসে দ্বিতীয় স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যাইতে পারে। গ্যালিলিওর এই যুক্তি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করায় অনেক প্রতিবন্ধক আছে। চলমান ডেক হইতে বৃহস্পতির উপগ্রহের এই পর্য্যবেক্ষণ বড় সহজ ব্যাপার নহে; এবং গ্যালিলিওর সময় যথার্থ সময়জ্ঞাপক ঘড়ি ছিল না। এই সকল সুবিধা থাকিলে গ্যালিলিওর সময়ই এই কৌশল কার্য্যে পরিণত হইত।

এই ঘটিকার কথায় অবতারণা করিয়া গ্যালিলিও সম্বন্ধে আর একটি

কথা মনে পড়িল। ১৮ বৎসর বয়সে গ্যালিলিও একদিন পাইসার গির্জ্জায় উপাসনা করিতে গেলেন; দেখিলেন যে, একজন ভৃত্য আসিয়া ল্যাম্প তৈলপূর্ণ করিয়া দিল। ল্যাম্পটি দুলিতে লাগিল। তিনি একাগ্রচিত্তে ইহা দর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন যে, পরিদোলনের (Oscillation) সময় গুলি সমান। ইহাই পরিদোলক (Pendulum) যন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। বৃহস্পতির পর শনিগ্রহের প্রতি গ্যালিলিওর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল, কিন্তু তাঁহার দূরবীক্ষণ শনিতত্ত্বাবিষ্কারোপযোগী ছিল না। তিনি এক স্থলে বলিতেছেন, "আমি বিস্ময়ের সহিত দেখিয়াছি, শনি একটি মাত্র জ্যোতিষ্ক নহে, কিন্তু তিনটি জ্যোতিষ্কের সমষ্টি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কাহারও আপেক্ষিক গতি নাই। দুইটি ছোট বৃত্তের মাঝখানে একটি বৃহৎ বৃত্ত রাখিলে যে প্রকার দেখায়, ইহার আকার তদ্রূপ। সহস্র অপেক্ষা অল্প গুণ বৃহদায়তন করে, এমন দূরবীক্ষণ সাহায্যে যদি শনিকে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বৃত্তাভাসবৎ (Ellipse) দেখা যাইবে।"

অতঃপর গ্যালিলিও সৌর কলঙ্কের (Sun-spot) আবিষ্কার করেন। এই সকল সৌর কলঙ্ককে সূর্য্যমণ্ডলের উপর চলিতে দেখিয়া প্রথমে স্থির করিলেন যে, কতিপয় গ্রহ সূর্য্যের চারি ধারে ভ্রমণ করে এবং জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলকে পশ্চাতে রাখে বলিয়া কলঙ্কবৎ প্রতীয়মান হয়। তাহার পর গ্যালিলিও বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা সূর্য্যের গাত্রসংলগ্ন গ্রহ নহে। ইহার পর নানা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, সূর্য্যের আপনার অক্ষের চারিদিকে আবর্ত্তনই এই সকল সৌর কলঙ্কের গতির কারণ এবং গণনা করিলেন যে, এই আবর্ত্তন করিতে সূর্য্যের ২৮ দিন লাগে। সৌর কলঙ্কের ন্যায় সূর্য্যের গাত্রে কতকগুলি অংশ আবিষ্কার করিলেন, যাহারা অবশিষ্টাংশ অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল।

১৬১১ অব্দে গ্যালিলিও রোমদর্শনে যাত্রা করেন। যাজকসমাজ প্রতিভার জন্য গ্যালিলিওকে সাদর সম্ভাষণে প্রীত করিলেন। সৌরকলঙ্ক ও শুক্রগ্রহ প্রদর্শনের জন্য আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় এক বিজ্ঞানসমিতিতে যোগদান করিলেন। এই সমিতি নিজ ব্যয়ে গ্যালিলিওর অনেকগুলি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞানানুশীলনে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিলেন। রোম হইতে ফ্লোরেন্স প্রত্যাগমন করিয়া গ্যালিলিও "ভাসমান বস্তুবিষয়ক প্রস্তাব" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধে আর্কিমীডিসের

মতই যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। আর্কিমীডিসের নিয়ম—“কোন কঠিন বস্তুকে জলাদিতে নিমজ্জিত করিলে তাঁহার সমায়তন জলাদি স্থানান্তরিত হয় এবং ঐ স্থানান্তরিত জলাদির ভারের তুল্য বলে উহা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।” এই প্রবন্ধে এরিষ্টটলমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের মতের খণ্ডন করিলেন। তাঁহাদের মতে কোন বস্তুর আকৃতিই তাহার জলাদিতে নিমজ্জিত কিম্বা ভাসমান হইবার কারণ। এই প্রকার ভ্রান্তি প্রদর্শনে গ্যালিলিওর শত্রুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল। পূর্ব্বপ্রচলিত মতের পোষণকারী অধ্যাপকেরা আপনাদিগের সম্মান ও মর্য্যাদার হানি হইতেছে দেখিয়া গ্যালিলিওকে বিদ্বেষপূর্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। কোপার্নিকাস আবিষ্কৃত জ্যোতিষ তত্ত্বের সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া যাজকমণ্ডলী তাঁহাকে বিষচক্ষে দেখিতে লাগিলেন, গ্যালিলিও এবং তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে যথেচ্ছ গালি দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, “জ্যামিতি শয়তানের শাস্ত্র এবং খ্রীষ্টান শাস্ত্রবিরুদ্ধমত প্রচার করার জন্য গণিতজ্ঞদিগকে নির্ব্বাসিত করা উচিত।” যাজক সম্প্রদায় গ্যালিলিওর উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিবার পূর্ব্বে তখনকার যাজকসভা কিরূপ অত্যাচার করিতেন, বলা যাইতেছে। রোমে একটি যাজকসভা ছিল, তাহার নাম ইন্‌কুইজিশান্ (Inquisition)। যাঁহারা পৌত্তলিক, কিম্বা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন, কিম্বা স্বাধীনভাবে ধর্ম্মমতের আলোচনা করিতেন, তাঁহারা এই সভা দ্বারা দণ্ডনীয় হইতেন। তাঁহাদিগকে অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করা হইত কিম্বা ভয়ানক যাতনা প্রদান করা হইত, এমন কি, সময়ে সময়ে খুঁটিতে বাঁধিয়া জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা হইত। এই শেষোক্ত কার্য্যের নাম ছিল, “বিশ্বাসমূলক কার্য্য” (Act of Faith)!!! রোমের Inquisition সভা গ্যালিলিওকে শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও পুনর্ব্বার রোমে গমন করিলেন। জনশ্রুতি উঠিল, বিচারের জন্য তাঁহাকে রোমে আসিতে হইয়াছে। গ্যালিলিওর বিচারের জন্য Inquisition সভা আপনাদিগের সভাভুক্ত কয়েকজন যাজককে নিযুক্ত করিলেন। গ্যালিলিওকে বলা হইল যে, তিনি কোন প্রকারে পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় মত প্রচার ও সমর্থন করিতে পারিবেন না, এমন কি, মতটি বিশ্বাসও করিতে পারিবেন না, ইহার অন্যথা হইলে কারাবদ্ধ হইবেন, এই ভয়প্রদর্শন করা হইল। কারাগারের ভয়ে গ্যালিলিও তাঁহাদের আজ্ঞা-

অনুযায়ী বার্গা করিবেন, স্বীকার করিলেন। যাজকসভা ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি সম্বন্ধে যত পুস্তক লেখা হইয়াছে, সমস্তই ভ্রমমূলক ও খ্রীষ্টান শাস্ত্র বিরুদ্ধ। গ্যালিলিও বিষণ্ণচিত্তে রোম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর "জোয়ার ভাটার কারণ" শীর্ষক একখানি পুস্তক লিখেন। এই পুস্তকের মুখবন্ধে আর্ক ডিউক লিওপোল্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "রোমে যখন যাজক সম্প্রদায় কোপার্ণিকাসের পুস্তক ও তাঁহার মত বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, তখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম। কিন্তু এই ভদ্রমহোদয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকখানির প্রচার বর্জ্জিত করিয়াছেন ও মতটি ভ্রান্ত এবং খ্রীশ্চিয়ানশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমার মত নিস্তেজ বুদ্ধিযুক্ত লোকের, আমা অপেক্ষা অধিক-জ্ঞানী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যে মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা বিশ্বাস ও মান্য করা উচিত, এই বিবেচনা করায় আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই মতটিকে স্বপ্ন বা উপকথার ন্যায় জ্ঞান করিবেন, কারণ, ইহা পৃথিবীর গতিরূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। কিন্তু কবি তাঁহার কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টির বিশেষ পক্ষপাতী, আমিও তাঁহার মত আমার এই ভ্রান্তির আদর করিতেছি।" পাঠকগণকে বলিতে হইবে না যে, ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে পূর্ণ।

এই সময় পোপ পঞ্চম পলের মৃত্যু হয় এবং গ্যালিলিওর বন্ধু কার্ডিনাল বারবেরিণি (Cardinal Barberini) আরবান্ নামে পোপপদে অভিষিক্ত হইলেন। গ্যালিলিওর বন্ধুরা নবাভিষিক্ত পোপকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে রোমে যাইতে অনুরোধ করিলেন। জরাজীর্ণ গ্যালিলিওকে ডুলি চড়িয়া রোমে যাইতে হইয়াছিল (১৬২১)। পোপ আরবান গ্যালিলিওকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন ও কতকগুলি উপঢৌকন প্রদান করিলেন। পোপ তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব মুরুব্বি Duke of Tuscanyর পুত্রের সহিত আলাপ করিয়া দিলেন। এই প্রকার ব্যবহারে গ্যালিলিও আশ্বস্ত হইলেন এবং মনে করিলেন, যাজক সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি আর অত্যাচার করিবে না।

১৬৩২ অব্দে গ্যালিলিও "কোপার্ণিকাস আবিষ্কৃত পৃথিবীর গতিবিষয়ক মত সম্বন্ধে কথোপকথন" শীর্ষক একখানি পুস্তক প্রচারিত করিলেন; এই খানিই তাঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ পুস্তক। এই পুস্তকে চারিদিনের কথোপকথনে কোপার্ণিকাস ও টলেমির পৃথিবীর গতিসম্বন্ধীয় মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। এই পুস্তকের মুখবন্ধে "বিবেচক পাঠকের

প্রতি" সংশোধন করা হইয়াছে। মুখবন্ধ বিদ্রূপপূর্ণ, লিখিতেছেন, "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি হিতকারী ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল যে, কেহই পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে মত প্রচার করিতে পারিবে না। কতিপয় অবিমৃষ্যকারী ব্যক্তি বলিলেন যে, এই আদেশ প্রদান করিবার পূর্ব্বে আজ্ঞাকারীরা যুক্তি সহকারে বিচার করেন নাই। তাঁহারা অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, জ্যোতিষ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তায় বাধা দেওয়া উচিত নহে। এই সকল নির্ব্বোধ অভিযোগ শুনিয়া আমি নীরব থাকিতে পারি নাই। আমি স্থির করিলাম যে, প্রকৃত সাক্ষ্য দিবার জন্য আমাকে পৃথিবীর নাট্যশালায় প্রকাশ্যে বাহির হওয়া উচিত। আমি এই পুস্তকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইটালি হইতে শুদ্ধ আত্মার মোক্ষ সাধন সম্বন্ধীয় মতের প্রচার হয় নাই, এই দেশ হইতে বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযোগী মতও আবিষ্কৃত হইয়াছে"।

তিন জন লইয়া এই কথোপকথন। প্রধান বক্তা কোপার্ণিকাসের মতের ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং এরিষ্টটল ও টলেমির মতসমর্থক দ্বিতীয় বক্তার অকিঞ্চিৎকর আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। তৃতীয় বক্তা যথার্থ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। তৃতীয় বক্তার অবতারণায় পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই পুস্তক প্রচারে রোমে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। Inquisition সভা গ্যালিলিওর বিচারের জন্য স্থির করিলেন। তাঁহাকে রোমে আসিবার আজ্ঞা করা হইল। টাস্কানির ডিউক গ্যালিলিওর বৃদ্ধাবস্থা ও ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করিয়া পোপের সভায় একজন দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যাজকসম্প্রদায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, সুতরাং ১৬৩৩ অব্দে গ্যালিলিওকে রোমে আসিতে হইল। ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ আনয়ন করা হইল। অনেকের বিশ্বাস, গ্যালিলিওকে অন্ধকার কারাগৃহে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার একবর্ণও সত্য নহে। তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব, সদ্ব্যবহার করা হইত। যখন তাঁহার বিচার হইতেছিল, তখন গ্যালিলিওকে কারাগারে থাকিতে হয় নাই। টাস্কেনির ডিউকের বাটীতে থাকিতেন। কিন্তু বিচারের শেষকালে যখন বিচারালয়ে গ্যালিলিওর উপস্থিতির প্রয়োজন হইত, তখন তাঁহাকে কারাগারে থাকিতে হইত। কিন্তু নিয়মানুযায়ী নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতে হইত না। টাস্কেনির

রাজসরকার হইতে তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রকার ব্যবহারও গ্যালিলিওর ভাল লাগিল না। অবশেষে পোপের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্ডিনাল বার্বেরিণি আপনার ঝুঁকিতে তাঁহাকে টাস্কেনির ডিউকের প্রাসাদে থাকিবার অনুমতি দেওয়াইলেন। দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের দিন গ্যালিলিওকে পাপানুতাপব্যঞ্জক বেশে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। Inquisition সভার হস্তে প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা ছিল। Inquisition গ্যালিলিওকে যথাসম্ভব শাস্তি প্রদানের ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গ্যালিলিওকে রীত্যনুযায়ী ও প্রকাশ্যে আপনার মত ভ্রান্তিযুক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। Inquisition সভা দণ্ডাজ্ঞালিপি পাঠ করিলেন। তাহা হইতে আমরা সারোদ্ধার করিয়া দিলাম।

"গ্যালিলিও, ১৬১৫ অব্দে যাজক সভা কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কারণে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল—(১) সূর্য্য নিশ্চলভাবে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি আছে, এই ভ্রান্ত মতের সমর্থন।

(২) ছাত্রদিগকে এই মতের অধ্যাপনা।

(৩) পত্রদ্বারা কতিপয় জর্ম্মাণিদেশীয় গণিতজ্ঞের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা।

(৪) সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধীয় মতের আবিষ্কার ও সমর্থন।

(৫) আপনার মনোমত খৃষ্টীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা উহা হইতে উদ্ধৃত মতের খণ্ডন।

সেই সময় তোমার প্রতি কঠোর ভাবে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করায় যাজক সভা তোমাকে এই মত পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন এবং বলেন যে, পরিত্যাগ না করিলে তুমি ইহার প্রচার, পারপোষণ ও সমর্থন করিতে পারিবে না। এই আদেশ মান্য না করিলে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইযাছিল। যাজক সভার সভাপতি তোমাকে সামান্যরূপ তিরস্কার করেন এবং কয়েকজন সাক্ষীর সম্মুখে তোমাকে এই মত পরিত্যাগ করিতে বলেন। এই আদেশ পালন করিবে প্রতিজ্ঞা করায় তোমাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল।

ভবিষ্যতে কোন অপকার সাধিত না হয় ও রোম্যান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের কোন ক্ষতি না হয়, এই উদ্দেশে যাজক সভাকর্ত্তৃক এই মতের সমর্থক পুস্তকা-

বলীর প্রচার রহিত হয় ও মতটি ভ্রান্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘোষণার পরও তুমি "কথোপকথন" শীর্ষক এক-খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছ। ইহা দ্বারা নিষিদ্ধ মতের পুনঃ প্রচার হইতেছে, এবং পুস্তকখানিকে কৌশল করিয়া এমনভাবে লেখা হইয়াছে যে, যেন এই মত সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আছে। এই দোষে যাজকসভা বিচারের জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন; বিচারালয়ে তুমি স্বীকার করিয়াছ যে, যাজকসভার ঘোষণার পর পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। তোমার শক্রপক্ষীয়েরা বলিতেছে যে, তুমি এই মত পূর্ব্বে শপথ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলে ও ইহার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। তুমি কার্ডিনাল বেলারামাইনের (Cardinal Bellaramine) নিদর্শনপত্র (Certificate) দ্বারা প্রমাণ করিয়াছ যে, তুমি পূর্ব্বে এ মত শপথ করিয়া পরিত্যাগ কর নাই এবং তোমাকে শাস্তিও দেওয়া হয় নাই। তোমার Certificate অনুসারে তোমাকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে, পৃথিবীর গতি ও সূর্য্যের নিশ্চল অবস্থা বিষয়ক সিদ্ধান্ত খৃষ্টীয়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই Certificateই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় মত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ জানিয়াও কোন্ সাহসে তুমি সম্ভব বলিয়া ইহার প্রচার ও সমর্থন করিয়াছিলে? বিচারালয়ে তুমি একজন প্রকৃত রোম্যান্ ক্যাথলিকের ন্যায় উত্তর প্রদান করিয়াছ।

অতএব আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার মাতা ভগবতী মেরিকে ভক্তি-ভাবে সম্বোধন করিয়া তোমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য লিখিতেছি। শাস্ত্রবিরুদ্ধা-চরণের জন্য তুমি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী তোমাকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

আমরা আদেশ করিতেছি, যদি তুমি আমাদের সম্মুখে অকপট হৃদয়ে ও সরল বিশ্বাসে শপথ করিয়া এই মত পরিত্যাগ কর ও আপন ভ্রান্তির জন্য আত্মগ্লানি প্রকাশ কর, তাহা হইলে শাস্তি হইতে তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য ও ভবিষ্যতে আর এমন কার্য্য না কর, ইহার জন্য তোমার প্রতি নিম্নলিখিত শাস্তি প্রদত্ত হইল।

(১) প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা 'কথোপকথন' শীর্ষক পুস্তকের প্রচার রহিত হইবে।

(২) যাজক সভার আদেশ মত রীত্যানুযায়ী কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

(৩) তিন বৎসর ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সপ্তাহে একবার অপরাধ ভঞ্জনের ৭টি শ্লোক আবৃত্তি করিতে হইবে।" পুস্তকখানি দগ্ধ করিবার আদেশ হইল। গ্যালিলিওকে জানু পাতিয়া বাইবেল স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া স্বীয় মতের প্রত্যাহার করিতে হইল, এবং ভবিষ্যতে আবার মত সমর্থন করিলে দণ্ডনীয় হইবেন, স্বীকৃত হইলেন।

ইহার পর উত্থান করিয়া নিকটস্থিত এক বন্ধুর কর্ণে আস্তে আস্তে বলিলেন, "তবুও পৃথিবী ঘুরে।"

চারিদিন কারাবাসের পর গ্যালিলিওর মুক্তি হইল। ইহার পর তাঁহাকে চোখে চোখে রাখা হইত। ইহার পর পাঁচ বৎসর ধরিয়া গ্যালিলিও ফ্লোরেন্স যাইবার অনুমতি পান নাই। ফ্লোরেন্সে যাইয়া বাটীর বাহিরে যাইতে ও পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার আদেশ ছিল না। ১৬৩৭ অব্দে গ্যালিলিও দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন; চক্ষুরত্ন হারাইয়া একেবারে অন্ধ হইলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার এক ছাত্র লিখিয়াছেন, "চক্ষুদ্বয় চিরকালের মত জ্যোতিঃহীন হইল। সত্য সত্যই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার চক্ষু পরলোকগত সকল ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দেখিয়াছে এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়ের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে।" এই দুর্ভাগ্যের পর Inquisition তাঁহার উপর ততটা কঠোর ব্যবহার করেন নাই এবং গ্যালিলিও বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। ১৬৫২ অব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে চিরকালের মত মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ধ্রুবচরিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অবশিষ্ট)

লক্ষ্মী। প্রভো! দেখ চেয়ে
তোমার পরম ভক্ত ধ্রুব শিশু মগ্ন তব ধ্যানে।
রাখহ মিনতি নাথ! ত্বরা দাও দরশন।

নারা। প্রিয়ে! সকলই জানি আমি।
কিন্তু কি করিব—যতক্ষণ ভক্ত নাহি করে
পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ আমার উপরে

তৎক্ষণ নাহি পায় মম দরশন।
বাসনার লেশ থাকিলে হৃদয়ে নাহি মিলে দরশন।
ধ্রুবের এখন হইয়াছে পূর্ণ বৈরাগ্য উদয়।

লক্ষ্মী। তবে অন্তর্যামী, বিলম্ব করিছ কেন?
ভক্ত প্রতি আর হোয়োনা নিষ্ঠুর প্রভু।

নারা। প্রিয়ে। ভক্ত কাঁদে মম তরে,
আমি করি ভক্ত তরে অধিক ক্রন্দন।
মম তরে, এক বিন্দু অশ্রু যদি ভক্ত করে বিসর্জ্জন,
না পারি থাকিতে আর বৈকুণ্ঠে তখন—
ছুটে এসে দিই আমি ভক্তে আলিঙ্গন।
ভক্তের ব্যাথায় ব্যথিত হৃদয় মম।

লক্ষ্মী। তবে নাথ। তব ভক্ত
তব তরে এত কষ্ট পাইল বা কেন?

নারা। প্রিয়ে। ভক্তে ছেড়ে এক দণ্ড না পারি থাকিতে।
বৃথা মোরে নাহি গঞ্জ রমে।
মাতৃ অঙ্ক ত্যজি, মাতৃস্তন ত্যজি,
গভীর নিশায়, গাঢ় অন্ধকারে,
প্রবেশিল ধ্রুব যবে নিবিড় কাননে,
যখন সে একবার, ভক্তিভরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল আমারে
"কোথা হরি, কোথা পদ্মপলাশলোচন'
তখনই হৃদয়তন্ত্রী উঠিল বাজিয়া,
তখনই সে গভীর নিশায়, ছাড়িনু বৈকুণ্ঠধাম,
ছায়াকারে ধ্রুবপাশে বদ্ধ রহিলাম।
সে অবধি তিলেকের তরে ছাড়ি নাই ভক্তে মম।
প্রতি পদে পদে রক্ষা কোরেছি বালকে,
হের—ভক্ততরে কত শত চিহ্ন অঙ্গে কোরেছি ধারণ।
অধিক কি কব রমে।
ভক্ত মম প্রাণ, ভক্ত মম অস্থি মাংসপেশী, শিরার শোণিত;
ভক্ত আমি অভিন্ন শরীর,
ভক্তজনে ভগবান জানিও কমলে।

ভক্ত অঙ্গে হইলে বেদনা মম অঙ্গে প্রতিঘাত করে তাহা।
জননী যখন শিশুরে করায় স্নান
কাঁদে শিশু আর্ত্তনাদে,
কিন্তু, সে রোদনে হয় যথা দেহ প্রক্ষালন,
তেমতি, প্রথম সাধন ভজনে প্রিয়ে,
দুঃখ যদি পায় ভক্ত,
সেই দুঃখে হয় তার চিত্ত প্রক্ষালন ;
চিত্তের স্বচ্ছতা এলে, ভক্তহৃদে পড়ে প্রতিবিম্ব মোর।
সেই সে সময়, উপস্থিত ধ্রুবের এখন ;
এখনই দরশন দিব তারে।

লক্ষ্মী। ধ্রুব! দেখ চেয়ে কি সৌভাগ্য তব!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি বিরাজেন আজি সম্মুখে তোমার।
মেল মেল আঁখি কোটী কোটী জন্ম সাধনের ধন
তব তরে দাঁড়ায়ে সম্মুখে।
(নারায়ণের প্রতি) কি হোল কি হোল নাথ!
কেন ধ্রুব নাহি মেলে আঁখি ?
তব পাদপদ্ম কেন নাহি করে নিরীক্ষণ ?

নারা। প্রিয়ে!! এখন বিরাজি আমি অন্তরে তাহার।
মানসনয়নে ধ্রুব মম রূপ করি নিরীক্ষণ
হইয়াছে উন্মত্ত বিভোর ;
বাহিরের রূপ তাই নাহি হেরে মোর।
অন্তর্দৃষ্টি শক্তি তার করি আকর্ষণ,
এখনিই বৎস নয়ন মেলিবে। (অন্তর্দৃষ্টি হরণ)

ধ্রুব। উহুঃ! উহুঃ!
বৃন্ত ভাঙ্গি মরমের ফুটন্ত মুকুল
কে ছিঁড়িল মোর ?
বড় ব্যথা লাগিল মরমে।
কে হেন নিঠুর চোর,
চুরি কোরে নিল মোর লুকান রতনে।
কোথা যাব—

কোথা গেলে পাব তাঁর দরশন!

(যমুনার প্রতি) শুন গো, শুন গো শুন গো যমুনে,

আমার নীলমণিকে দে গো এনে।

আমি বুঝেছি তুমি কোরেছ চুরি,

দে গো যমুনে, দে গো ফিরি,

কোরোনা কোরোনা ছলনা চাতুরী ;

নীলের পরশে হোয়েছ নীল,

ধরা পোড়েছ তোমার নীলবরণে।

নাহি ফিরে দাও যদি, আমার সে নীল নিধি,

ডুবিব তোমার নীরে

দেখি দাও কি, না দাও ফিরে মোর সেই হারান রতনে।

(ঝাঁপ দিতে উদ্যত ও লক্ষ্মীর ধ্রুবকে ধারণ)

ধ্রুব। ধোরোনা ধোরোনা ধোরোনা আমায়,

ডুবিব যমুনা নীরে আনিতে তাঁহায়।

লক্ষ্মী। চেয়ে দেখ বাছা একবার ফিরে,

দাঁড়ায়ে আছেন হরি তোমার পিছনে।

(ধ্রুবের পশ্চাতে দৃষ্টি ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান)

ধ্রুব। এই কি আমার সেই পদ্মপলাশলোচন ?

মনের রূপের সনে, হইছে মিলন !

সাধনের ধন আমার সেই ত ইনি।

কমল চরণ বোধ হয় যেন চিনি চিনি।

তবে জীবনের পণে এঁর চরণ কিনি।

(নারায়ণের পদতলে পতন)

নারা। উঠরে উঠরে উঠ ধ্রুবমণি,

কোলে আয়রে আয়রে আয়রে বাছনি।

ধ্রুব। আমি যাবনা যাবনা যাবনা কোলে,

রব তব পদমূলে,

কোলে গেলে, ভাল কোরে চরণ দেখিতে পাইনি।

নারা। কোমল কণ্ঠে তব, স্তব কর তবে ধ্রুব

আনন্দে তোমার স্তব শুনি।

ধ্রুব। হরি, নাহি ফুকারে হামারি বাণী।
নিরখি নিরখি তব চরণ দুখানি॥
ভাষা মিশায়ে গেছে, ভাবে প্রাণ ভোরে আছে,
আঁখি দিশি হারায়েছে (আমি) স্তবস্তুতি নাহি জানি॥

নারা। বৎস! বেদময় শঙ্খ প্রান্তে
করিলাম স্পর্শ কপোল তোমার ;
এখনই বাক্‌শক্তি, তব কণ্ঠে হইবে সঞ্চার।
রসনায় তব সরস্বতী লইবে আসন।
কর তুমি এক প্রাণে স্তব আরাধন।

ধ্রুব। বন্দে বিশ্বপতে পুরুষ পুরাণ,
অসীম বিশ্বের তুমি পরম নিধান।
তুমি বিশ্ব, বিশ্বস্বামী, অগ্নি, বারি, বায়ু, ভূমি,
আকাশে আকাশ তুমি, তোমা ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থান।
শ্রীচরণে করি তব সহস্র প্রণাম॥
তুমি কল্প কল্প অন্তে, সহায় করি অনন্তে,
যোগঘুমে মগ্ন হও, জাগ যোগ হোলে অবসান।
শ্রীচরণে করি তব সহস্র প্রণাম॥
বন্দে মাতঃ নারায়ণী,
জীবজীবনপালিনী,
অবিরত কর তুমি জীবের কল্যাণ।
শ্রীচরণে করি তব সহস্র প্রণাম॥

নারা। বৎস! তুষ্ট হনু বড় স্তব শুনি তোর ;
মনোমত বর করহ প্রার্থনা।

ধ্রুব। নাহি জানি প্রভো!
কোন্ বর লব তব ঠাঁই।

নারা। পিতৃরাজ্য চাহ যদি,
এখনই তা দিব তোরে।

ধ্রুব। রাজ্যধনে আর প্রভো! নাহি প্রয়োজন।

নারা। যেই রাজ্য হেতু তুই করিলি সাধন,
সেই রাজ্যে কেন আজি নাহি প্রয়োজন?

ধ্রুব। প্রভো! নাহি সুখ রাজ্যধনে;
ধন মান রাজ্য সুখ ভোগ
সুধু ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ।
সুখ যদি হয় দুঃখের কারণ,
হেন সুখে মোর নাহি প্রয়োজন।
নারা। তবে কোন্ বর চাহ বৎস?
যেই বর তুমি করিবে প্রার্থনা,
তাই দিয়া তব পুরাব বাসনা।
ধ্রুব। প্রভো। দিয়াছ সকলি,
চাহিবার কিছু নাহি ত আমার হরি।
আমার পরম পিতা তুমি;
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, সে রাজার পুত্র আমি,
কি অভাব আছে মোর প্রভো?
একান্তই যদি রাজ্য দিতে চাও,—
দাও প্রভো! হেন রাজ্য মোরে
নাহি হবে যার পতন কখনও।
হে অন্তর্যামী, পিতৃরাজ্য, পৃথিবীর রাজ্য
কিম্বা স্বর্গ রাজ্য নাহি চায় প্রাণ,—
এই বর দেহ প্রভো। পদ্মপলাশলোচন!
ভক্তিরাজ্যে যেন করি বাস।
সে রাজ্যের প্রজা সাধু যোগী ঋষিগণ,
বর দেহ প্রভো!
হোয়ে প্রজা সে সাধু প্রজার,
সাধুসেবা করি আজীবন।
সাধুর করিলে সেবা,
বদ্ধ থাকে ভগবান ভক্তের হৃদয়ে।
তাই বলি প্রভো!
ভক্তিরাজ্যে দাও মোরে করিবারে বাস।
জন্ম জন্ম তথা,
হোয়ে থাকি যেন তব দাস অনুদাস।

নারা। তথাস্তু, তথাস্তু বৎস !
দুর্ল্লভ রতন ভক্তি দিলাম তোমায়।
এই ভক্তিবলে তুমি,
লভিবে দুর্ল্লভ স্থান ধ্রুবলোক নামে।
এই ভক্তিবলে তুষ্ট হোয়ে আমি
করিনু তোমায় দিব্য দৃষ্টি দান।
দিব্য দৃষ্টি বলে, স্বরূপ আমার করহ দর্শন।

ধ্রুব। একি ! একি ! নবজলধর মোহন মুরতি,
অকস্মাৎ শূন্যে কোথা মিশাইল ?
সব শূন্য হেরি সব শূন্য,
তুমি এক জ্যোতিঃপূর্ণ,
আর কিছু নাহি হেরি, হেরি তোমারেই হরি ;
পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম, দুই আঁখি রবি সোম,
প্রতি লোমকূপে জ্বলে অসংখ্য তারকা।
পিতামহ ব্রহ্মা নাভিপদ্মে বসি যোগেতে মগন,
মহেশ মহেন্দ্র আদি দেবগণ,
তোমার বিরাট অঙ্গে বিরাজিত,
অনন্ত অনন্ত কোটী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গম
ছাইয়া রোয়েছে তোমার শরীর ;
গন্ধর্ব্ব, মানব, নাগ, কিন্নর, দানব,
যক্ষ, রক্ষঃ, দেব, দৈত্য
দেহে তব করে বিচরণ ;
স্থাবর জঙ্গম পর্ব্বত প্রদেশ,
রাজা, রাজ্য, প্রলম্বিত তব অঙ্গে।
বর্ণিতে তোমার এ অনন্তরূপ,
ক্লান্ত এ রসনা মম।
আমি যে দুর্ব্বল শিশু—
এ বিরাট মূর্ত্তি তব,
নাহি পারি আর করিতে দর্শন।
শঙ্কিত হোয়েছে প্রাণ।

ধর প্রভো! পুনঃ সেই চতুর্ভুজরূপ
প্রীতি শান্তি আসে যাহে প্রাণে।

নারা। হের ধ্রুব চতুর্ভুজ রূপ পুনঃ,
দিব্য দৃষ্টি তব করি আকর্ষণ।

ধ্রুব। কিবা সুনীল সুন্দর মুরতি মধুর,
কিবা রাজীব চরণে বাজিছে নূপুর।
কিবা চন্দন চর্চ্চিত, তুলসী শোভিত,
পদ অরবিন্দে, নখ ইন্দু বিরাজিত।
কিবা পীতবাস ছটা, কটিতটে রাজে,
কিবা নিতম্বশোভিত কাঞ্চিদাম সাজে।
কিবা মোহন বনমালা দুলিতেছে গলে,
কিবা কৌস্তভ রতন উরসে উজলে।
কিবা বাহুতে বলয়, শ্রবণে কুণ্ডল,
কিবা কিরীটবেষ্টিত মস্তক মণ্ডল।
কিবা উষার হাসিটি অধরে প্রকাশে,
কিবা আননসরসে আঁখিপদ্ম ভাসে।
কিবা বামে বিরাজিত সাগরনন্দিনী,
করুণনয়না জগতপালিনী।
জয় শ্রীবৎসলাঞ্ছন, জয় চতুর্ভুজ,
দেহ ধ্রুবদাসে চরণ অম্বুজ।

নারা। বৎস ধ্রুব! জগতের মহাবীর,
পঞ্চম বরষে ষাণ্মাসিক তপস্যার বলে,
যেই ভক্তিবীজ আজি রোপিলে ধরায়,
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে,
অঙ্কুরিত হোয়ে তাহা,
বৃক্ষে হবে পরিণত;
অমৃত পূরিত ফল তার
সাধুগণ করিয়া ভক্ষণ
আনন্দে উন্মত্ত হবে।
হরিনাম স্রোতে জগৎ প্লাবিবে।

তোমার আদর্শ করিয়া দর্শন,
সহস্র সহস্র ভক্ত জন্মিবে ধরায় ;
তোমার চরিত্র যথা হইবে কীর্ত্তন,
সেই স্থান পুণ্যময় তীর্থ-সম হবে।
তোমার চরিত্র যেবা করিবে শ্রবণ,
পুর্ণিমার জ্যোৎস্নার সম,
হৃদয় তাহার হইবে নির্ম্মল।
হের বৎস! হের ঐ ধ্রুবলোক,
সপ্তর্ষি মণ্ডল, ধর্ম্ম, অগ্নি,
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, তারকাদি সহ,
ঐ স্থান নিরন্তর করে প্রদক্ষিণ।
ঐ স্থান তব তরে হোয়েছে নির্ম্মিত ;
এ অবধি কেহ কভু ঐ স্থানে করে নি গমন,

ধ্রুব। (মাকে ছেড়ে) আমি যাব না একা ধ্রুবলোকে।
মা যে প্রাণে বাঁচিবে না আমার শোকে॥
মা যে আমার হরি পরম গুরু,
তাঁর পুণ্যে পেয়েছি তোমায় কল্পতরু,
কেমন কোরে এমন মাকে,
ছেড়ে যাব ধ্রুবলোকে,
মাকে ছাড়িলে, ডুবিব আমি ঘোর নরকে॥
দয়ার উপর কর হে দয়া,
দাও হে মাকে চরণ ছায়া,
এই শেষ কৃপা হরি কর হে বালকে॥
আমি থাক্‌বো মার কাছে সদা,
তুমি থাক্‌বে আমার হৃদে বাঁধা,
আমি উঠ্‌ব একবার মার কোলে,
আবার ঝাঁপ দিব তোমার পদমূলে,
রাখ্‌বো তোমায় রাখ্‌বো মাকে, সদা আমার চোকে চোকে॥

নারা। মাতৃভক্তি হেরি তোর তুষ্ট হনু আমি,
ধন্য জননী তব—মাতৃভক্ত হেন শিশু

গর্ভে যেবা কোরেছে ধারণ।
পিতৃ মাতৃ ভক্তি যার নাহিক হৃদয়ে,
পরম ভকত হয় যদিও সে জন,
জন্ম জন্ম সাধনেও নাহি পায় মম দরশন।
পিতা মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা;
হেন দেবতায় যেবা করে আরাধনা,
সহজেই তারে আমি দিই দরশন।
পিতৃমাতৃভক্তি, ভগবানে ভক্তির কারণ।
মাতৃভক্তিবলে তুমি পেয়েছ আমায়,
মাতৃভক্তিবলে তুমি পাবে ধ্রুবলোক;
তোমার বিমান সনে, আসিবে বিমান এক
তোমার জননী তরে, মাতা পুত্রে তথা,
কল্পান্ত অবধি করিবে নিবাস।

ধ্রুব। আর এক ভিক্ষা চাই প্রভো।

নারা। কি ভিক্ষা বৎস?

ধ্রুব। তোমারে ছাড়িয়া
ক্ষণমাত্র থাকিতে না চায় প্রাণ।
এই ভিক্ষা দাও প্রভো।
কাতর অন্তরে
যখনই ডাকিব তোমায়,
পাই যেন তখনই দেখিতে।
বিষয় বাসনা ত্যজি, ঐ শ্রীচরণে
সদা যেন লিপ্ত থাকে মন।
অন্তর হইতে মম হোয়োনা অন্তর।

নারা। তথাস্তু বৎস!
যখনই ডাকিবে—তখনই দিব দেখা।

ধ্রুব। প্রণমি চরণে প্রভো! প্রণমি মা জগৎ জননী।

(লক্ষ্মী নারায়ণের প্রস্থান)

ধ্রুব। কোথা হরি পদ্মপলাশলোচন
দাও দরশন।

(লক্ষ্মী নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ)

নারা। আবার ডাকিলে কেন বৎস ?

ধ্রুব। জান না কি তুমি, আমার সনে কোরেছ কত লুকোচুরি,
আমিও খেলিব হরি, তোমার সনে সেই চাতুরী।
ভালবাস কি, না বাস,
ডাক্‌লে কাছে আস কি না আস,
পুরাও কিনা ভক্ত আশা তাই পিছু ডেকেছি হরি॥
চরণে কোরেছি দোষ,
কোরোনা কোরোনা রোষ,
ভক্ত অপরাধ তুমি কর ক্ষমা ভূরি ভূরি।

নারা। বেঁধেছ কঠিন ডোরে,
আর না ছাড়িব তোরে,
ডাকিবি আমায় যতবার,
জুড়াবে তত প্রাণ আমার ;
আমি আসিব, চুমিব, হেরিব ঐ মুখচন্দ্র মাধুরী।

ধ্রুব। সুধাবিন্দু, ঢালে ইন্দু, প্রাণসিন্ধু নাচে উথলে।
জ্যোতিঃস্রোত, অবিরত, সিন্ধুনীরে বিম্ব নিকলে॥
চরণ ইন্দু ছুঁইতে প্রাণ,
উথলি হইছে ধাবমান,
করুণাকণা কর হে দান, বাঁধা থাকি যেন পদতলে॥
আমি চাই না মুক্তি, চাই গো ভক্তি,
আমি মিশ্‌বো না তোমাতে,
থাক্‌বো পৃথক্ তোমা হোতে,
ধোব্‌বো রাঙ্গা চরণ শিরে,
ধোব চরণ আঁখি নীরে,
সেই সুখেতে ভাস্‌বো সদা প্রাণ সিন্ধু জলে॥

(একদিক দিয়া গাইতে গাইতে ধ্রুবের ও অন্য দিক দিয়া ধীরে ধীরে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তাহার (এরূপ বলিবার) প্রয়োজন কি ?

সহ গ্রহণের প্রয়োজন এই যে, সহ অর্থাৎ একত্রীভূত বর্ণ সমূহের, যাহাতে সংযোগ সংজ্ঞা হয়, এক একটী বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা না হয়। যেমন অন্যত্র হইয়া থাকে।

সেইটী যেমন অন্যান্য স্থলেও, যেথানে একত্র মিলিত শব্দ সমূহের কার্য্য করিতে হইবে, সেই স্থলে 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হয়। তাহার উদাহরণ যথা ;—"সহসুপা। ২।১।৪।" (সুবন্তের সহিত সুবন্তের সমাস হইয়া থাকে) উভে অভ্যস্তং সহ। ৬।১।৫। (১) ইত্যাদি সূত্রে, সমুদায়ে মিলিত হইয়া কার্য্য হইবার জন্য 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে।

যদি এক একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ রূপে, সংযোগ সংজ্ঞা হয় ; তাহা হইলেই বা কি দোষ হয় ?

নির্য্যায়াৎ (নির্—যা+[লিঙ্এর] যাৎ) নির্বায়াৎ (নির্—বা+[লিঙ্এর] যাৎ) ; এই সকল স্থলে, 'রেফ্, যকার' এবং 'রেফ্, বকার' প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে, সংযোগ সংজ্ঞা বিশিষ্ট হওয়াতে ; "বান্যস্য সংযোগাদেঃ ৬।৪।৬৮।" ('ঘু' সংজ্ঞক ধাতু, মা, স্থা, গা, পা প্রভৃতি কতিপয় ধাতু ভিন্ন অন্য সংযোগ-আদি বিশিষ্ট ধাতুর 'আ'কারের স্থানে 'এ'কার হয়, আর্ধধাতুকস্থিত 'ক'ইৎ বিশিষ্ট 'লিঙ্' পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে,'এ'কার প্রাপ্তি হইবে।

সংস্কৃষীষ্ট (সং—স্কৃ+লুঙ্ এর তিপ্ আত্মনেপদ), এই স্থলে, 'অনুস্বার' (হল্ মধ্যে পাঠ হেতু) এবং 'স্কৃ' উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে সংযোগ বিশিষ্ট হওয়াতে, ঋতশ্চ। ৭।৪।৯২। (১) এই সূত্রানুসারে, 'ইট্' আগম প্রসঙ্গ হইবে।

সংস্ক্রিয়ত (সং—স্কৃ+লিঙ্এর ত), এই স্থলে, 'গুণোর্ত্তি সংযোগাদ্যোঃ। ৭।৪।২৯। (২) এই সূত্রানুসারে, গুণ প্রাপ্তি হইবে।

---

(১) ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(১) ঋকারান্ত ধাতুর ও রুক্, রিক্ এবং রীক্ আগম হয়, যঙ্ এবং যঙ্লুক্ পরে থাকিলে।

(২) ঋ ধাতুর এবং সংযোগ আদি বিশিষ্ট ঋকারান্তরের গুণ হয়, যক্ পরে থাকিলে, যকার আদি বিশিষ্ট আর্ধধাতুক পরে থাকিলে এবং লিঙ্ পরে থাকিলে।

দৃষৎ করোতি, সমিৎ করোতি ইত্যাদি স্থলে, ত এবং ক কার প্রত্যেকে সংযোগ বিশিষ্ট বলিয়া, সংযোগান্তস্যলোপঃ। ৮।২।২৩। (১) এই সূত্রানুসারে 'ত'কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

শক্তা (শক+লুট্, তিপ, তা) বস্তা (বস+তিপ্, তা), প্রভৃতি স্থলে, "স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ। ৮।২।২৯। (২) এই সূত্রানুসারে, 'ক'কার এবং 'স'কারের লোপ প্রাপ্তি হইবে।

নির্যাতঃ (নির–যা+ক্ত), নির্বাতঃ (নির্–বা+ক্ত) এই স্থলে, 'সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বতঃ। ৮।২।৪৩। (সংযোগ আদিবিশিষ্ট আকারান্ত ধাতুর 'যণ' বিশিষ্টের নিষ্ঠার স্থানে 'ন' হয়) এই সূত্রানুসারে নিষ্ঠার স্থানে, নত্ব প্রসঙ্গ হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—নৈষদোষঃ। যত্তাবদুচ্যতে ইহ তাবন্নির্যায়াৎ নির্বায়াৎ' বান্যস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং প্রসজ্যেতেতি। নৈবং বিজ্ঞায়তে। সংযোগ আদির্যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগৌ আদী যস্য সোয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি। এবং তাবৎ সর্বমাঙ্গং পরিহৃতম্।

ভাষানুবাদ।—ইহা কখনও দোষ নহে। কারণ, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—নির্যায়াৎ নির্বায়াৎ ইত্যাদি স্থলে, "বান্যস্য সংযোগাদেঃ।" এই সূত্রানুসারে 'এ'ত্ব—প্রসঙ্গ হইবে; তাহা হইবে না। কারণ, এইরূপ জানিবেন না যে, 'সংযোগ' হইয়াছে আদি যার, সে, 'সংযোগাদি', তাহার সংযোগাদির।

তবে কিরূপ?

সংযোগদ্বয় হইয়াছে আদি যার, সে, 'সংযোগাদি', তাহার 'সংযোগাদেঃ'। অতএব 'নির্যায়াৎ' প্রভৃতি স্থলে, 'রেফ্' এবং 'য'কার উভয়ই সংযোগ সংজ্ঞা-বিশিষ্ট হইলেও, উভয়েই ধাতুর অবয়ব বিশিষ্ট সংযোগদ্বয় হয় নাই। কারণ, রেফ্‌টী উপসর্গের অবয়ব। সুতরাং 'এ'ত্বও হইবে না।

এইরূপে যাবতীয় আঙ্গ কার্য্য পরিহার (দোষোদ্ধার) করা হইল।

ভাষ্যমূলম্।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ দৃষৎ করোতি সমিৎ করোতি। সংযোগান্তস্যেতি লোপঃ প্রসজ্যেতেতি॥ নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগোঽন্তো যস্য তদিদং সংযোগান্তং সংযোগান্তস্যেতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগাবন্তৌ যস্য তদিদং সংযোগান্তং সংযোগান্তস্যেতি।

(১) (২) ইহাদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ভাষ্যানুবাদ।—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে যে,—'দৃষৎ করোতি', 'সমিৎ-করোতি', এই সকল "সংযোগান্তস্যলোপঃ।" এই সূত্রানুসারে, 'ত'-কারের লোপপ্রসঙ্গ প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইবে না। কারণ, এইরূপ মনে করিবেন না যে, সংযোগ হইয়াছে অন্তে যাহার সে সংযোগান্ত, তাহার 'সংযোগান্তের।

তবে কি?

সংযোগদ্বয় অন্তে আছে যাহার, সে সংযোগান্ত, তাহার—'সংযোগান্তের'। অতএব 'দৃষৎকরোতি'র 'ত'কার একটী সংযোগ হওয়াতে 'লোপ' হইল না।

ভাষ্যমূলম্।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ শক্তা বস্তেতি স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি লোপঃ প্রসজ্যতেতি॥ নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগাবাদী সংযোগাদী সংযোগাদ্যো-রিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগয়োরাদী সংযোগাদী সংযোগাদ্যোরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—যাহা বলা হইয়াছে যে, 'শক্তা' 'বস্তা' এই সকল স্থলে, "স্কোঃ সংযোগাদ্যোঃ" এই সূত্রানুসারে, যথাক্রমে 'ক'কার এবং 'স'কারের লোপ হইবে; তাহাও হইবে না। কারণ, ইহা কখনও মনে করিবেন না যে, সংযোগদ্বয় বিশিষ্ট যে আদি, সে সংযোগাদি, তাহাদের—'সংযোগাদিদের'।

তবে কি?

সংযোগদ্বয়ের যে আদি সে সংযোগাদি তাহাদের—'সংযোগাদিদের'॥ অতএব 'শক্তা' 'বস্তা' ইহাদের 'ক'কার এবং 'স'কার ইহারা সংযোগাদি হইলেও দুইটী সংযোগের আদি না হওয়াতে, লোপও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ নির্যাতো নির্বাত ইতি সংযোগাদে-রাতো ধাতোর্যণ্বত ইতি নিষ্ঠানত্বং প্রসজ্যেতিতি। নৈবং বিজ্ঞায়তে সংযোগ আদির্যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি॥ কথং তর্হি॥ সংযোগাবাদী যস্য সোঽয়ং সংযোগাদিঃ সংযোগাদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আর পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে যে,—'নির্যাতঃ', 'নির্বাতঃ' এই সকল স্থলে, 'সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বতঃ'। ৮।২।৪৪। এই সূত্রানু-সারে, নিষ্ঠা অর্থাৎ 'ক্ত' এবং 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত'কারের 'ন'ত্ব প্রসঙ্গ হইবে।

এই স্থলেও দোষ হইবে না। কারণ, এইরূপ মনে করিবে না যে, সংযোগ আছে আদিতে যার, সে সংযোগাদি, তাহার সংযোগাদির।

তবে কি?

সংযোগদ্বয় আছে আদিতে যার, সে সংযোগাদি, তাহার সংযোগাদির। এইরূপ হইলে, নির্বাতঃ প্রভৃতির, 'রেফ্' এবং 'ব'কার, উভয়ে প্রত্যেকে সংযোগ হইলেও, সংযোগদ্বয় (ধাতুর) না হওয়াতে 'ন'ত্ব হইবে না। কোন দোষও হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—কথং কৃত্বা একৈকস্য সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্নোতি॥ প্রত্যেকং বাক্যপরিসমাপ্তিদৃষ্টেতি। তদ্যথা বৃদ্ধিগুণ সংজ্ঞে প্রত্যেকং ভবতঃ।

নন্ু চায়মস্তি দৃষ্টান্তঃ। সমুদায়ে বাক্য পরিসমাপ্তি রিতি। তদ্যথা। গর্গাঃ শতং দণ্ড্যন্তাম্। অর্থিনশ্চ রাজানো হিরণ্যেন ভবন্তি। ন চ প্রত্যেকং দণ্ডয়ন্তি। সত্যে তস্মিন্ দৃষ্টান্তে যদি তত্র প্রত্যেক মিত্যুচ্যতে ইহাপি সহগ্রহণং কর্ত্তব্যম্॥ অথ তত্রান্তরেণ প্রত্যেকমিতিবচনং প্রত্যেকং গুণবৃদ্ধিসংজ্ঞে ভবতঃ। ইহাপিনার্থঃ সহগ্রহণেন।

ভাষ্যানুবাদ।—কেমন করিয়া এক একটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে?

তাহা, যেমন করিয়া (অ, এ, ও, এবং আ, ঐ, ঔ র প্রত্যেক বর্ণের) গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়াছিল।

যদি বল যে, সমুদায়ে বাক্য পরিসমাপ্তিরও ত এই দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; যেমন—"গর্গবংশীয় জনগণকে, শতমুদ্রা দণ্ড কর," রাজগণ এইরূপ আদেশ করিলে, যদিও রাজগণ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন বটে, তথাপি গর্গবংশের প্রত্যেকটী লোকের নিকট শতমুদ্রা দণ্ডবিধান করেন না। (কিন্তু সকলকে মিলিয়া শতমুদ্রা দণ্ডবিধান করেন)।

অতএব এইরূপ উভয় প্রকারের দৃষ্টান্ত সত্ত্বে, যদি সেই স্থলে ('বৃদ্ধিরাদৈচ' সূত্রে) 'প্রত্যেকে'র (আ, ঐ, ঔর পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাবোধ হইবার জন্য) গ্রহণ করা হয়, তবে এই স্থলেও (একত্র মিলিত বর্ণ সমূহের সংযোগ সংজ্ঞা বোধ হওয়ার জন্য) 'সহ' শব্দের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আর যদি সেই স্থলে, "প্রত্যেক" এই শব্দের গ্রহণ বিনাই যদি প্রত্যেক বর্ণের গুণ এবং বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইয়া থাকে, তবে, এই স্থলেও 'সহ' শব্দ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।

ভাষ্যমূলম্।—অথ যত্র বহূনামানন্তর্য্যম্। কিং তত্র দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগ সংজ্ঞা ভবতি। আহোস্বিদবিশেষেণ॥ কশ্চাত্র বিশেষঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে, জিজ্ঞাস্য এই যে, যেখানে অনেক বর্ণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, সেখানে দুই দুইটী বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা

হইবে, অথবা অবিশেষ রূপে অর্থাৎ একটী, দুইটী, বা একত্র মিলিত সমুদায় বর্ণের সংজ্ঞা হইবে?

এস্থলে এরূপ দুইপক্ষ করাতে বিশেষ কি হইবে?

বার্ত্তিকমূলম্।—সমুদায়ে সংযোগাদিলোপো মস্জেঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ। সমুদায় বর্ণ একত্র মিলিত হইয়া সংযোগ সংজ্ঞা হইলে সংযোগের আদিভূত 'মস্জ' ধাতুর 'স'কার লোপ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—সমুদায়ে সংযোগাদি লোপো মসজের্ণসিদ্ধ্যতি। মঙ্‌ক্তা। মঙ্‌ক্তুম্।

ইহ চ নির্গ্লেয়াৎ নির্ম্লায়াৎ নিগ্লেয়াৎ নির্ম্লায়াৎ। বান্যস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ সংস্বরিষীষ্টেতি ঋতশ্চ সংযোগাদেরিতীট্ ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ সংস্বর্য্যতে ইতি গুণোর্ত্তি সংযোগাদ্যোরিতি গুণো ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ গোমান্ করোতি যবমান্ করোতীতি সংযোগান্তস্য লোপঃ ইতি লোপো ন প্রাপ্নোতি।

ইহ চ নির্গ্লানো নির্ম্লান ইতি সংযোগাদেরাতোধাতো র্যণ্বত নিষ্ঠানত্বং ন প্রাপ্নোতি।

অস্তু তর্হি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগ সংজ্ঞা।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি একত্র মিলিত সমুদায় বর্ণে সংযোগ সংজ্ঞা হয়, তবে সংযোগের আদিভূত 'মস্জ' ধাতুর 'স'কারের লোপও সিদ্ধ হইবে না। যেমন, মঙ্‌ক্তা (টুমস্জো শুদ্ধৌ, এই 'মস্জ' ধাতুর উত্তর, লুটএর 'তিপ্'এবং তদনন্তর 'ডা' প্রত্যয় করিলে, "মস্জিনশোর্ঝলি। ৭।১।৬০।" এই সূত্রানুসারে, ঝল্ অন্তর্গত অর্থাৎ 'তা' পরে থাকাতে, 'মস্জ' ধাতুর 'ম'কার স্থিত অকারের পরে, নুম্ আগম হইয়াছে। অর্থাৎ 'মন্‌স্জ তা' এইরূপ স্থিতি হইয়াছে। এক্ষণে এই 'ন্‌স্জ্' একত্র মিলিত তিনটী বর্ণের যদি, সংযোগ সংজ্ঞা বলা হয়, তবে, 'স'কার, সংযোগের 'আদি' না হইয়া, 'মধ্য' হওয়াতে, "স্কোঃ সংযোগাদ্যোরন্তে চ।' এই সূত্রানুসারে, 'স'কারের লোপ হইবে না), মঙ্‌ক্তুম্ (পূর্ব্ববৎ, 'তুমন্' প্রত্যয় মাত্র বিশেষ) এই সকল স্থলে 'স'কারের লোপ হইবে না। প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে না।

আর, নির্গ্লেয়াৎ, নির্ম্লায়াৎ (নির্—গ্লা ধাতু, আশীর্লিঙ্, যাসুট্ 'তিপ্'); নির্গ্লেয়াৎ, নির্ম্লায়াৎ (নির্—ম্লা+যাসুট্, তিপ্) এই স্থলে, (ম্লা এবং গ্লা ধাতু

সংযোগবিশিষ্ট হইলেও 'ম্লা' এবং 'ম্লা'এর রেফটী ধাতুর রেফ না হইয়া উপসর্গের হওয়াতে) বান্যস্য সংযোগাদেঃ' সূত্রানুসারে, 'এ'কার প্রাপ্তি হইবে না।

আর, সংস্বরিষীষ্ট (সং—স্বৃ+লঙ্ ত) এই স্থলে, 'সং'উপসর্গের অনুস্বার এবং ধাতুর 'স'কার 'ব'কার একত্র সংযোগ হওয়াতে) 'ঋতশ্চ সংযোগাদেঃ' এই সূত্রানুসারে, ইট্‌প্রাপ্ত হইবে না।

আর, সংস্বর্য্যতে (সং—স্বৃ+ত, আত্মনেপদ) এই স্থলে, (উপসর্গের 'সং'এর অনুস্বারের সহিত 'স্বৃ' ধাতুর 'স'কার মিলিত হওয়াতে, 'স'কার সংযোগের আদি হইবে না বলিয়া) 'গুণোর্ত্তি সংযোগাদ্যোঃ' সূত্রানুসারে, গুণপ্রাপ্তি হইবে না।

আর গোমান্‌করোতি (গোমৎ শব্দের উত্তর, প্রথমার একবচনে 'নুম্' আগমন করিলে, যখন 'গোমন্ত্' এইরূপ স্থিতি হইবে; তখন তাহার সহিৎ 'করোতি' শব্দ যোগ করিলে, 'ন্ৎক' এই তিন বর্ণ একত্র সংযোগ হওয়াতে, 'ৎ'কার, সংযোগের অন্ত না হওয়াতে) এবং যবমান্ করোতি (যবমৎ শব্দ) এই স্থলে, "সংযোগান্তস্যলোপঃ" এই সূত্রানুসারে, ('ত'কারের) লোপ প্রাপ্তি হইবে না।

আর, 'নির্ম্লানঃ' (নির—ম্লৈ+ক্ত), নির্ম্লানঃ (নির্—ম্লৈ+ক্ত) এইস্থলে, "সংযোগাদেবাতোধাতোর্যণ্বতঃ" এই সূত্রানুসারে 'নিষ্ঠা'স্থিত 'ক্ত' প্রত্যয়ের 'ণ'ত্ব প্রাপ্তি হইবে না। কিন্তু দুই দুইটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, এই সকল স্থলে, কোনও দোষ হইবে না।

আচ্ছা তবে, দুই দুইটী বর্ণেরই সংযোগ সংজ্ঞা হউক্।

বার্ত্তিকমূলম্।—দ্বয়োর্হলোঃ সংযোগ ইতিচেদ্দ্বির্বচনম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—দুইটী ব্যঞ্জনের যদি সংযোগ সংজ্ঞা হয়, তবে, দ্বিত্ব কার্য্য হইবে না।

বার্ত্তিকানুবাদ।—দ্বয়োর্হলোঃ সংযোগ ইতিচেদ্দ্বির্বচনং ন সিধ্যতি। ইন্দ্রমিচ্ছতি ইন্দ্রীয়তি। ইন্দ্রিয়তেঃ সন্। ইন্দিদ্রীয়িষতি। নন্দ্রাঃ সংযোগাদয় ইতি দকারস্য দ্বির্বচনং ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—দুই দুইটী ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ সংজ্ঞা হইলে, অবশ্য কর্ত্তব্য দ্বিত্ব স্থলে, দ্বিত্ব সিদ্ধ হইবে না। যেমন;—'ইন্দ্রকে ইচ্ছা করে' (এইরূপ বাক্যে, 'ইন্দ্র' শব্দের উত্তর, ইচ্ছার্থে 'ক্যচ্' প্রত্যয় করিলে) ইন্দ্রীয়তি। (এক্ষণে, 'সনাদ্যন্তাধাতবঃ' বলিয়া তাহার ধাতু সংজ্ঞা হইলে)

'ইন্দ্রীয়তি'র উত্তর 'সন্' প্রত্যয় করিলে, পুনঃ 'ইন্দিদ্রীয়িষতি' প্রয়োগ হইল। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, 'ইন্দ্র' শব্দের 'ন্দ্র'এর দুই দুই-বর্ণ মিলিয়া পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা হওয়াতে, 'ন্ দ্' এক সংযোগ এবং 'দ্ র্' আর এক সংযোগ হইয়াছে। সুতরাং 'দ'কারও, সংযোগের আদিভূত হওয়াতে, 'সন্' প্রত্যয় পরে থাকাতে, 'দ'কারের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে না। কারণ, 'নন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ঃ। ৬।১।৩। (১) এই সূত্রানুসারে, (সংযোগাদি দ্বিত্ব নিষেধ করে বলিয়া) 'দ'কারের দ্বিত্ব প্রাপ্তি হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বাজ্বিধেঃ।

বার্ত্তিকানুবাদ।—অথবা 'অচ্' বিধি হওয়াতে, দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ। কিং কারণম্। অজ্বিধেঃ। ন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ো ন দ্বিরুচ্যন্তে। অজাদেরিতি বর্ত্ততে।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা ইহা কোনও দোষ নহে।

কি কারণে ?

অচ্ বিধান হেতু। অর্থাৎ 'অচ্'কে আশ্রয় করিয়া দ্বিত্ব নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া। 'নন্দ্রাঃ সংযোগাদয়ঃ। ৬।১।৩। (অচ্ এর পরস্থিত সংযোগের আদিভূত, ন, দ, এবং র এর দ্বিত্ব হয় না) এই সূত্রে, সংযোগের আদিভূত ন, দ, এবং র এর দ্বিত্ব নিষেধ করা হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই স্থলেই "আদি 'অচ্' এর পরস্থিত" এরূপ বাক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং 'ইন্দ্র' শব্দের আদি 'অচ' 'ই'কারের অব্যবহিত পরে 'দ'কার না থাকিয়া 'ন'কার ব্যবধান থাকাতে, 'দ'কারের দ্বিত্ব নিষেধ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথ যত্রৈবং বহূনাং সংযোগ সংজ্ঞা তথাপি দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ কিং গতমিয়তা সূত্রেণ। আহোস্বিদন্যতরস্মিন্পক্ষে ভূয়ঃ সূত্রং কর্ত্তব্যম্॥

গতমিত্যাহ॥ কথম্॥

যদা তাবদ্বহূনাং সংযোগ সংজ্ঞা তদৈবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে। অবিদ্যমান-মন্তরমেষামিতি॥ যদা দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সংযোগ সংজ্ঞা তদৈবং বিগ্রহঃ করিষ্যতে। অবিদ্যমানা অন্তরা এষামিতি। দ্বয়োশ্চৈবান্তরা কশ্চিদ্বিদ্যতে বা ন বা।

এবমপি বহূনামেব প্রাপ্নোতি। যান্ হি ভবানন্তরষষ্ঠ্যা প্রতি নির্দ্দিশতি এতেষামন্তেন ব্যবায়েন ভবিতব্যম্।

(১) অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণের পর, সংযোগের আদিভূত যে, ন, দ এবং র, তাহার দ্বিত্ব হয় না।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি এই প্রকারই হয়, তবে এক্ষণে এইরূপ বলিব যে,—হয় বহুবর্ণ একত্র মিলিতেরই সংযোগ সংজ্ঞা, অথবা দুই বর্ণেই পৃথক্ পৃথক্ সংযোগ সংজ্ঞা। অর্থাৎ দুই পক্ষের, যে কোন এক পক্ষই হউক্! উভয়ই সঙ্গত।

এই একটী সূত্রের দ্বারাই কি ইহা চরিতার্থ হইল? অথবা অন্যতর পক্ষে পুনঃ পুনঃ সূত্র করা কর্ত্তব্য হইবে?

এই এক সূত্র দ্বারাই গত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কার্য্য শেষ হইবে।

কিরূপে?

যখন সেখানে বহুবর্ণের মিলিত হইলে সংযোগ সংজ্ঞা হইবে,—সেখানে এইরূপ বিগ্রহ অর্থাৎ সমাসের ব্যাসবাক্য করা হইবে যে,—বিদ্যমান নাই অন্তর (কাল) যাহাদের তাহারা—'অনন্তরাঃ'। আর যখন দুই দুইটীর সংযোগ সংজ্ঞা হয়, সেখানে এইরূপ বিগ্রহ করা হইবে যে,—বিদ্যমান নাই অন্তরা (বর্ণান্তর দ্বারা ব্যবধান) ইহাদিগের—তাহারা "অনন্তরা"। অতএব দুই বর্ণের মধ্যে, কোনও অন্য বর্ণ ব্যবধান থাকিতেও পারে, না ও থাকিতে পারে।

এইরূপ হইলেও অনেক বর্ণ মিলিতের সংযোগ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কারণ, আপনি যে হেতু এই বিগ্রহে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ—বিগ্রহ বাক্যের শেষে যে "এষাং" এইরূপ ষষ্ঠীর বহুবচন করিয়াছেন, তাহা যাহাতে অন্যের (বর্ণান্তরের) দ্বারা ব্যবধান হইতে পারে; এই জন্যই করিয়াছেন। কারণ, 'এষাং' এইরূপ বহুবচন নিষ্পন্ন শব্দ একবর্ণ ব্যবধান থাকিলে হইতে পারে না।

ভাষ্যমূলম্।—অস্তুর্তহি সমুদায়ে সংজ্ঞা। ননুচোক্তং সমুদায়ে সংযোগাদিলোপো মস্জেরিতি॥ নৈষদোষঃ। বক্ষ্যত্যেতৎ। অন্ত্যাৎপূর্ব্বো মস্জেমিদনুষঙ্গ সংযোগাদিলোপার্থমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—আচ্ছা তবে সমুদায় বর্ণেই (সংযোগ) সংজ্ঞা হউক্! যদি বল যে, সমুদায়ে সংযোগ সংজ্ঞা হইলে 'মস্জ' ধাতুর সংযোগের আদিভূত বর্ণের (সকারের) লোপ সিদ্ধ হইবে না?

এই স্থলেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, এই কথা বলা হইবে যে, 'মস্জেরন্ত্যাৎপূর্ব্বোনুম্বাচ্যঃ' ('মস্জ' ধাতুর অন্ত্য[illegible] পূর্ব্ববর্ণে, 'নুম্' আগম হয়; এইরূপ বলা কর্ত্তব্য)। অনুষঙ্গ অর্থাৎ [illegible] এবং সংযোগের আদি বর্ণের লোপের জন্যই এই 'ম' ইৎ বিশি[illegible] 'নুম্' আগ[illegible] করা হইয়াছে।

পওহারী বাবা

অনেকে আজকাল বলিয়া থাকেন, নিজের মুক্তিলাভের চেষ্টা করা স্বার্থপরের কার্য্য। সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া জগতের যাহাতে হিত হয়, তাহার চেষ্টা কর, সংসারসাগরে ঝম্পপ্রদান করিয়া ইহার দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট হও। পরোপকারই যথার্থ ধর্ম্ম, তাহার সহিত একটু আধটু ঈশ্বরকে ডাক, ভাল। ইহারা ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কার্য্য দেখাইয়া ইহা প্রমাণ করিতে চান। কিন্তু তাঁহারা এইটী ভুলিয়া যান, সেই কার্য্যশক্তি কোথা হইতে প্রসূত হয়, তাহার মূলদেশ কোথা। বুদ্ধদেব যে ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই দিকে তাঁহারা একবার ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না।

চিন্তা যত প্রগাঢ় হইবে, কার্য্যও তত অধিক হইবে। সামান্য কার্য্য সাধনে—সামান্য চিন্তার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা জগদ্ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় হইয়া যায়, তাহার মূলে গূঢ় চিন্তাশক্তি, গভীর ধ্যান, গবেষণা অন্তর্নিহিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও দেখুন—কত চিন্তা, কত ধ্যানের পর একটী মত (Theory) আবিষ্কৃত হইল। সেই মতের সহায়তায় আজ জগতে কত নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে—আবার তাহার কত বিভিন্ন প্রয়োগে কত নব নব শিল্পের অভ্যুদয় হইতেছে কিন্তু চিন্তাশক্তি তাহার মূলে না থাকিলে ও সকল কি সম্ভব হইত? যিনি নূতন নূতন ভাবে কোন সত্য কার্য্যে প্রয়োগ করেন, তাঁহার গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি উহা প্রথমে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারই কি এ গৌরব প্রথম প্রাপ্য নহে? রসায়নের Periodical law রূপ theory হইতে আজ কত কত নব মূলপদার্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, আবার কত মূলপদার্থ এখনও আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে, তাহা জানিলে ঐ নিয়মের আবিষ্কর্তাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। গ্রহাবলির গতিবিধি গণনা করিয়া এমন সিদ্ধান্ত হইল যে, আকাশের অমুক স্থানে একটী গ্রহের অবস্থান সম্ভব। তিনি উহা দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তিগণ ঐ স্থানে দূরবীক্ষণ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তথায় একটী নূতন গ্রহের আবিষ্কার করিলেন।

ধর্ম্মরাজ্যেও এই চিন্তার বিশেষ প্রাধান্য। ধর্ম্মরাজ্যে ধ্যানপরায়ণ

পূক[illegible] শুধু [illegible] মত আবিষ্কার করেন না, তাঁহারা সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, আর শুধু যে, কার্য্যে প্রয়োগ করাই উচ্চ গৌরব, তাহা নহে, যে ব্যক্তি যত ধ্যানরাজ্যে বিচরণ করিতে পারেন, যে ব্যক্তি যত সামান্য ইন্দ্রিয়ের রাজ্যের সামান্য সুখ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, তিনি ততদূর মনুষ্যত্বসম্পন্ন। জগৎসমস্যার যদি মীমাংসাই না হইল, তবে গড্ডলিকাপ্রবাহের মত দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ফল কি? এই জন্য অনেক মহাপুরুষ গভীর ধ্যানরাজ্যে বিচরণ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। মহম্মদ এবং ঈশাকেও অনেক দিন চিন্তারাজ্যে বিচরণ করিতে হইয়াছিল। অবশ্য, যাঁহারা কর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া এই উচ্চভাব রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমরা জগতে সর্ব্বদা একপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দর্শন আশা করিতে পারি না।

পাহাড়ী বা পওহারী বাবার কথা বলিবার জন্য এত কথা বলিলাম। বাঙ্গালা সম্বাদপত্রপাঠকগণ মাত্রেই তাঁহার জীবনের শেষ পরিণাম ঘটনা জানেন। কেশব সেন মহাশয়, ইঁহাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, তাহাতেও অনেকে ইঁহার সম্বন্ধে জানিয়াছিল। তাঁহার অভিনীত নববৃন্দাবন নাটকে তিনি পাহাড়ী বাবার নাম অবতারণা করিয়াছিলেন।

পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা বলিব। বারাণসী বিভাগের গুজী-নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতি শৈশব কালেই গাজিপুরে খুড়ার নিকট থাকিয়া পড়িবার জন্য আসেন। ইঁহার খুড়া রামানুজ বা শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন অর্থাৎ আজীবন বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিব, এই ব্রত লইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক গুলি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে ইঁহাকে তিনি পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট থাকিয়া তিনি ব্যাকরণ, ন্যায় শাস্ত্র ও শ্রীসম্প্রদায়সম্মত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন। পড়াশুনায় তিনি খুব মনোযোগী ছিলেন। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ পটুতা প্রকাশ পাইয়াছিল।

কিছু দিন পরে, এক ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় আঘাত লাগে। তাঁহার খুড়াকে তিনি প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন। তাঁহার দেহত্যাগে পওহারী বাবার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অনেকের এরূপ শোক হয়, আবার ভুলিয়া যায়, কিন্তু এই

বালক নিশ্চয় সুকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, জগতে এমন কি বস্তু আছে; যাহার কখনই নাশ হয় না। সেই জিনিষকে লাভ করিতে হইবে।

ইনি গৃহত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। গুরু অন্বেষণ ও জ্ঞানশিক্ষার জন্য তখন তিনি উন্মত্ত। যাঁহাদের হৃদয়ে এই ব্যাকুলতা কখন উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, বালকের তখন মনের কি অবস্থা! তিনি কোথা কোথা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহে (শ্রীসম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থই এই ভাষায় লিখিত) এবং বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে অভিজ্ঞতা দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি দাক্ষিণাত্যে ও বঙ্গদেশে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার বন্ধুগণ বলেন, এই ভ্রমণকালে তিনি গুজরাটান্তর্গত কাটিওয়ার প্রদেশস্থ গিরণার পর্ব্বতে গমন করেন। সেইখানেই তিনি প্রথম যোগসাধনে দীক্ষিত হন। এই গিরণার পর্ব্বতের পাদদেশে রাজা অশোকের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানে অনেক দিন ধরিয়া অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ জঙ্গলাবৃত ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানে বৌদ্ধদের অতি পবিত্র তীর্থভূমি ছিল। জৈনসম্প্রদায় এখনও এই স্থানকে অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। হিন্দুরা বলেন, এখানে মহাযোগী দত্তাত্রেয় বাস করিতেন। এখানে এখনও অনেক সাধু পুরুষ বাস করেন। শুনা যায়, অনেক ভাল ভাল সিদ্ধপুরুষ এই স্থানে গোপনে বাস করেন। দৈবাৎ কখন কখন কোন ভাগ্যবান তাঁহাদের দর্শন পান। পওহারী বাবার ভাগ্যেও এই সিদ্ধসমাগম ঘটিল।

ইহার কিছু কাল পরে ইনি বারাণসীর কিছু দূরে গঙ্গাতীরে এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন। এই সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে একটী গুহা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া যোগ অভ্যাস করিতেন। এই সময়ে তিনি কাশীতে কোন সন্ন্যাসীর নিকট অদ্বৈতবাদও শিক্ষা করেন।

অনেক বর্ষ এইরূপ ভ্রমণ, সাধনা ও শাস্ত্রালোচনার পর ইনি ইঁহার পূর্ব্ববাসস্থান গাজিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেখানে তাঁহার বাল্যকালের বন্ধুগণ তাঁহাকে এইরূপ উন্নত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিল ও শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইল।

তিনি কিন্তু যাহা শিক্ষা করিয়া আসিলেন, তাহার সাধনা ভুলিলেন না, বরং উত্তরোত্তর সাধনায় তাঁহার অনুরাগ আরো বৃদ্ধি পাইল। তিনি তাঁহার বারাণসীধামের গুরুর ন্যায় গঙ্গাতীরে একটী গুহা খনন করিয়া তাহার ভিতরে অনেকক্ষণ থাকিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু পরে তিনি আর এক ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিয়া নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ভোগ দিতেন। রন্ধনকার্য্যে তাঁহার বিশেষ পটুতা ছিল। তার পর সমুদয় ভোগ দীন দুঃখী সকলকে বণ্টন করিয়া দিতেন এবং নানারূপে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। রাত্রি হইলে সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইয়া অপর পারে সমস্ত রাত্রি সাধন ভজন করিতেন। প্রত্যূষেই আবার এ পারে আসিয়া সর্ব্বভূতকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার নিজের আহারও দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। শুনা যায়, তিনি কিছু দিন গোটা কতক নিম পাতা বা লঙ্কা খাইয়া থাকিতেন। ক্রমশঃ তিনি গঙ্গার অপর পারে সাধনার্থে গমন না করিয়া গুহার মধ্যেই গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতে লাগিলেন। শুনা যায়, কখন কখন মাসাবধি ধরিয়া তিনি গুহায় সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। এত দীর্ঘকাল তিনি কি খাইয়া থাকিতেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। তাই লোকে তাঁহার নাম পওহারী বাবা দিল। 'পওহারী' শব্দের অর্থ, পবনভোজী বা শূন্য আহারী।

তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি এই গুহায়ই কাটাইয়াছিলেন। একবার তিনি এত দীর্ঘকাল গুহাভ্যন্তরে ছিলেন যে, লোকে স্থির করিল, তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। অনেক দিন পরে তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া সাধুদিগকে এক ভাণ্ডারা দিলেন। ভাণ্ডারা অর্থে সাধুভোজন।

যখন তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন না, তখন তিনি গুহার উপরিভাগস্থ এক গৃহে বাস করিতেন। তখন লোকজনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। চারিদিকে তাঁহার যশ বিস্তৃত হইতে লাগিল। কেশবসেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয়ের কথা অনেকেই জানেন। তিনি পওহারী বাবাকে একজন উচ্চদরের সিদ্ধযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কেশববাবুর নিকট হইতে তিনি একখান পরমহংসদেবের ফটো পাইয়াছিলেন। ইহা তিনি অতি যত্ন সহকারে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসদেবকে অবতার বলিয়া উল্লেখ

করিতেন। পরমহংসদেবের শরীর ত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার অনেক শিষ্য ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

পরমহংসদেব বলিতেন, ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আপনি আসিয়া ফুলে বসে—ফুলকে আর ভ্রমর ডাকিতে যাইতে হয় না। আরও তিনি বলিতেন, আপনি ভগবানের ভজন করিলেই যথেষ্ট প্রচার কার্য্য হয়। ইঁহার জীবনে এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। দিন রাত ইঁহার ভগবৎসাধন—অন্য কর্ম্ম নাই—তাই কত কত অনুরাগী ব্যক্তি একবার মাত্র তাঁহার সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইয়া যাইত।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার ইঁহাকে বলেন, আপনি কেন সংসারে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা জীবের কল্যাণ সাধন করেন না? তাহাতে তিনি প্রথমে একটী গল্প বলেন;—

একটী দুর্ব্বৃত্ত লোক কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া ধরা পড়ে। যে ধরিল, সে তাহার শাস্তিস্বরূপ তাহার নাক কাটিয়া দিল। তখন সে সমাজে মুখ দেখাইতে অতিশয় লজ্জা বোধ করিয়া এক জঙ্গলে গিয়া একখানি বাঘছাল বিছাইয়া বসিয়া রহিল। যখনই কেহ নিকটে আসিত, তখনই সে ধ্যানের ভাণ করিত। কাহারও সহিত কথা কহিত না। তাহাকে পরম সাধু মনে করিয়া দলে দলে তাহার নিকট লোক আসিতে লাগিল—সকলেরই ইচ্ছা, তাঁহার নিকট কিছু উপদেশ শ্রবণ করে। শেষে এক যুবক তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। কোন রূপে তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া সে তাহাকে বলিল, কাল অতি প্রত্যূষে একখানি শাণিত ক্ষুর লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। যুবক অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাই করিল। তখন ঐ ভণ্ড সাধু তাহাকে অরণ্যের এক নিভৃত প্রদেশে লইয়া গিয়া খাপ হইতে ক্ষুর খানি বাহির করিয়া এক কোপে তাহার নাকটী কাটিয়া দিল ও গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি এই দীক্ষা পাইয়াছি; তোমাকেও সেই দীক্ষা দিলাম। তুমিও সুবিধা পাইলে অপরকে এই দীক্ষা দিতে ছাড়িবে না।" যুবক লজ্জায় আর তাহার সেই দীক্ষার বিষয় লোকের নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না। বরং সাধ্যমত গুরুর উপদেশ পালন করিতে লাগিল। এইরূপে একদল নাককাটা সাধুসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল। তুমি কি আমাকে এইরূপ আর একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে বল?"

অন্য সময়ে আর এক প্রশ্নের উত্তরে এ সম্বন্ধে যথার্থ নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "তুমি কি মনে কর, শরীরের দ্বারা লোকের উপকারই একমাত্র উপকার? শরীরের সহায়তা ব্যতীত কেবল মন দ্বারা একজন কি অপরের উপকার করিতে পারে না?"

আর এক সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি এত বড় যোগী হইয়াও নিম্নাধিকারিগণের জন্য বিহিত হোম, পূজা প্রভৃতি কর্ম্ম করেন কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দেন, সকলেই যে নিজের জন্য কর্ম্ম করে, এ কথা মনে করিতেছ কেন? এমন কি হইতে পারে না যে, একজন অপরের জন্য কর্ম্ম করিতেছে?

একজন চোর একবার তাঁহার আশ্রমে চুরীর অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল। তাঁহার ঠাকুর ঘরের সমুদয় তৈজস সংগ্রহ করিয়া সে পলায়ন করিতেছিল—এমন সময়ে তাঁহাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া সব ফেলিয়া পলায়ন করে। তিনি অমনি সেই পুঁটলিটী লইয়া চোরের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনেক দূর দৌড়িয়া চোরের নাগাল পাইয়া তাহাকে সেই বুঁচকীটী দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, আমায় ক্ষমা করিবেন আমি আপনার কার্য্যে ব্যাঘাত দিয়া অন্যায় করিয়াছি। এ সব আপনার, আমার নহে। এই বলিয়া তাহাকে ঐ গুলি লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়েরা কি ইহাকে পাগ্‌লামী বলিবেন, না, কি বলিবেন? চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া হইল বলিয়া মহা চটিয়া উঠিবেন না ত? আমরা চোর সন্দেহেই কত লোককে কত লাঞ্ছনা করিয়া থাকি। ধরা পড়িলে ত কথাই নাই! আমরা অভিমান করিয়া বলিয়া থাকি, চোরকে শাস্তি দিলে তাহার আর চুরীতে তত প্রবৃত্তি হইবে না, অপর লোকেরও শিক্ষা হইবে। তাহাকে ক্ষমা করিলে সমাজের মহা অমঙ্গল, তাহারও অমঙ্গল। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখা যায়? শাস্তি ত চিরকালই হইতেছে—চুরী কমিতেছে কি? অবশ্য ইহাতে কেহ মনে করিবেন না, আমি শাস্তির কোন উপকারিতা স্বীকার করি না, বা সকল অপরাধীকে একেবারে ক্ষমা করিবার পক্ষপাতী। আমার ইহাই বক্তব্য যে, আমরা, যে ভাবে অপরাধিগণের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই চরম আদর্শ নহে। আমরা নিজেরা অধম বলিয়া এখনও এই অধম উপায় লইতে বাধ্য। বস্তুতঃ আমাদের হৃদয়ে সাধনাবলে যদি কখন একটুও প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন বুঝিব, সেই প্রেমজনিত আন্তরিক ক্ষমার

বলে কত কত অলৌকিক কার্য্য সাধিত হইতে পারে! শুনা যায়, সেই চোর এই ঘটনার পর একেবারে সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিল।

বাস্তবিক তাঁহার চক্ষে জগৎ ভগবানেরই প্রকাশ বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি সমুদয় দুঃখকষ্টগুলিকে পাহন দেবতা বলিতেন। ঐ স্থানীয় হিন্দী ভাষায় পাহন শব্দের অর্থ কুটুম্ব। যাহাতে অপরের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা হয়, সেই সকল কষ্টকেও তিনি, অপরে যে পাহন দেবতা না বলিয়া অন্য নামে বলিবে, তাহাও সহ্য করিতে পারিতেন না। এক সময়ে তাঁহাকে একটী গোখ্‌রো সাপ দংশন করে। অনেকক্ষণ তিনি অচেতন অবস্থায় থাকেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করেন। পরিশেষে চৈতন্য লাভ করিয়া বলেন, পাহন দেবতা আসিয়াছিলেন।

তিনি বিনয়নম্রতার প্রতিমূর্ত্তিবিশেষ ছিলেন—সকলকেই নারায়ণজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রকাশ ও সাদরসম্ভাষণ করিতেন। তাঁহার এই নীরব সাধন ও প্রচারের ফলে লোকের কতদূর উপকার হইয়াছে, যাঁহারা গাজিপুরের চতুর্দ্দিক্স্থ পল্লীগ্রাম সমূহে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শেষ অবস্থায় তিনি কোন মানুষের সহিত চাক্ষুষ সাক্ষাৎ করিতেন না। এই অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কাটিয়াছিল। তাঁহার এক সহোদর ভ্রাতা তাঁহার জন্য প্রত্যহ বাড়ীর গেটের নিকট যৎসামান্য খাদ্য, যথা গোটাকতক আলু ও একটু ঘৃত রাখিয়া আসিত। তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়া কোন দিন খাইতেন, কোন দিন বা খাইতেন না। তাঁহার গুহার উপরিভাগস্থ গৃহের দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকিত। সেই দ্বারের নিকট বসিয়া তিনি কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনি যে সেই গৃহে আসিয়াছেন, তাহা হোমের ধূমদৃষ্টে অথবা পূজার দ্রব্যসমূহ আয়োজনের শব্দে বুঝা যাইত।

তিনি বলিতেন, 'যন সাধন, তন সিদ্ধি।' অর্থাৎ সিদ্ধিলাভের উপায়ভূত সাধনগুলিতে এত যত্ন করিতে হইবে, যেন তাহারাই সিদ্ধিস্বরূপ। তাহা তাঁহার নিজের জীবনেই প্রমাণিত হইত। তিনি শ্রীরঘুনাথজীর পূজায় যেরূপ যত্নের সহিত নিবিষ্ট হইতেন, পূজার একখানা তাম্রকুণ্ড মাজিবার জন্যও সেই যত্ন ও মনোযোগ প্রদান করিতেন।

তাঁহার বিনয় কোন মৌখিক ব্যাপার ছিল না—অথবা আপনার হেয়ত্ব বা অপদার্থত্ব বোধ হইতেও প্রসূত হয় নাই। তিনি ভগবানকে সার জানিয়া

সর্ব্বস্ব, এমন কি, আপনাকে পর্য্যন্ত তাহাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতেন না। কিন্তু একবার তাঁহার ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া গেলে অমৃতময় গভীর উপদেশ সকল তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত। তিনি আপনাকে কখনই গুরু মনে করিতেন না, সেই জন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তিনি দীর্ঘকায় ও মাংসল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটী মাত্র চক্ষু ছিল আর তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ বয়সের অপেক্ষা ছোট দেখাইত। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, এরূপ মধুর স্বর আর জগতে কাহারও গলায় শুনেন নাই। এইরূপে সেই পবিত্রতা, নম্রতা ও প্রেমের আদর্শ মহাপুরুষ যেন যোগশাস্ত্রের যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্যই জীবন কাটাইতে লাগিলেন।

এক দিন, যে ধূমে হোমঘৃতের গন্ধ থাকিত, তাহাতে দগ্ধ মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সমবেত জনগণ কিছু কারণ বুঝিতে পারিল না। এ দিকে অতি ভয়ানক দুর্গন্ধ বহির্গত হইতে লাগল আর রাশি রাশি ধূম বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল; দেখিল, এই মহাযোগী নিজের হোমাগ্নিতে নিজ শরীরকে শেষ আহুতি দিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে সেই পবিত্র দেহাবশিষ্ট কতকগুলি ভস্মরাশিমাত্র পড়িয়া রহিল।

যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ জানিতেন, তাঁহারা অনুমান করেন, ইনি ইঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসন্নপ্রায় বুঝিতে পারেন। যাহাতে তাঁহার দেহত্যাগের পরও কাহারও কষ্ট না হয়, এ জন্যই বোধ হয়, সজ্ঞানে নিজ দেহ আহুতি প্রদান করেন।

ধ্রুবচরিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর কক্ষ।

সুনী। দিন বোয়ে গেল,
কৈ—ধ্রুব ত আমার নাহি এল ফিরে;
সে কি আর প্রাণে বেচে আছে?
অভাগিনী ধন আর কি আসিবে ফিরে?
তপস্বিনী মনে,

কত কাননে কাননে,
অরণ্যের নিবিড় প্রদেশ,
কত ভীষণ নিভৃত পর্ব্বত গুহায়,
ভ্রমিয়াছি ধ্রুব তরে,
খুঁজিয়াছি তারে তন্ন তন্ন কোরে
বৃথা আকিঞ্চন,
কোথা অভাগীর ধন।
হারানিধি কেবা পায় ফিরে!
হয় ত সে এতদিন,
অনাহারে অনিদ্রায়,
ঘুমায়েছে অনন্তের কোলে।
(কিয়ৎক্ষণ পরে) নিরাশার অন্ধকার মাঝে
জলে ক্ষীণ আশার আলোক;
বোলেছেন দেবর্ষি নারদ,
ধ্রুব মোর বেঁচে আছে।
তাই ত সে আশে
এতদিন জীর্ণ দেহে ধরিয়াছি প্রাণ।
জীর্ণ দেহ ক্রমে হইতেছে ক্ষীণ,
ধ্রুব বিনা আর
কতদিন দেহে রবে প্রাণ।
শূন্য ত্রিভুবন
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দুনয়ন;
চাঁদ মুখ কতদিনে পাইব দেখিতে!
ধ্রুব! বাপধন!
দেখা দাও—দেখা দাও একবার,
ওরে—মার প্রাণে সহে না যে আর।

(নারদ ও রাজার সহিত ধ্রুবের প্রবেশ)

ধ্রুব। মা!

সুনী। কে?—বাবা ধ্রুব এলি! (মূর্চ্ছা)

ধ্রুব। মা! মা!

পিতা! হেন দশা কেন হইল মাতার?
নির্ব্বাক নিস্পন্দ কেন হইল জননী?
গুরুদেব!
কি হোলো মাতার?
কেন মাতা নাহি কয় কথা?
জীবন লক্ষণ কেন নাহি হেরি জননীর?

নারদ। বৎস! বহুদিন তব অদর্শনে,
জীর্ণ দেহ হইয়াছে জননী তোমার,
অকস্মাৎ তব আগমনে,
আনন্দের স্রোত বহিল প্রবল বেগে,
জীর্ণ দেহে সে প্রবল বেগ
সহিতে না পারি
মূর্চ্ছিত হোয়েছে জননী তোমার।
ডাক উচ্চৈঃস্বরে
মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে এখনি।

ধ্রুব। (সুরে) উঠমা, উঠমা, চেয়ে দেখ একবার,
এসেছে এসেছে ফিরে, হারানিধি তোমার।
কৈ—গুরুদেব! না পাই উত্তর কেন?
পিতা! সর্ব্বনাশ বুঝি হইল আমার,
ভাঙ্গিল কপাল বুঝি মোর!

নারদ। বৎস! কিছু ভয় নাই,
মৃত নহে জননী তোমার,
ক্ষণেকের তরে হোয়েছে মূর্চ্ছিত।
ডাক পুনর্ব্বার,
মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে এখনি,
এখনই পাইবে উত্তর।

ধ্রুব। উঠমা উঠমা চেয়ে দেখ একবার।
এসেছে এসেছে ফিরে হারানিধি তোমার॥

সুনী। কই কই কই নয়নের মণি,
কাছে আয়রে আমি দেখিতে পাইনি,

হাতে তুলে দেনা চাঁদ মুখ খানি,
আঁখি নীরে হেরি সব ধূমাকার॥

ধ্রুব। উঠমা উঠমা চেয়ে দেখ একবার।
এই যে মা আমি এসেছি কাছে,
চেয়ে দেখ ধ্রুব আজও বেঁচে আছে,
দেমা অঞ্চল আঁখি দিই মুছে,
কেঁদনা, কেঁদনা মাগো, কেঁদনাক আর॥

সুনী। আয়রে আয়রে আয়রে কোলে,
জুড়ারে প্রাণ মা মা বোলে,
"মা" "মা" বাণী বহুদিন শুনি নি,
মৃত দেহে কর জীবন সঞ্চার॥

ধ্রুব। ওমা ওমা ওমা, মা গো আমার॥

(ধ্রুবকে কোলে গ্রহণ)

নারদ। মা সুনীতি।

সুনী। প্রভো। প্রণমি শ্রীপদে।

নারদ। মা! ধরণীর ভক্তশিরোমণি
ধ্রুব ধনে লও ফিরে তব।
সার্থক জীবন তব
হেন হরিভক্ত শিশু ধোরেছ জঠরে।
সার্থক জীবন মম,
হেন ভক্তে শিষ্যরূপে করিয়া গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ করি,
মাতা পুত্রে সুখে কর রাজ্যভোগ।

ধ্রুব। মা! আমি তোর জন্যে এক জিনিস এনেছি।

সুনী। কি জিনিস বাবা?

ধ্রুব। ফিরে বনে বনে, এনেছি মা কিনে,
সাধনের পণে, আদরের ধন।
ধর মা আঁচল পাতি, এ রতনে দিবা রাতি,
বাঁধিও যতনে অতি,
অযতনে সে মা করে পলায়ন॥

এমনি আমায় ভালবাসে,
ডাক্‌লে অমনি ছুটে আসে,
আমার সঙ্গে খেলে হাসে,
কোলে লয় মধুর ভাষে,
সদা ঘোরে আশে পাশে,
আদর করে ওমা তোমারি মতন॥

স্থনী। কই বাবা। আমি তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

ধ্রুব। হের মা আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল,
তারা পুঞ্জ সনে ঘোরে অবিরল,
ঐ ধ্রুবলোক তারি কেন্দ্র স্থল,
তথায় হবে মা হরি দরশন।
বাজ্য অবসানে, আরোহি বিমানে,
মাতা পুত্রে তথা যাইব যখন,
দেখিতে পাবি মা তখন পদ্মপলাশলোচন॥

নারদ। মহারাজ। বহু পুণ্যফলে
লভিয়াছ এই দুর্ল্লভ রতন।
রাজসিংহাসন ধ্রুবে করিয়া প্রদান,
বানপ্রস্থ করহ গ্রহণ।

রাজা। যথা আজ্ঞা প্রভো!
অভিষেক ক্রিয়া
সম্পাদন করিব এখনি।
মহিষি। লয়ে যাও ধ্রুবে,
মনোমত রাজবেশ পরাও যতনে।

(ধ্রুবকে লইয়া সুনীতির প্রস্থান)

রাজা। প্রভো! তব কৃপাবলে
মনুবংশ হইল উজ্জ্বল।
ধ্রুব মোর বংশের গরিমা;
ধ্রুব হতে এ বংশের যশের সৌরভ
অনন্ত অনন্ত কাল ধরি
ব্যাপ্ত রবে ধরণী মণ্ডলে।

আসুন দেবর্ষি রাজসভামাঝে,
আশীর্ব্বাদ করিবেন ধ্রুবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(বেগে সুরুচির প্রবেশ)

সুরু। উহুঃ! জ্বলে গেল জ্বলে গেল প্রাণ।
কি এক ভীষণ যাতনা যেন
দহিতেছে অন্তস্তল মোর!
শিরায় শিরায়
অগ্নিস্রোত বহিতেছে যেন!
পুড়ে গেল সর্ব্বাঙ্গ আমার!
কোথা যাই—
কোথা গেলে পাব পরিত্রাণ?
ঐ—ভীষণ আকৃতি এক যেন
তীক্ষ্ণ অসি করে
অগ্রসর হইতেছে সম্মুখে আমার
বলিছে বিকট স্বরে যেন—
নাহিক উত্তম,
নাই তোর রাজ্য আর।
ঐ আসি কেশে ধরি মোর
লয়ে যায় শূন্য দেশে।
শূন্য হতে ফেলে দিল পুনঃ
ঘোর অন্ধকারময় পাতাল প্রদেশে।
সহস্র বৃশ্চিক আসি তথা
ঘেরিল আমারে,
সবে একযোগে,
ধাইয়া আসিছে মোরে করিতে দংশন।
ওকি! বৃশ্চিকের গায়ে কার নাম লেখা?
এযে ঈর্ষ্যা—ঈর্ষ্যা।
ঈর্ষ্যাই বৃশ্চিক রূপ করিয়া ধারণ
দংশিতে আসিছে মোরে।

কোথা যাই—না দেখি উপায়,
কিসে পাব পরিত্রাণ!
কে আছ—কে আছ
রক্ষা কর—রক্ষা কর অভাগীরে।
একি! পলাইছে বিষধরগণ!
অকস্মাৎ অন্ধকার ভেদি
নামিতেছে ধীরে,
জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর বিমান,
মধ্যস্থলে বসি তার সাধু একজন
দেবতানিন্দিত উজ্জ্বল বিমল তনু
সহাস্য বদনে
ঢালিতেছে সুধারাশি।
স্নিগ্ধ হল কলেবর,
জুড়াল সকল জ্বালা।
ঐ—মেঘের ভিতর পুনঃ লুকাল বিমান।
একি হেরি পুনঃ।
ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি
ঘুরায় ভীষণ চক্র
ঘন ঘন সম্মুখে আমার।
চক্র আসি বুঝি কাটিল মস্তক মোর।
কোথা পলাইব স্থান নাহি পাই.
কে রক্ষিবে এ সঙ্কটে!
মের না মের না মোরে,
প্রাণভিক্ষা দেহ অভাগীরে.
কৃপা করি ক্ষম অপরাধ।
পুনঃ সেই জ্যোতির বিকাশ!
মেঘের ভিতর হতে পুনঃ
পূর্ণিমার চন্দ্র সম
সেই মূর্ত্তি হইল প্রকাশ।
কাহার এ মুরতি সুন্দর?

চিনি চিনি যেন বোধ হয়!
এ যে মোর সপত্নী সুনীতি পুত্র
ধ্রুব করে আগমন।
বৎস! রক্ষা কর
রক্ষা কর বিমাতারে তব,
দুর্ম্মতির বশে,
সপত্নী বিদ্বেষে,
মর্ম্মে তব দিয়াছি দারুণ ব্যথা,
অপরাধ ক্ষমা কর জননীর।
ঐ—কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি হল তিরোহিত।
পুনঃ মেঘে লুকাল বিমান—
পুনঃ সেই কৃতান্ত সমান ভীষণ আকৃতি,
গ্রাসিতে আসিছে মোরে,
অগ্নি শিখা সম
লোলজিহ্বা লক্ লক্ করে;
ঐ—ক্রমে আসিছে নিকটে,
গেল বুঝি গেল গেল প্রাণ,
ধ্রুব বিনা কেহ আর
এ সঙ্কটে নারিবে রক্ষিতে,
যাই ছুটে ধ্রুব পাশে।

(বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(নারদ রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রিবর!
অভিষেক সংবাদ ত
প্রজাগণে কোরেছ জ্ঞাপন?
উৎসবের হেতু

অন্য অন্য কার্য্য সব
যেরূপ যা কোরেছি আদেশ
নির্ব্বিঘ্নে ত হইছে সাধিত ?

মন্ত্রি। মহারাজ!
রাজ্যমধ্যে দিয়াছি ঘোষণা,
সিংহাসনে আজি
অধিষ্ঠিত হইবে কুমার।
কোষাধ্যক্ষ, তব আজ্ঞামত,
দীনদুঃখী দরিদ্র আতুরে,
অকাতরে ধন বস্ত্র করে বিতরণ।
কারামুক্ত হইয়াছে বন্দিগণ।
রাজ্যমধ্যে দেবালয় আছে যত
পুষ্পমাল্যে হোয়েছে শোভিত।
পুরোহিতগণ, প্রতি দেবালয়ে
কুমারের মঙ্গলের তরে
করিতেছে স্বস্ত্যয়ন।
মঙ্গলসূচক শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি
হইতেছে চারিদিকে।
প্রতি গৃহদ্বার, প্রতি রাজপথ
দেবতরু কিশলয়ে হোয়েছে সজ্জিত।
প্রতি গৃহচূড়ে, রাজপথে,
পতাকার শ্রেণী
উড়িতেছে পত্ পত্ রবে,
নগর অপূর্ব্ব শোভা কোরেছে ধারণ।
প্রজাবর্গ আনন্দে [illegible],
আনন্দের স্রোত বহিছে নগরে।

রাজা। আজ কিবা আনন্দের দিন।
ভক্তচূড়ামণি ধ্রুবে আজি
সিংহাসন করিব অর্পণ।
ধন্য হইলাম আমি,

ধন্য রাজধানী,
ধন্য হল রাজত্ব আমার।
ধ্রুব রাজ্যে করি বাস
প্রজাবর্গ হবে ভাগ্যবান।

(ধ্রুবকে লইয়া সুনীতি ও সুরুচির প্রবেশ)

রাজা। প্রভো! অনুমতি দেহ দাসে
রাজসিংহাসনে বসাই কুমারে।

নারদ। তথাস্তু।

সুরুচি বৎস! ধর্ম্মমত তুমি,
রাজদণ্ড করহ গ্রহণ।
করি আশীর্ব্বাদ
আজীবন ভুঞ্জ রাজ্যসুখ,
অনুজ উত্তম,
তব দাস হোয়ে
সেবা করুক তোমার।

রাজা। বৎস! তব করে আজি
সিংহাসন করিনু অর্পণ
আশীর্ব্বাদ করি
পুত্র সম প্রজাগণে করিয়া পালন
অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি লভ ধরাতলে।

(ধ্রুবকে সিংহাসন অর্পণ)

সুনী। সার্থক জীবন মম
ধ্রুবে আজ সিংহাসনে হেরি।

নারদ। বৎস! গুরুভার আজি লইলে মস্তকে।
সযতনে বহিবে এভার।
অধিক কি উপদেশ দিব তোমা আর—
অপত্য সমান প্রজা করিও পালন।
অনাসক্ত হো'য়ে, রাজর্ষি সমান,
রাজকার্য্য করিও সাধন।
ভোগে যেন লিপ্ত নাহি হয় মন।

ভোগের সামগ্রী তব রহিবে সম্মুখে
ধর্ম্মবীর তুমি বৎস—
ভোগাসক্তি করিও বিজয়।
প্রজাগণে সুবিচার কোরো বিতরণ।
ন্যায় পথে থাকি
রাজধর্ম্ম করিও পালন।
আশীর্ব্বাদ করি,
সুখে ভুঞ্জি রাজ্যসুখ,
লভ সে দুর্লভ স্থান ধ্রুবলোক নামে।

ধ্রুব। গুরুদেব।
তব আজ্ঞা প্রাণপণে করিব পালন।
প্রণিপাত তব শ্রীচরণে।

(গাহিতে গাহিতে তপস্বিনীর প্রবেশ)

তপ। পুরাণ সুন্দর সেই হাসিটি হাস।
চম্পক চামেলি চারু অধরে বিকাশ ॥
রাজা হবে বোলে তুমি,
দেখিতে এসেছি আমি,
শাস সসাগরা ভূমি,
পুরাও দুঃখিনী জননী আশ ॥

ধ্রুব। মাগো।
আশীর্ব্বাদ করুন সন্তানে
ধর্ম্মপথ হোতে যেন
বিচলিত নাহি হই কভু।

তপ। বৎস। আশীর্ব্বাদ করি,
ধর্ম্মে যেন চিরকাল মতি থাকে তব।

নারদ। মহা আনন্দের দিন আজি,
এস সবে মিলি,
এক প্রাণে করি হরি নাম গুণ গান।

সকলে। জয় দেব নারায়ণ, জয় পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন,
জয় মাধব, কেশব, জয় নিত্য নিরঞ্জন।

করুণার নিধি স্নেহ নীরধর,
কৃপা নিরবধি কাতরে বিতর,
শান্তির সাগর, আনন্দ আকর,
প্রণমি কমলে, প্রেম নিকেতন॥
ধ্রুব। নমি নমি পদ্মপলাশলোচন, দেহি পদপল্লবমুদারং॥

ইতি সমাপ্ত।

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে গুটি কয়েক কথা।

সমাজ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। বৈদিক যুগে যে সমাজ ছিল, তাহার কথা ছাড়িয়াই দিন, কত কত শতাব্দী ধরিয়া নানা অবস্থাচক্রে নানা ঘাত প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজের অবস্থা একরূপ দাঁড়াইয়াছে। এখনও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। ভবিষ্যতে কত কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা কে জানে?

যাঁহারাই হিন্দুজাতির শাস্ত্রাদির ও প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির ইতিহাস একটুও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই নিতান্ত অন্ধ না হইলে জানেন, পরিবর্ত্তন কত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, বর্ত্তমান সমাজের পরিচালক কে হইবেন?

মধ্যে মধ্যে সমাজে যুগচক্রপরিবর্ত্তনকারী মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তাঁহারাই সমাজকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা শুধু কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া যান না। তাঁহারা সমাজে এক অভূতপূর্ব্ব শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন। পরে সেই শক্তি হইতে সময়োপযোগী নানাবিধ নিয়মের অভ্যুদয় হয়। কালবশে আবার এই নিয়মগুলি বন্ধনমাত্রে পর্য্যবসিত হইলে আবার নূতন নিয়মের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সংস্কারকগণ খুব উন্নত মহাপুরুষ না হইলে সংস্কার কার্য্যে সফল হইতে পারেন না। পরমহংসদেবের কথায় বলিলে বলিতে হয়, 'চাপরাস না পাইলে তাহার কথা কেহ লয় না।' অতএব ঈশ্বরের নিকট এই শক্তি সংগ্রহ করিয়া তবে সংস্কার কার্য্যে নামা আবশ্যক। ইহা অপেক্ষা মহৎ ও উচ্চ ব্রত কিছু নাই। এই জন্য ইহার সাধনও অতি কঠোর।

পক্ষান্তরে কেবল দোষ দর্শন, নিন্দা বা সমালোচনা দ্বারা সমাজ গঠন হয় না। অথবা অপর কোন সমাজের আদর্শ উপস্থিত করিয়া তাহার অনুসরণ

চেষ্টা করিলেও সে সংস্কার শুভজনক হয় না—তাহাতে সফলকাম হওয়াও অতি কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হিন্দু সমাজকে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণে গঠনের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। ইউরোপীয় সমাজ আদর্শ সমাজ নহে। অনেক বিষয়ে উহারই সংস্কার আবশ্যক।

মায়িক জগৎ কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণতা যেখানে, সেখানে সমাজ নাই, সেখানে কেবল ব্রহ্মের প্রকাশ। তবে যে সমাজ যত পরিমাণে ব্রহ্মজ্ঞ নরনারী গঠনে সহায়তা করে, তাহা ততই উন্নত। এ উন্নতির বিরাম নাই, বিরাম সেই মোক্ষলাভে, বিরাম সেই ব্রহ্মজ্ঞানে—সেই পরাশান্তিতে।

প্রয়োজন অনুসারে আবার সমাজে কখন একটী প্রথা প্রচলনের আবশ্যকতা হয়, কখন তাহার ঠিক বিপরীত প্রথা বিশেষউপযোগী হইয়া থাকে। কোন প্রথা কোন্ সময়ের উপযোগী, তাহা সেই সময়কার উন্নত নিরপেক্ষ মহাপুরুষগণই বুঝিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিধবার বিবাহ সেই সমাজে প্রচলনের আবশ্যক হয়, যে সমাজে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু উহা সাময়িক বিধানমাত্র। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যে শিক্ষিত করিতে পারিলে তখন বিধবা বিবাহ অতি নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া প্রচার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। যখন সন্ন্যাসের ভানে নানা কপটতা ও ব্যভিচারে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন গার্হস্থ্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তনের আবশ্যকতা হয়। আবার যখন লোকে কতকটা পশুজীবন হইতে মুক্ত হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমের দাম্পত্য প্রেমকেই চরমাদর্শ জ্ঞান করিতে থাকে, তখন প্রকৃত চরমাদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের, সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। কখন সমাজে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধানের কঠোর নিয়ম করার আবশ্যক হয়, আবার কখন বা তদ্বিষয়ে একটু স্বাধীনতা প্রদান করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

এই যে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কত তর্ক শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এক সময়ে ইহাতে পরম মঙ্গল করিয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং এখনও কতক কতক শুভ করিতেছে, ইহা কাহারও কাহারও মত। এক্ষণে ইহা বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাকে ঠিক করিতে গেলে কেবল যথেচ্ছা আহার বিহারে হয় না। অন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক।

আপনাদের রাজা থাকিলে রাজার শাসনে কতকটা সমাজ সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ রাজার অভাবে সাধারণ মত গঠন ব্যতীত অন্য

কোন রূপে সমাজ সংস্কার হয় না। এই মত গঠন কার্য্যে শিক্ষার মত দ্বিতীয় সহায়ক আর কেহ নাই। সমাজসংস্কারকগণ নবনারীর উপযুক্ত শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলে বড় ভাল হয়। যে সকল সামাজিক নিয়মে শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে আর কোন প্রতিবন্ধক উৎপাদন করিতে পারে না। মনে করুন, অনেকের মতে বাল্য বিবাহ স্ত্রীজাতির শিক্ষার এক প্রবল অন্তরায়। তার পর স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথা। কিন্তু আপাততঃ এ সকল থাকিলেও জাতীয় উপায়ে দেশে এমন স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করা যাইতে পারে, যাহাতে স্ত্রীজাতিরা আপন আপন কর্ত্তব্য বাছিয়া লইতে পারে। সংস্কারকগণ স্ত্রীলোকের পতিগণের যথাবিহিত শিক্ষা দিতে পারিলে যে স্ত্রীজাতির শিক্ষার উন্নতির যথেষ্ট সহায়তা হইতে পারে, একথা আমি খুব বিশ্বাস করি। তার পর যদি ব্রহ্মচর্য্যের দিকে খুব ঝোঁক দেওয়া যায়, এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এ বিষয়ে বিশেষরূপ শিক্ষিত হয়, তখন অবরোধপ্রথার কতক শৈথিল্য করিলেও তত দোষের হইবে না। ইতিমধ্যে কতকগুলি যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যশালী পুরুষ কতকগুলি বিধবা ব্রহ্মচারিণীকে ও অন্যান্য নারীকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা পুরুষসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া অন্যান্য স্ত্রীকেও একপ শিক্ষা দিতে পারেন। শুধু বিদ্যালয় করিয়া নহে, এই শিক্ষিতা ললনাগণ লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাঁহাদিগকে নানা বিদ্যায় শিক্ষিতা করিতে পারেন। এইরূপে ক্রমশঃ বাল্যবিবাহপ্রথারও ক্রমশঃ অনাবশ্যকতা হইতে পারে।

আসল কথা এই, এই সকল সংস্কার কার্য্যে চরিত্রবান ধার্ম্মিক পুরুষের, ব্রহ্মচর্য্যবলে জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বিশেষ আবশ্যক। যত দিন না তাহা হইতেছে, ততদিন সমুদয় আন্দোলনই একরূপ বিফল।

আর ইহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ধর্ম্মশিক্ষাই শিক্ষার সার। স্ত্রীলোকদিগের লৌকিক বিদ্যায় কতটুকু প্রয়োজন, তাহা আগে জানা দরকার, তাহা না হইলে অন্ধভাবে পুরুষগণ যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইতেছে, তাহার অনুসরণ করিলে কিছুই হইবে না। পুরুষগণের যে ভাবে ও যাহা শিক্ষা হইতেছে, তাহারই সংস্কার প্রয়োজন। তাহা যে ঠিক সম্পূর্ণ, তোমায় কে বলিল? অতএব সংস্কারকার্য্যে হঠকারিতা অবলম্বন না করিয়া বিশেষরূপ সহিষ্ণুতার আবশ্যক, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

অনেকে শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও ঔচিত্য

দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই শাস্ত্রের বিচার উভয়পক্ষেই অনেক স্থলে নিরপেক্ষ হয় না। সকলেই আপনার মনোমত শাস্ত্রপ্রমাণ তুলিয়া থাকেন। আবার কোন শ্লোক তুলিলেও তাহার ব্যাখ্যা লইয়া বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। অবশ্য যথাসাধ্য নিরপেক্ষভাবে প্রাচীন সমুদয় শাস্ত্রে উল্লিখিত সামাজিক জীবনের ইতিহাস সহজ ভাষায় লোকসমক্ষে ধরিতে পারিলে ক্রমশঃ শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবল, চরিত্রবল ব্যতীত কার্য্যকালে সবই বৃথা হইয়া যাইবে। এই জন্য সমাজসংস্কার প্রধানতঃ চরিত্রবলের উপর নির্ভর করে। মনে করুন, আমি বালবিধবার বিবাহ দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত জ্ঞান করিলাম। কিন্তু অতিশয় মানসিক বল ব্যতীত তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার আমার সামর্থ্য কই? এই জন্য যত চরিত্রবলশালী ব্যক্তির উৎপত্তি হইতে থাকিবে, তত সমাজসংস্কার সোজা হইয়া আসিবে। যথার্থ ধর্ম্মবলে বলী তেজীয়ান ব্যক্তির শক্তিকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না। তাঁহার শক্তির নিকট, শাস্ত্র বলুন, দেশাচার বলুন, কিছুই আর কোন ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না।

তার পর সমাজসংস্কারকেরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কার্য্যকেই সমাজসংস্কার নাম প্রদান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সমাজসংস্কার কি? সমাজরূপ সুবৃহৎ তরুর দুই একটী ডালপালা ছেদন করিলে কি হইবে? সমাজের আমূলসংস্কার করিতে হইবে। কতকগুলি স্থূলব্যাপারে শুধু হস্তক্ষেপ করিলে চলিবে না। যে সকল সূক্ষ্ম কারণ পরম্পরা হইতে এই সকল স্থূল ব্যাপারের প্রসব হইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল কারণ গুলিকে সংশোধন করিতে হইবে।

ভারতে আবার সমাজসংস্কার ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপে হইবার উপায় নাই। এখানকার জীবনীশক্তি ধর্ম্মে। ধর্ম্ম ছাড়িয়া এখানে সমাজ বা যে সংস্কারই বলুন না কেন, এমন কি, রাজনীতির সংস্কার পর্য্যন্ত মিছা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। হইতেছেও ত তাহাই। তাই বলি, আমাদের এখনও যেখানে সমগ্র জগৎ হইতে বিশেষত্ব, সেই ধর্ম্ম লইয়া মাতিতে হইবে—ভিতরে লক্ষ্য করিতে হইবে—গভীরযোগ, প্রবল প্রেমের উৎস ছুটাইতে হইবে। তবেই সমাজ প্রকৃতসংস্কারের পথে ধাবিত হইবে।

বিগত কংগ্রেসে যে 'সামাজিক সভা' বসিয়াছিল, তাহার গতি দেখিয়া

আমার বড় আশা হয়। এখন সমাজসংস্কার আর ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ নাই—গণ্যমান্য সকল হিন্দুরই এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ বিষয়ে চিন্তা উদয় হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় সকল বিশেষ বিশেষ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তায় মত দিতে না পারায় কোন কোন সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র তাঁহাকে সভাপতির অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতার অভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা যে স্বভাবতই একযোগ হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারি না, সেই আমাদের স্বাভাবিক অনৈক্যাগ্নিতে ইহাতে আরো সমিধ্ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহাদের যেন ধারণা, আমরা গুটিকয়েক কার্য্য, যাহাকে সমাজসংস্কার বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহাই সমাজসংস্কার। এই যে শিক্ষিতসমাজে সর্ব্বত্রই একটা আন্দোলনের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে কি তাঁহাদের আনন্দ করা উচিত নয়? লোককে লওয়াইতে গেলে তাহাকে ভাবাইতে হইবে। তাহা না হইলে, অন্ধভাবে গতানুগতিকের ন্যায় সমাজসংস্কারকবিশেষের অনুসরণ করা আর বাপ পিতামহ যাহা করিয়া আসিতেছিলেন, সেই অনুসারে চলা, ইহাতে বড় প্রভেদ দেখিতে পাই না।

প্রকৃত কথা এই আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে। দেখা যায়, অনেক ব্যক্তি সত্য ও স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়া প্রতিবাদীকে অতিশয় কটুকাটব্য করিতে লজ্জা বোধ করেন না, কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত, প্রথমে, আপনার ছিদ্র কত আছে। সে সকল সংশোধনের প্রয়াস না পাইয়া অপরের ছিদ্র উপলক্ষ্য করিয়া উপহাস ও গালাগালি করা উন্নত মনের পরিচায়ক নহে।

আসুন, আমরা বুঝি, শত দোষ সত্ত্বেও ইহা আমাদের সমাজ। এই আমাদের জুড়াইবার যায়গা। তাহাতে ত্রুটী হইয়া থাকিতে পারে, তাই বলিয়া অপর সকলকে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা না করিয়া এস, আমরা সকলে এই ত্রুটী মেরামত করিবার চেষ্টা করি। না পারি, আমরা সকলে একত্রে ডুবিব। কিন্তু চিরকাল জানিব, আমাদের সমাজের সকলেই আমার ভাই—সকলেই আমার আপনার। আপনার জনকে কেহ কি কখন ছাড়িতে পারে?

সর্ব্বোপরি সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বনিয়ন্তা করুণাময় পরমেশ্বরকে জানাইতে হইবে, প্রভো, অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং

গময়—অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতে লইয়া যাও। এইরূপ হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা যদি প্রতি অন্তর হইতে দিবানিশি উঠিতে থাকে, তবে আমাদের সমাজ, শুধু আমাদের কেন, সকল সমাজই দেবসমাজে পরিণত হয়—যথায় দেবদেবী আনন্দে বিচরণ করিতে থাকিবে। কুসংস্কার কুসংস্কার বলিতেছ? এই চীৎকার ত্যাগ করিয়া লোকে যাহাতে ভগবৎ-সংস্কার-সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। সত্যজ্যোতি প্রকাশিত হইলে মিথ্যার অন্ধকার কতক্ষণ টিকিবে? আর বাস্তবিক ধরিতে গেলে কুসংস্কারসম্পন্ন নয় কে? এক জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত সকলেরই ত দেহ, ধনমান যশ প্রভৃতির নানাপ্রকার কুসংস্কার রহিয়াছে। যদি প্রকৃত সত্য চাও, যদি সে ভরসা থাকে, তবে প্রকৃত বিচারসম্পন্ন হইতে চেষ্টা কর দেখি। হায়, পৌত্তলিকাতে দেশ ভরিয়া গেল, এ সকল চীৎকার কি তোমার শোভা পায়? তুমি ত নিজদেহ, নিজ স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পুত্তলিকার চরণে কোটি কোটি বার মস্তক অবনত করিতেছ। প্রকৃত আদর্শ, প্রকৃত চরিত্র দেখাও, জগৎ তোমার উপদেশ অবনতমস্তকে পালন করিবে, নতুবা সমুদয় চীৎকার নিষ্ফল। সংস্কারকগণের একটী ভুলধারণা এই যে, সংস্কার হিন্দুসমাজে সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কার অনবরত চলিতেছে। বুদ্ধদেবের সময় ইহা প্রবল ও সার্ব্বভৌমিক আকার ধারণ করে। তার পর শঙ্করাচার্য্য, রামানন্দ, রামানুজ, মধ্ব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ সকলেই নীরবে সমাজের সংস্কার ও গঠনকার্য্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। হঠকারিতা অবলম্বন না করিয়া, পাশ্চাত্যগুরুগণের আপাতযুক্তিপূর্ণ বাক্যে মুগ্ধ না হইয়া সেই প্রাচীন মহাপুরুষগণের কার্য্যাবলি শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ণভাবে আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে। যে সকল শক্তি লইয়া আজ এই পাশ্চাত্যজাতিরও মহাবিস্ময় উৎপাদক, অপূর্ব্ব সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই শক্তিগুলিকে বুঝিতে হইবে, তাহার উপর যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, উহা যেখানে আছে, সেখান হইতেই উহাকে কিছু উর্দ্ধে ঠেলিয়া দিতে হইবে। প্রকৃত শক্তির বিকাশে দুর্ব্বলতা, দোষ সব পলায়ন করিবে। সূর্য্য উঠিলে কি আর পেচক উড়িয়া বেড়ায়; না, চোর চুরী করিতে সাহস পায়?

ভাষ্যমূলম্।—অথবা অবিশেষেণ সংযোগ-সংজ্ঞা বিজ্ঞাস্যতে দ্বয়োরপিবহূনামপি তত্র দ্বয়োর্যা সংজ্ঞা তদাশ্রয়োলোপো ভবিষ্যতি। যদপ্যুচ্যতে। ইহ নির্গ্লেয়াৎ। নির্গ্লায়াৎ। নির্ম্লেয়াৎ। নির্ম্লায়াৎ। বান্তস্য সংযোগাদেরিত্যেত্বং ন প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা সাধারণরূপে সংযোগ সংজ্ঞা বিজ্ঞাপিত করা যাইবে। দুই দুই বর্ণেরও হইবে এবং বহুবর্ণেরও সংযোগসংজ্ঞা হইবে। সে স্থলে অর্থাৎ দুইবর্ণেরই হউক, বা বহুবর্ণেরই হউক, যেহেতু বহুবর্ণের মধ্যেও দুইবর্ণ অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং দুই দুই বর্ণের যে (সংযোগ) সংজ্ঞা, তাহাকে আশ্রয় করিয়া লোপ হইবে।

তবে যে বলা হইয়াছে নির্গ্লেয়াৎ, নির্গ্লায়াৎ, নির্ম্লায়াৎ, নির্ম্লেয়াৎ এই স্থলে, 'বান্তস্য সংযোগাদেঃ ৬।৪।৬৮।' (১) এই সূত্রানুসারে, ('গ্লা' এবং 'ম্লা'র মধ্যে 'র্ গ্ ল, র্ ম্ ল তিনবর্ণ সংযোগস্থলে') এত্বপ্রাপ্তি হইবে না?

ভাষ্যমূলম্।—অঙ্গেন সংযোগাদিং বিশেষয়িষ্যামঃ। অঙ্গস্য সংযোগাদেরিতি। এবং তাবৎসর্ব্বমাঙ্গং পরিহৃতম্। যদপ্যুচ্যতে। ইহ চ গোমান্ করোতি যবমান্ করোতীতি সংযোগান্তলোপো ন প্রাপ্নোতীতি। পদেন সংযোগান্তং বিশেষয়িষ্যামঃ। পদস্য সংযোগান্তস্যেতি॥ যদপ্যুচ্যতে। ইহ নির্গ্নো নির্ম্ন ইতি সংযোগাদেরাতোধাতোর্যণ্বত ইতি নিষ্ঠানত্বং ন প্রাপ্নোতীতি। ধাতুনা সংযোগাদিং বিশেষয়িষ্যামঃ। ধাতোঃ সংযোগাদেরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অঙ্গের সহিত সংযোগাদির বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই সংযোগের আদিভূত যে অঙ্গ বিকল্পে তাহার আকার স্থানে একার হইবে। এইরূপে অঙ্গবিহিত কার্য্যে যত দোষ উপস্থিত হইবে, তাহার পরিহার হইবে।

তবে যে বলা হইয়াছে, 'গোমান্ করোতি' 'যবমান্ করোতি' ইত্যাদি স্থলে, "সংযোগান্তস্য লোপঃ" সূত্রানুসারে সংযোগের অন্তস্থিত বর্ণের (গোমন্ 'ৎক') লোপ প্রাপ্ত হইবে না; সেই দোষও থাকিবে না। কারণ, এই স্থলে পদের সহিত সংযোগান্তের বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই, পদের সংযোগান্তের লোপ হইবে। 'গোমান্ করোতি' 'র' 'ক'কার ভিন্ন পদের হওয়াতে, 'ত'কার লোপের বাধা হইবে না। আর যাহা বলা হইয়াছে যে, 'নির্গ্নঃ' 'নির্ম্নঃ' প্রভৃতি স্থলে,

(১) ঘু সংজ্ঞকধাতু, মা এবং স্থা প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্য সংযোগ আদি বিশিষ্ট-ধাতুর আকার স্থানে একার হয় বিকল্পে ককারইৎবিশিষ্ট লিঙ্‌সম্বন্ধী আর্দ্ধ-ধাতুক পরে থাকিলে।

'সংযোগাদেরাতো ধাতোর্যণ্বতঃ, ৮।২।৪৩। (১) এই সূত্রানুসারে 'নিষ্ঠা' অর্থাৎ 'ক্ত' 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত'কারের 'ন'ত্ব হইবে না, তাহাও নহে। কারণ, সম্প্রতি আমরা সংযোগের আদির সহিত বিশেষণ করিব। তাহা হইলেই ধাতুর সংযোগাদির 'ক্ত' 'ক্তবতু' প্রত্যয়ের 'ত' কারের 'ন'ত্ব হইবে। নির্গ্লান, প্রভৃতি স্থলেও 'গ্লা' ধাতুর (সংযোগ আদি হওয়াতে) পরে 'ন'ত্ব হইয়া প্রয়োগসিদ্ধি হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—স্বরানন্তর্হিতবচনম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—স্বরবর্ণ দ্বারা অব্যবহিতবর্ণের বচন হইয়া থাকে। *

ভাষ্যমূলম্।—স্বরৈরনন্তর্হিতা হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা ভবন্তীতি বক্তব্যম্।

কিং প্রয়োজনম্।

ব্যবহিতানাং মাভূৎ। পচতি পনসম্।

নন্বু চানন্তরা ইত্যুচ্যতে তয়োশ্চৈবানন্তরা ইত্যুচ্যতে তেন ব্যবহিতানাং ন ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—স্বরবর্ণ সমূহ দ্বারা ব্যবধান হয় নাই, এমন যে 'হল্' (ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহ), তাহার সংযোগ-সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলা উচিত।

ইহার প্রয়োজন কি?

ব্যবধান বিশিষ্ট বর্ণ সমূহের সংযোগ সংজ্ঞা যাহাতে না হয়। যেমন,—'পচতি পনসম্' ('প'এর পর 'অ'কার ব্যবধান, এইরূপে প্রত্যেক বর্ণের পরে স্বর-বর্ণ ব্যবধান থাকাতে যাহাতে সংযোগ-সংজ্ঞা না হয়)।

যদি বল যে, সূত্রে যে 'অনন্তরা' এই শব্দ বলা হইয়াছে, তাহাতে দুই বর্ণের মধ্যে যে অনন্তর অর্থাৎ অ ব্যবধান, তাহারই সংযোগসংজ্ঞা হইবে, সুতরাংই ব্যবহিত বর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—দৃষ্টমানন্তর্য্যং ব্যবহিতেঽপি। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—ব্যবধানেও আনন্তর্য্য শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। *

ভাষ্যমূলম্।—ব্যবহিতেঽপ্যনন্তরশব্দো দৃশ্যতে। তদ্যথা।—অনন্তরাবিমৌগ্রামা-বিত্যুচ্যতে। তয়োশ্চৈবান্তরানদ্যশ্চ পর্ব্বতাশ্চ ভবন্তীতি।

যদি তর্হি অনন্তরশব্দো ব্যবহিতেঽপি ভবতি আনন্তর্য্যবচনমিদানীং কিমর্থং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—ব্যবধান হইলে অনন্তর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন,

(১) সংযোগ আদিভূত যে আকারান্ত যণ্ বিশিষ্টধাতু, তাহার নিষ্ঠা (ক্ত, ক্তবতু) প্রত্যয়ের 'ত'কারের স্থানে লকার হয়।

—এই গ্রাম দুইটী (পরস্পর) "অনন্তর" এইরূপ বলা হয়, অথচ তাহাদের ব্যবধানে, কত নদী কত পর্ব্বত থাকে।

অনন্তর শব্দ যদি ব্যবধানেও প্রয়োগ হয়, তবে সূত্রে আনন্তর্য্য বচন কেন প্রয়োগ করিলেন?

বার্ত্তিকমূলম্।—আনন্তর্য্যবচনং কিমর্থমিতি চেদেকপ্রতিষেধার্থম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—'আনন্তর্য্য' বচন কেন করা হইল, যদি এই কথা বল, তাহা হইলে একবর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা নিষেধের জন্য বলিব। *

ভাষ্যমূলম্।—একস্য হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা মাভূদিতি। কিং চ স্যাৎ। যদ্যেকস্য হলঃ সংযোগ-সংজ্ঞা স্যাৎ। ইয়েষ। উবোথ। ইজাদেশ্চ গুরুমতোনৃচ্ছ ইত্যাম্ প্রসজ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ।—একটী ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা যাহাতে না হয়, (এই জন্য 'আনন্তর্য্য' বচনের প্রয়োজন)।

কি (দোষ) হইবে, যদি একটী হলের (ব্যঞ্জনের) সংযোগ-সংজ্ঞা হয়?

'ইষ' এবং 'উথ' ('ইচ্' আদি হওয়াতে) ধাতুর, "ইজাদেশ্চ গুরুমতোঽনৃচ্ছঃ। ৩।১।৩৫। ('ইচ্' আদিস্থিত যে গুরুসংজ্ঞাবিশিষ্ট ধাতু, তাহার উত্তর 'আম্' আগম হয়, 'লিট্'এর বিভক্তি পরে থাকিলে, 'ঋচ্ছ' ধাতু ভিন্ন অন্যত্র) এই সূত্রানুসারে, 'আম্' প্রাপ্তি হইবে; অতএব 'ইয়েষ', 'উবোথ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে না।

বার্ত্তিকমূলম্।—ন বাঽতজ্জাতীয়ব্যবায়াৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তজ্জাতীয়বর্ণ ব্যবধান না থাকাতে, সেই দোষ হইবে না। *

ভাষ্যমূলম্।—ন বা এষ দোষঃ।

কিং কারণম্।

অতজ্জাতীয়ব্যবায়াৎ। অতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতি।

কথং পুনর্জ্জায়তে। অতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতীতি।

এবং হি কং চিৎ কশ্চিৎ পৃচ্ছতি অনন্তরে এতে ব্রাহ্মণকুলে ইতি।

স আহ। নানন্তরে। বৃষলকুলমনয়োরন্তরেতি।

কিং পুনঃ কারণং কচিদতজ্জাতীয়কং হি লোকে ব্যবধায়কং ভবতি কচিন্ন।

সর্ব্বত্রৈবহ্যতজ্জাতীয়কং ব্যবধায়কং ভবতি।

কথমনন্তরাবিমৌগ্রামাবিতি।

গ্রামশব্দোঽয়ং বহ্বর্থঃ। অস্ত্যেব শালা সমুদায়ে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামো দগ্ধ ইতি।

অস্তি বাটপরিক্ষেপে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামং প্রবিষ্ট ইতি॥ অস্তি মনুষ্যেষু বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামো গতো গ্রাম আগত ইতি॥ অস্তি সারণ্যকে সসীমকে সস্থণ্ডিলকে বর্ত্ততে। তদ্‌যথা গ্রামলব্ধ ইতি। তদ্‌যঃ সারণ্যকে সসীমকে সস্থণ্ডিলকে বর্ত্ততে তমভিসমীক্ষ্যৈতৎপ্রযুজ্যতেঽনন্তরাবিমৌগ্রামাবিতি। সর্ব্বত্রৈব হ্যতজ্জাতীয়কং ব্যবধায়কং ভবতি॥

ভাষ্যানুবাদ।—অথবা এই দোষ হইবে না। কারণ কি?

যে হেতু, ভিন্নজাতীয় বস্তুরই ব্যবধান হইয়া থাকে। লোক-সমাজে ভিন্ন-জাতীয় বস্তু দ্বারাই ব্যবধান হইয়া থাকে।

ইহা কিরূপে জানিলে যে, ভিন্নজাতীয় বস্তুই ব্যবধায়ক হইয়া থাকে?

এইরূপ কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে যে, এই সকল ব্রাহ্মণকুল কি পরস্পর অনন্তর (অব্যবধান)?

সে বলে (উত্তর করে) যে, অব্যবধান নহে। বৃষণ (শূদ্র) কুল ইহা-দের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে।

তবে বা কি কারণেই আবার কোথাও অন্যজাতীয় বস্তু লোকে (মনুষ্য-সমাজে) ব্যবধায়ক হইয়া থাকে, কোথাও হয় না?

সর্ব্বত্রই অন্য জাতীয় বস্তু ব্যবধায়ক হইয়া থাকে।

তবে কিরূপে এই 'গ্রাম দুইটী পরস্পর অব্যবধান' এইরূপ বলা হইয়াছে?

এইখানে গ্রাম শব্দ বহু অর্থবাচক; কারণ, শালা (গৃহ) সমূহে, গ্রাম শব্দ বর্ত্তমানই আছে; যেমন,—(গৃহ দগ্ধ হইলে) 'গ্রাম দগ্ধ' এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

গ্রাম শব্দ, বাটপরিক্ষেপে (১) বর্ত্তমান রহিয়াছে; যেমন,—গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে অর্থাৎ গ্রামের সীমানাস্থিত রাস্তা অতিক্রম করিয়া কেহ গ্রামে প্রবেশ করিলে, তাহারও নাম গ্রাম।

মনুষ্য সমূহেও গ্রাম শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যথা,—(কোন মনুষ্য গেলে বা আসিলে) 'গ্রাম গিয়াছে, গ্রাম আসিয়াছে' এইরূপ বলা হয়।

---

(১) পূর্ব্বকালে গ্রামের চারিদিকে প্রাচীর এবং প্রাচীরের চারিদিকে বেষ্টিত রাস্তা থাকিত; এখনও 'জয়পুর' প্রভৃতি স্থানে রহিয়াছে। সেই রাস্তাকেই 'বাটপরিক্ষেপ' বলে।

গ্রাম শব্দ,—অরণ্যের সহিত, সীমার সহিত, স্থণ্ডিলের (১) সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং তাহা (এরূপ ব্যবহার) সম্পূর্ণ দেখিতে পাইয়াই এরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে যে, এই গ্রাম দুইটী পরস্পর অব্যবধান। সুতরাং সর্ব্বত্র ভিন্নজাতীয় বস্তু ব্যবধানকার হইবেক; অতএব লোকব্যবহার দ্বারাই যখন সিদ্ধ হইবে, তখন স্বরবর্ণ দ্বারা ব্যবধান না হয়, এমন ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ-সংজ্ঞা হয়, এইরূপ সূত্র বা বার্ত্তিক করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ।

মুখনাসিকাবচনঃ (১) অনুনাসিকঃ (১)

সূত্রানুবাদ।—মুখের সহিত এবং নাসিকার সহিত একত্র মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয় যে বর্ণ, তাহার 'অনুনাসিক' সংজ্ঞা হয়।

ভাষ্যমূলম্।—কিমিদং মুখনাসিকাবচনম্। মুখঞ্চ নাসিকা চ মুখনাসিকম্ মুখনাসিকং বচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

যদ্যেবং মুখনাসিক-বচন ইতি প্রাপ্নোতি।

নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বং ভবিষ্যতি।

অথবা মুখনাসিকমাবচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

অথ কিমিদমাবচনমিতি।

ঈষদ্বচনমাবচনমিতি। কিঞ্চিন্মুখবচনং কিঞ্চিন্নাসিকাবচনম্।

মুখদ্বিতীয়া বা নাসিকাবচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

মুখোপসংহিতা বা নাসিকাবচনমস্য সোঽয়ং মুখনাসিকাবচনঃ।

ভাষ্যমূলম্।—এই (সূত্রে) মুখনাসিকাবচন জিনিষটী কি?

মুখ এবং নাসিকা মুখনাসিক, মুখনাসিক হইয়াছে বচন (২) ইহার, সে মুখনাসিকাবচন।

যদি এইরূপই (সমাস) হয়; তবে মুখনাসিকবচন এইরূপ (আকার শূন্য 'ক' কার) প্রাপ্তি হইবে?

(তাহা হইলেও পুনঃ) নিপাতনের দ্বারা দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে।

---

(১) যজ্ঞার্থ নির্ম্মিত রেখাভ্যন্তরস্থ ভূমি।

(২) উচ্চারণের যে সাধক, তাহার নাম বচন।

অথবা মুখনাসিক হইয়াছে আবচন ইহার, তাহাই এই মুখনাসিকাবচন।

আবার এই আবচন জিনিষটাই বা কি ?

ঈষৎ (যৎকিঞ্চিৎ) বচনের নাম আবচন, কিঞ্চিৎ মুখবচন, কিঞ্চিৎ নাসিকা-বচন।

অথবা মুখদ্বিতীয়া (মুখকে সহায় করিয়া) নাসিকা হইয়াছে বচন ইহার, সেই এই মুখনাসিকাবচন।

অথবা মুখের সমীপে মিলিত হইয়াছে যে নাসিকা, তাহাই হইয়াছে বচন ইহার সে মুখনাসিকাবচন।

ভাষ্যমূলম্।—অথ মুখগ্রহণং কিমর্থম্। নাসিকাবচনোঽনুনাসিক ইতীয়ত্যুচ্যমানে যমানুস্বারাণামেব প্রাপ্নোতি। মুখগ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'মুখ' শব্দের গ্রহণ (সূত্রে) কেন করা হইল ?

যদি 'মুখ' শব্দের উল্লেখ না করিয়া, সূত্রে কেবল নাসিকা বচনকেই অনুনাসিক বলে ; তবে যম (১) এবং অনুস্বার প্রভৃতিরই কেবলমাত্র অনুনাসিক সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু পুনঃ 'মুখ' শব্দের গ্রহণ করিলে, কোনও দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথ নাসিকাগ্রহণং কিমর্থম্।

মুখবচনোঽনুনাসিক ইতীয়ত্যুচ্যমানে ক চ ট ত পানামেব প্রাপ্নোতি। নাসিকাগ্রহণে পুনঃ ক্রিয়মাণে ন দোষো ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, নাসিকা শব্দ গ্রহণ করা হইল কেন ?

'নাসিকা' গ্রহণ না করিয়া, মুখবচনোঽনুনাসিকঃ, কেবলমাত্র এত টুকুই বলিলে, 'ক চ ট ত প' ইহাদেরই অনুনাসিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু পুনঃ 'নাসিকা' শব্দের গ্রহণ করিলে, কোন দোষ হইবে না।

ভাষ্যমূলম্।—মুখগ্রহণং শক্যমকর্ত্তুম্। কেনেদানীমুভয়বচনানাং সিদ্ধং ভবিষ্যতি। প্রাসাদবাসিন্যায়েন। তদ্‌যথা কেচিৎ প্রাসাদবাসিনঃ কেচিদ্ভূমিবাসিনঃ কেচিদুভয়বাসিনঃ। তত্র যে প্রাসাদবাসনো গৃহ্যন্তে তে প্রাসাদবাসিগ্রহণেন। যে ভূমিবাসিনো গৃহ্যন্তে তে ভূমিবাসিগ্রহণেন। যে তূভয়বাসিনঃ

(১) বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণের পরে পঞ্চমবর্ণ থাকিলে, মধ্যে তৎসদৃশ যে একটী বর্ণের আগম হয়, তাহার নাম 'যম্'। যেমন,—পলিক্ক্নী চখ্খ্নতুঃ, অগ্গ্নিঃ, ঘ্ঘ্নন্তি ইত্যাদি। (ইহার ব্যবহার বেদেই দৃষ্ট হয়)।

গৃহ্যন্তে তে প্রাসাদবাসিগ্রহণেন ভূমিবাসিগ্রহণেন চ। এবমিহাপি কেচিন্মুখ-বচনাঃ কেচিন্নাসিকাবচনাঃ কেচিদুভয়বচনাঃ। তত্র যে মুখবচনা গৃহ্যন্তে তে মুখগ্রহণেন। যে নাসিকাবচনা গৃহ্যন্তে তে নাসিকাগ্রহণেন। যে উভয়বচনা গৃহ্যন্তে তে মুখগ্রহণেন নাসিকাগ্রহণেন চ।

ভাষ্যানুবাদ।—(সূত্রে) 'মুখ' শব্দ গ্রহণ না করিলেও চলে।

তবে ('মুখ' গ্রহণ না করিলে) সংপ্রতি কিরূপে (মুখ ও নাসিকা) উভয় স্থানোৎপন্ন বচনের (বর্ণের) অনুনাসিক সংজ্ঞা সিদ্ধ হইবে ?

প্রাসাদবাসিন্যায়ের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। যেমন,—কোন কোন লোক প্রাসাদে (অট্টালিকায়) বাস করে, কেহ কেহ ভূমিতে (মৃত্তিকোপরি) বাস করে, কেহ কেহ বা উভয় স্থানেই বাস করে ; তন্মধ্যে যাহারা প্রাসাদবাসী, তাহারা প্রাসাদবাসীগ্রহণেই গৃহীত হয়, যাহারা ভূমিবাসী তাহারা ভূমিবাসীগ্রহণেই গৃহীত হয়, আর যাহারা উভয়বাসী, তাহারা প্রাসাদবাসীগ্রহণেও গৃহীত এবং ভূমিবাসী গ্রহণেও গৃহীত হয়। সেরূপ এখানেও কোন কোন বর্ণ মুখবচন, কোন কোন বর্ণ নাসিকাবচন, আর কোন কোন বর্ণ উভয়বচন ; তন্মধ্যে যাহারা মুখবচন, তাহারা 'মুখ' গ্রহণেই গৃহীত হয়, যাহারা নাসিকাবচন, তাহারা নাসিকা-গ্রহণেই গৃহীত হয়, আর যাহারা উভয়বচন, তাহারা মুখ এবং নাসিকা উভয় গ্রহণে গৃহীত হয়।

ভাষ্যমূলম্।—ভবেদুভয়বচনানাং সিদ্ধম্। যমানুস্বারাণামপি প্রাপ্নোতি। নৈব দোষো ন প্রয়োজনম্।

ইতরেতরাশ্রয়ং তু ভবতি।

কা ইতরেতরাশ্রয়তাসতোঽনুনাসিকস্য সংজ্ঞয়া ভবিতব্যম্। সংজ্ঞয়া চানু-নাসিকো ভাব্যতে তদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্য্যানি ন প্রকল্প্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।—যদি উভয় বচনেরই সংযোগ সংজ্ঞা সিদ্ধি হয় ; তবে 'যম', 'অনুস্বার' প্রভৃতিরও ত প্রাপ্তি হইবে ?

হইলই বা, তাহাতে কোন দোষও নাই, কোন প্রয়োজনও নাই।

কিন্তু ইতরেতরাশ্রয়ত হইবে ?

কিরূপে ইতরেতরাশ্রয়তা (অন্যোন্যাশ্রয়তা) হইবে, যে পূর্ব্ব হইতে অনু-নাসিক বর্ত্তমান থাকিলেই তাহার পরে সংজ্ঞা হইতে পারে ; আবার সংজ্ঞা হইলে, পরে তাহা অনুনাসিক বর্ণকে গ্রহণ করে (পরস্পরের অপেক্ষা করি-

তেছে যে, অনুনাসিক বলিয়া কোন বর্ণ থাকিলে, তাহার সংজ্ঞা করিবে, আবার অনুনাসিক সংজ্ঞা হইলে, পরে তদ্দ্বারা অনুনাসিক বর্ণসমূহের গ্রহণ হইবে) সুতরাং ইতরেতরাশ্রয় হইবে। ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটিত কোনও কার্য্য (শাস্ত্রাদিতে) কুত্রাপি কল্পিত (ব্যবহৃত) হয় না।

বার্ত্তিকমূলম্।—অনুনাসিকসংজ্ঞায়ামিতরেতরাশ্রয়ে উক্তম্। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—অনুনাসিক সংজ্ঞাতে যে ইতরেতরাশ্রয় (জনিত দোষ ঘটিবে, তাহার পরিহার পূর্ব্বেই) উক্ত হইয়াছে। *

ভাষ্যমূলম্।—কিমুক্তম্।

সিদ্ধং তু নিত্যশব্দত্বাদিতি। নিত্যাঃ শব্দাঃ নিত্যেষু শব্দেষু সতোঽনুনাসিকস্য সংজ্ঞা ক্রিয়তে ন সংজ্ঞয়া অনুনাসিকো ভাব্যতে।

যদি তর্হিঃ নিত্যাঃ শব্দাঃ। কিমর্থং শাস্ত্রম্।

কিমর্থং শাস্ত্রমিতি চেন্নিবর্ত্তকত্বাৎ সিদ্ধম্। নিবর্ত্তকং হি শাস্ত্রম্।

কথম্।

আঙস্মা অবিশেষেণোপদিষ্টোঽননুনাসিকস্তস্য সর্ব্বত্রাননুনাসিকবুদ্ধিঃ প্রসক্তা তত্রানেন নিবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। ছন্দস্যচি পরত আঙোঽনুনাসিকস্য প্রসঙ্গেঽনুনাসিকঃ সাধুর্ভবতীতি।

ভাষ্যানুবাদ।—কি বলা হইয়াছে?

শব্দ নিত্য বলিয়াই সমস্ত প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যাবতীয় শব্দই নিত্য; সুতরাং নিত্য শব্দের মধ্যে স্বতঃই সিদ্ধ রহিয়াছে যে অনুনাসিক, তাহার সংপ্রতি এই সূত্র দ্বারা সংজ্ঞা করা হইতেছে; কিন্তু সংজ্ঞা করিবার পরে যে, সংপ্রতি অনুনাসিক বর্ণ উৎপন্ন হইল, তাহা নহে।

শব্দ যদি তবে নিত্যই হয়, তবে আর শাস্ত্র করিবার প্রয়োজন কি? (যেহেতু, অসিদ্ধ বিষয়কে সিদ্ধ করিবার জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন; যদি তাহা নিত্য সিদ্ধই হইল, তবে আর শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?)

যদি এই কথা বল যে, "শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?" তবে নিবর্ত্তকত্ব হেতুই শাস্ত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। শাস্ত্র হইয়াছে (নিষিদ্ধ বিষয়ের) নিবর্ত্তক।

কিরূপে?

যেমন 'আঙ্' উপসর্গটী, ইহাকে (এই ছাত্রকে) সাধারণ ভাবে নিরনুনাসিক উপদেশ করা হইয়াছে; সুতরাং ইহার সর্ব্বত্রই নিরনুনাসিকবুদ্ধি, প্রসঙ্গ ক্রমে উপস্থিত হইবে; এবং তাহাই এই (পরবর্ত্তী) সূত্র দ্বারা নিবৃত্তি করা

শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। তবে অনেকদিন হইতে তাঁহার জীবনী ও উপদেশ শুনিয়া ও পড়িয়া আসিতেছি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার অনেক ভক্তের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ ঘটিয়াছে। তাঁহার ভক্তদের মধ্যে অনেকে এবং যাঁহারা ইহাঁদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এরূপ অনেকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমি অবতারবাদ ভালরূপ বুঝি না। তবে পল্লবগ্রাহী হইয়া সকল শাস্ত্রের সাধুভক্ত, ঋষি, মহাপুরুষ, অবতার সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি এবং নিজে কিছু কিছু ঘুরিয়া নানা স্থানের সাধু মহাপুরুষ দর্শন করিয়া ও অপর ভ্রমণকারিগণ মুখে সাধুদের বৃত্তান্ত শুনিয়া বর্ত্তমান সাধুগণের জীবন যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার মনে এই ধারণা দিন দিন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মত লোক এ পর্য্যন্ত কেহ জন্মেন নাই। মনে হয়, তিনি যেন প্রাচীন সমুদয় মহাপুরুষগণের সমষ্টি এবং তাহা হইতেও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। আমি তাঁহার সম্বন্ধে দু একথা লিখিতেছি, ইহাতে তাঁহার কোন মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইবে না জানি, কিন্তু তাঁহার সহিত চাক্ষুষ না হইলেও তাঁহার শক্তিতে মহান্ উপকার পাইয়াছি ও পাইতেছি। সুতরাং তাঁহার বিষয়ে দু এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মহাপুরুষেরা সকল সময়েই নিজ নিজ সময়ের আদর্শ হইতে অনেক উচ্চতর আদর্শ দেখাইয়া যান। খুব অল্প লোকই তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারে। আজ যে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে, ইহা সমাজের পক্ষে অতি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এমন উদার বিশ্বজনীনভাব, এমন দৃঢ়নিষ্ঠা, এমন অদ্ভুত ত্যাগ, এমন গভীর ভাবসমাধি, এমন ভক্তি, এমন জ্ঞান, এমন জীবহিতনিষ্ঠা, এমন সরল ভাষায় গভীর তত্ত্বের উপদেশ লোকে দেখে ত নাইই, শুনেও নাই। অবতারবাদ না বুঝিতে পারি, কিন্তু নিজের কল্পিত একটা ঈশ্বরের উপাসনার চেয়ে ইহঁার উপাসনা করিলে যে বেশী উপকার পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি। সরল প্রাণে যে তাঁহার নিকট গিয়াছে, সেই, সেই জীবনের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে নাই আর বাস্তবিক যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সরল প্রাণে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছে, সেও সেই শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইবেই হইবে বলিয়া আমার ধারণা।

এমন বিশ্বব্যাপী উদারতা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন? সকল ধর্ম্মই সত্য, তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি বলিতেন, যে যে বিশ্বাসে আছ, তাহাই দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাক। শেষে যদি কিছু তোমার ভুল থাকে, সব ঘুচিয়া গিয়া সত্যই পাইবে। এটা ভ্রান্ত মত, ওটা ঠিক—এই সব কথা বলিয়া আস্ফালনকারী জনগণের নিকট তাঁহার শক্তি এই ঘোষণা করিতেছে, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সৃষ্ট সবই সত্য—তাহার ভিতর যাহা মায়িক অংশ আছে, তাহা আত্মার উন্নতি হইলে আপনিই চলিয়া যাইবে। আর তুমি সত্য পাইয়াছ, অপরে মিথ্যা লইয়া আছে, কি করিয়া জানিলে? যদি সত্যকে যথার্থ পাইয়া থাক, তবে তোমার উপস্থিতিতেই সব অজ্ঞান ধ্বংস হইবে। তুমি গঠন কর, ধ্বংস করিতে বৃথা শক্তিক্ষয় করিও না।

তাঁহার ত্যাগ আমাদের নিকট বলিতেছে আসক্তিরূপ অন্যায় বন্ধনকে কেন ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছ? কেন কপটতার জাল বিস্তার করিতেছ? তোমার সম্বন্ধ কেবল অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে, কেন নারীর সহিত অন্যায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সংসারের বীজ রোপণ করিয়া পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, মাসী খুড়ী প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছ? প্রবুদ্ধ হও; দেখ, তোমার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধই কেবল নিত্য। তবে ইহা একেবারে বুঝিতে না পার, অজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে যদি তোমার এতই ভাল লাগে, তবে উহাকে অজ্ঞান বলিয়াই জানিয়া রাখ—একদিন জ্ঞানের আশা আছে। আপন দুর্ব্বলতা স্বীকার কর। সংসারে যদি থাকিতেই চাও, তবে উহাকে ঈশ্বরের সংসার করিয়া লও। একদিন বন্ধন আপনিই খসিয়া যাইবে।

তিনি যেন বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়িয়া গিয়া গভীর ধ্যানসমাধির রাজ্যে চলিয়া যাও। সেই খানেই পরম আনন্দ। এখানে যেমন সুখ, তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়া দুঃখ। 'এ যেন আমড়ার অম্বল খাওয়া। শাঁস নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল হয়। তেতলার গদির উপর আসিয়া শয়ন কর, আর নীচের অন্ধকার কুটুরীতে থাকতে ভাল লাগবে না।'

তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। অনেকে আছেন, তাঁহারা মুখে অনেক ত্যাগের কথা বলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সাধারণ সংসারী ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের কোন পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। ইনি কিন্তু যাহা বলিতেন, তাহা কাযে করিতেন। নারীজাতি মাত্রকেই তাঁহার ভগবতী

বলিয়া ধারণা ছিল। এ কি একটী সহজ কথা মনে করিতেছেন? যাহা লইয়া বিশ্ব সংসার মুগ্ধ, শুধু মুগ্ধ নহে. জগৎ যাহাকে একমাত্র সার জানিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে, তাহাকে ত্যাগ করা কি সহজ বীরত্বের কায? এ কে বুঝিবে? তাঁহার সত্যই সকলকে দেবীধারণা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কেবল ভক্তিমাত্র ছিল। হায়, কবে আমরা ইহার কণিকা উপলব্ধি করিতে পারিব?

তিনি আহার অতি যৎসামান্য করিতেন, পোষাকের দিকে নজরই ছিল না, এমন কি. কাপড়খানাই সব সময়ে কোমরে থাকিত না। শুধু বিলাসের দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না, তাহা নহে, বিলাসের সাধন অর্থের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ভয় ছিল। যে অর্থকে আমরা জীবনের সার সর্ব্বস্ব করিয়া জানি, তাহাকে তিনি এত ভয় করিতেন যে, ধাতু দ্রব্য স্পর্শ মাত্র তাঁহার হাত বেঁকিয়া যাইত। কেহ কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার বিছানার নীচে কোন ধাতুদ্রব্য রাখা হইয়াছে। তিনি সেই বিছানা স্পর্শ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নিদ্রা অতি অল্প ছিল। বস্তুতঃ তিনি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবচ্চিন্তায়, তন্নামকীর্ত্তনে ও পরহিতে কাটাইয়া দিতেন।

তাঁহার অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। তিনিই আগে সকলকে প্রণাম করিতেন। একবার তাঁহার সাধন অবস্থায় কোন ডাক্তার দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। তিনি ইহাঁকে বাগানের মালি মনে করিয়া ফুল তুলিয়া দিতে বলেন। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা সম্পাদন করেন। এই ডাক্তার তাঁহার অসুখের সময় দেখিতে আসিয়া আশ্চর্য্য ও সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়াছিলেন, এঁ্যা, এঁকেই যে আমি ফুল তুলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম! ইনি কখন এমন অভিমান করিতেন না যে, আমি নানাগুপ্তবিদ্যা জানি, তাঁহার সরল হৃদয় হইতে কেবল ভগবৎ কথা বাহির্গত হইত।

তিনি সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেন। দার্শনিক বাগ্‌বিতণ্ডার কখন কাল কাটান নাই, অথচ অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে জটিল দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সার সিদ্ধান্ত বলিতে পারিতেন। তাঁহার জ্ঞান—সেই অনন্ত জ্ঞানের উৎস হইতে নির্গত হইত বলিয়া এবং উহা পুঁথিগত ছিল না বলিয়া কখন ফুরাইত না। তিনি কখন জ্ঞানের কথা বলিতে শ্রান্ত হইতেন না। ভক্তির কথা আর কি বলিব? যাঁহারা তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা নৃত্য, তাঁহার প্রেমাশ্রু

বিসর্জ্জন ও ভাবসমাধি দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান—তাঁহারা নিশ্চয়ই কিছু অপূর্ব্ব জিনিষ দেখিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ কি ?

তাঁহার দয়ার কথা বলিব। তাঁহার ভক্তেরাই তাঁহার দয়ার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন। তিনি যেচে যেচে লোককে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে ভগবৎ পথে আনিতে চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাহিতা ছিল। তিনি যাই শুনিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কোন অসাধারণ গুণে গুণবান্, তখনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। এইরূপে কেশব সেন, বিদ্যাসাগর, শশধর প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল।

তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি জানি? কিই বা লিখিব? তাঁহার শক্তি এক্ষণে তাঁহার ভক্তদের ভিতর অল্লাধিক পরিমাণে খেলিতেছে। অন্ধ, সে অতি অন্ধ, যে দেখিয়াও দেখিতেছে না।

বিশ্বাস।

'বিশ্বাস' কথাটী লইয়া অনেক সময় মারামারি হইয়া থাকে। 'বিশ্বাস ব্যতীত মুক্তি হয় না', 'বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি,' 'বিশ্বাসে মিলিবে বস্তু তর্কে বহুদূর', ইত্যাকার অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হয়, 'বিশ্বাস' শব্দটীর ঠিক পরিষ্কার ধারণা খুব কম লোকেরই আছে। যা শুনিব, তাই মানিব, ইহারই নাম কি বিশ্বাস? না, উহা কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি? উহা কি সহজ, অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেই হইল, না, উহা কঠোর সাধন-লভ্য? কি বিশ্বাস করিব? কি বিশ্বাস করিলে মুক্তি হইবে? তর্ক বিশ্বাসে কোন কার্য্যকারণ ভাব আছে কি না? বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষে কি সম্বন্ধ? যাহা বিশ্বাস করা যায়, অর্থাৎ মানিয়া লওয়া যায়, তাহাই যদি চিন্তাবলে প্রত্যক্ষ হয়, তবে সে প্রত্যক্ষের মূল্য কতদূর এবং সে বিশ্বাসও বিপথপ্রেরক কি না? ইত্যাদি বহু সন্দেহ উঠে।

প্রথমতঃ, যদি বলা যায়, যা শুনিব, তাই মানিব, ইহাই বিশ্বাস, তবে একজনের নিকট শুনিলাম, ভূত আছে, মানিলাম, আবার অপর জন বলিল, নাই, আমিও অমনি বলিলাম, নাই। এইরূপ হইলে ত সেই বিশ্বাসপরায়ণ

ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্রতাই থাকে না, দেখিতেছি। সে ত পশুতুল্য, যন্ত্রতুল্য হইয়া যায়। সেত আর মানুষ থাকে না। ইহাতে যদি বলা যায়, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিব, তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য, একজনকে আপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবে কিরূপে? যদি বল, পাঁচ জনের কথায় তাহাকে আপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করিব, তবে ত তুমি পাঁচ জনকেই অগ্রে বিশ্বাস করিলে। যদি বল, শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করিব, তাহা হইলে, তোমায় জিজ্ঞাসিব, শাস্ত্র এখন অবিকৃত-ভাবে আছে, তাহার মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, কিরূপে জানিলে? আর যদিও অবিকৃতই থাকে, তাহা হইলেও উহার অর্থ বুঝিতে ত অনেক গোল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার টীকাকারেরা ত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিতেছেন। এখন যাইবে কোথায়? যদি বল, যাহা হয়, একটা ধরিয়া পড়িয়া থাকিব, তুমি তর্ক তুলিয়া আমার শান্তিভঙ্গ কর কেন, তবে তোমায় বলিব, ভাই, তুমি তোমার বিশ্বাসের ব্যাসাতি লইয়া দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক, বিশ্বাস বিশ্বাস বলিয়া অপরের শান্তিভঙ্গ করিও না।

বিশ্বাস বাস্তবিক একটী অন্তঃকরণ বৃত্তি। আমি লণ্ডন দেখি নাই, কিন্তু ভূগোলে পড়িয়া বা লণ্ডনপ্রত্যাগত ব্যক্তির নিকট শুনিয়া লণ্ডনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। এখন এই বিশ্বাসের ভিত্তি, আমার ভূগোললেখকের বা লণ্ডনপ্রত্যাগতের কথায় বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসে অনেক সময় কার্য্য নির্ব্বাহ হইলেও এই বিশ্বাস কি সত্যাসত্য সঠিক রূপে নির্ণয়ে সমর্থ? হইতে পারে, ভূগোললেখক বা আমার বন্ধু আমাকে প্রতারিত করিয়াছে। দেখিতে পাই, যাহাকে আজ পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করি, কাল সে বিশ্বাসঘাতকতা করিল। যে স্ত্রী, যে পুত্র, যে বন্ধুকে কত বিশ্বাস করিতাম, তাহারা কত প্রতারণা করিল। বিশ্বাস করিয়া সাধুর নিকট গেলাম, সাধু ঠকাইল, তবে বিশ্বাস করি কাহাকে? বিশ্বাস বলিয়া মনোবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু বিশ্বাস-পাত্র কে?

বিশ্বাসরূপ মনোবৃত্তির অর্থ এই, যাহা আমার পরোক্ষ, তাহার যতক্ষণ না সাক্ষাৎকার হয়, ততক্ষণ তাহার অস্তিত্ব অপরের বাক্য মানিয়া লওয়া। আমি লণ্ডনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আমি এখন লণ্ডন দেখিতেছি না বটে, কিন্তু লণ্ডনদর্শী পুরুষ আমাকে বলিবেন, তুমি যদি এত অর্থসংগ্রহ ও এইরূপ আয়োজন করিতে পার, তবে তোমায় লণ্ডন দেখাইতে পারি। সুতরাং আরো দেখা গেল, যাহার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা আছে, তাহারই

উপর বিশ্বাস সম্ভবপর। যদি কেহ কোন বিষয় এমন বলে, যাহা আমি সহস্র চেষ্টাসত্ত্বেও কখন সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, সে বিষয়ের যথার্থ বিশ্বাস কখন হইতে পারে না, বিশ্বাসের কোন প্রয়োজনও নাই।

সংসারে যে বিশ্বাস পূর্ব্বক অনেক কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা ঠিক। কিন্তু সে বিশ্বাস আপেক্ষিক, তাহা অল্পবিস্তর সন্দেহ জড়িত। অনেক সময় অতিরিক্ত বিশ্বাসী বাস্তবিক বোকা বা পাগল, তাহার সন্দেহ নাই। সন্দেহের অর্থ অবিশ্বাস নহে, অবিশ্বাসও এক প্রকার বিশ্বাস। সন্দেহের অর্থ মনের স্থিতি না হওয়া। তা এমন কোন্ মানুষ আছে, যাহার সম্পূর্ণ স্থিতিপদ লাভ হইয়াছে?

এতক্ষণ সাংসারিক বিশ্বাসের কথা হইল—দেখা গেল, সংসারের কাহারও প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব। যদি কোন ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসস্থাপন অসম্ভব হয়, তবে কি গুরু ও শাস্ত্র বাক্যেও অবিশ্বাসী হইতে হইবে?

এখন কথা এই, শাস্ত্র কি আর গুরুই বা কে? দেখিতেছি, অনন্ত শাস্ত্র, অনন্ত মত, কাহার কথা বিশ্বাস করি, কাহার কথা মানি? অসংখ্য গুরুবেশধারী, সাধুবেশধারী রহিয়াছেন, কত লোকে কতবার কি ইহাঁদের দ্বারা প্রতারিত হন নাই? কচিৎ কেহ কখন সদ্গুরু পাইয়াছেন।

এতক্ষণ অন্যমত খণ্ডন করিলাম। এখন কি বলিতে চাই, তাহা বলিব। যতক্ষণ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ বিশ্বাস ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, যদি সেটী বিশ্বাসের কোন প্রয়োজন থাকে। আমি ভূত দেখি নাই—ভূত মানি, কারণ, ভূতে আমার প্রয়োজন আছে। কি প্রয়োজন—না, ভূত থাকিলে অবশ্য আমার ইহাও বিশ্বাস হইবে যে, দেহ যাইলে আত্মাও থাকিবেন। এই আত্মা থাকা আমার প্রয়োজন—আমার প্রাণ আত্মা না মানিয়া তৃপ্ত হয় না। কতকগুলি বিষয় আছে, যে গুলি মানিলেও কিছু আসিয়া যায় না, না মানিলেও কিছু আসিয়া যায় না, সেগুলিতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কেবল তর্ক জমাইবার জন্য এইগুলির আলোচনা হইয়া থাকে। যাহা আমার দেখিবার, শুনিবার বা কোন রূপে সাক্ষাৎকার করিবার কখনও সম্ভাবনা নাই, তাহার অস্তিত্ব আছে কি না, বিচারের কি প্রয়োজন? যাহাতে আমার প্রয়োজন, তাহাই বিশ্বাস করিয়া সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা আবশ্যক।

পরমাত্মা ও আত্মা সম্বন্ধীয় বিশ্বাসও সাধনলভ্য। গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাসও সাধনলভ্য।

আমাদের আবশ্যক, এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা, অন্য সব বিশ্বাস তাড়াইয়া দেওয়া। পিতামাতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র সকলেতেই অবিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে—পরমাত্মাতে আর যাঁহার নিকট পরমাত্মা উপলব্ধির সাহায্য পাওয়া যাইবে, এমন গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে। শুধু তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস নয়, তিনিই সর্ব্বস্ব বলিয়া বিশ্বাস—সেই বিশ্বাস হইতেই ক্রমশঃ তীব্র সাধন বলে তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়। সাংসারিক বিশ্বাস সন্দেহজড়িত, এ বিশ্বাসেও যে প্রথম প্রথম সন্দেহ থাকে না, তাহা নহে। তবে সাংসারিক বিশ্বাসপাত্রে সন্দেহ ঘনীভূত হয়, কিন্তু পরমাত্মায় বিশ্বাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া শেষে পরোক্ষ বিশ্বাস চলিয়া গিয়া অপরোক্ষানুভূতি হয়।

সাংসারিক কতকগুলি বিশ্বাসের ফল, পরিণামে প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু তাহাদের ফল অনিত্য, সুতরাং সে বিশ্বাসে সাংসারিক ফলোপধায়কতা আছে, পারমার্থিক নাই।

বিশ্বাসের আর একটী দিক্ দেখা যাউক,—কোন মানুষের অপর মানুষে কি এমন যথার্থ বিশ্বাস হইতে পারে যে, তাহার দ্বারা কোনরূপ অসৎ কর্ম্ম সম্ভব নয়? আপনার প্রিয় যাহা কিছু, আপনার টাকা কড়ি, আপনার স্ত্রী, এমন কি আপনার দেহ এবং মন পর্য্যন্ত তাহার উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে? সংসারে দেখিতেছি, বিশ্বাসের পশ্চাতে সন্দেহ ছায়ার ন্যায় বিরাজিত। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব, দাস দাসী কাহারও প্রতি কি বাস্তবিক বিশ্বাস হয়? আর এই বিশ্বাসে বাস্তবিক উন্নতি হয়, কি অবনতি হয়? মনে করুন, একজন ব্যক্তি আপনার ছেলের প্রতি বিশ্বাসী। তিনি মনে মনে বিশ্বাস করেন, আমার ছেলে কখনো মিথ্যাকথা কহিবে না। এরূপ বিশ্বাস করিলে ছেলের বেশী উন্নতি হয়, না, যদি সর্ব্বদা সন্দেহবশবর্ত্তী হইয়া তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে চালান যায়, তবে তাহার বেশী উন্নতি হইতে পারে? আমার বোধ হয়, বিশ্বাস—বিশ্বাসপাত্র ও বিশ্বাসকারী উভয়ের উপর নির্ভর করে। সচরাচর যে সকল বিশ্বাস দেখা যায়, তাহা বড় স্থায়ী হয় না। এইরূপ হিসাবে ধরিলে বরং সন্দেহকেই জগৎ সংসারে কার্য্যক্ষেত্রের ভিত্তি করাই উচিত বোধ হয়—যাহা কিছু কার্য্যতঃ বিশ্বাস করা যায়, তাহাতে মনের সন্দেহ একেবারে যায় না। ব্যক্তিবিশেষের উপর অনেক পরীক্ষার পর অনেক পরিমাণে বিশ্বাস দেখা যায় বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কথাও ত অনেক শুনা যায়। তবে কি এমন কোন

ব্যক্তি নাই, যাঁহার উপর নিঃসংশয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারে?—সর্ব্ববিষয়ে? বোধ হয়, সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি দেহধারী হইয়া কখন আসেন, তবেই সম্ভব হইতে পারে।

প্রকৃত বিশ্বাস বলিতে আমি বুঝি, সর্ব্ব জীবের ব্রহ্মত্বে বিশ্বাস। ইহা নিজের কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। অপরকে যতই খারাপ দেখি না কেন, তাহার ব্রহ্মস্বরূপত্বে সদাই বিশ্বাস রাখা—শুধু মতে মানিয়া লওয়া নহে, তাহার ভিতর যথার্থই ভগবানকে দেখা, ইহা অনেক তপস্যা না করিলে হয় না। ইহাতে যে বিশ্বাস উপার্জ্জিত হয়, তাহা বিশ্বাসপাত্রের কোনরূপ সদ্‌গুণ বা অসদ্‌গুণের উপর নির্ভর করে না।

আমরা সাধারণতঃ লোকের গুণদোষ দেখিয়া বিচার করিয়া থাকি। কাহাকেও বিশ্বাসপাত্র ভাবি, কাহারও উপর বা ঘোর অবিশ্বাস করিয়া থাকি। কাহাকেও কতকটা বিশ্বাস করি আবার কতকটা চোকে চোকে রাখি। কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ অবশ্য না করিলে চলে না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই আমাদের এত দুঃখ—আমাদের এবং অপরেরও কোন উন্নতি হয় না। বাস্তবিক নিজে উন্নত হইয়া যত অপরের উপর, অপরের ব্রহ্মত্বে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারা যাইবে, ততই আমাদের নিজেদের উন্নতি এবং অপরেরও উন্নতি।

এইরূপে অপরের সহস্র দোষ সত্ত্বেও তাহার ব্রহ্মত্বে বিশ্বাসী হইতে পারিলে নিজের ত উন্নতি হয়ই, আবার বিশ্বাসপাত্রেরও উন্নতি হইয়া থাকে। আমাকে যদি কেহ সর্ব্বদা অনন্তশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বসদ্‌গুণের আধার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পূজা করিতে আন্তরিক ভাবে দিন রাত প্রস্তুত দেখি, তবে কি আমার কখন মনে হইবে না যে, বোধ হয়, আমি বাস্তবিকই ঐরূপ, এখন কতকগুলি আবরণে জড়িত হইয়া পড়িয়া আপন স্বরূপ ভুলিয়াছি মাত্র, আপনার যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ করিতে হইবে—একটা লজ্জাও কি আমাদের উপস্থিত হইবে না?

এই বিশ্বাস উপার্জ্জিত না হইলে আমাদের অশান্তির সীমা পরিসীমা থাকে না, উন্নতির কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ছাত্রকে শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষকের যদি বিশ্বাস থাকে, আমি শত চেষ্টায় ছাত্রের কিছু করিতে পারিতেছি না, ইহা ছাত্রের দোষ নহে, উহার ভিতরে ব্রহ্ম নিদ্রিত রহিয়াছেন, আমার শক্তিহীনতাবশতঃ উহাকে আমি জাগাইতে পারিতেছি না, তাহা হইলে

কি তাহাতে ছাত্রের উন্নতির পথ মুক্ত হয় না? আধ্যাত্মিক গুরুও শিষ্যসম্বন্ধে এইরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস—শিষ্যের ভিতরে সেই ব্রহ্ম রহিয়াছেন' সে যতই খারাপ হউক না কেন, আমি যখন তাহার ভার লইয়াছি, তখন উহাকে জাগাইতে হইবেই হইবে। এই বিশ্বাস—উন্নত মহাপুরুষগণে সাক্ষাৎ অপরোক্ষজ্ঞানের নামান্তর এবং তাঁহাদের হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নদরের ব্যক্তিতে পরোক্ষজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। বাস্তবিক ধর্ম্মে যে বিশ্বাসের এত প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা সেই বিশ্বাস, ইহা দৃঢ় ধারণা। নতুবা যা তা মানিয়া লওয়া নহে।

অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া একটা কথা শুনা যায়। বাস্তবিক 'বিশ্বাস' এই মহৎ ভাবের সহিত অন্ধ কথাটী জড়ানো ঠিক নয়। অন্ধবিশ্বাস বাস্তবিক আর কিছুই নহে, উহা মনের জাড্য বা আলস্যের ফল বিশেষ—উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই।

পূর্ব্বে এক স্থলে বলা হইয়াছে, আমাদের যে দিকে ঝোঁক হয়, সেই দিকেই বিশ্বাস হইয়া থাকে। তবে কি এই বিশ্বাসকে একেবারে বর্জ্জন করাই সত্যানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নহে? কেবল যুক্তি অবলম্বন করিয়া গেলেই ত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু হায়, এই যুক্তিটীর স্বরূপ যদি আমরা একবার ভাবিয়া দেখি, তবে আমাদিগকে একরূপ হতাশ হইতে হয়। যে দিকে ঝোঁক থাকে, যুক্তি তাহারই সত্যতা প্রতিপাদন করে মাত্র। যুক্তি কোন নূতন আলোক দিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক জগতেই বলুন, আর আধ্যাত্মিক জগতেই বলুন, বিশ্বাসেই ষোলর আনা চলিতেছে, দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতিবাদী। কিন্তু তিনি এমন কি প্রমাণ পাইয়াছেন যে, বাস্তবিক নিম্ন হইতে ক্রমাগত উচ্চেই যাইতেছে? তিনি কেবল কতকগুলি জীবের মধ্যে উন্নতি অবনতির মাত্রা নির্ণয় করিয়াছেন মাত্র। উন্নতই যে ক্রমশঃ অবনত হয় নাই, ইহাই বা তাঁহাকে কে বলিল? তবে তিনি ইহা বিশ্বাস করেন এই জন্য যে, উন্নতি হইলেই তাঁহার ভাল লাগে।

যদি ইহা কখন সম্ভব হয় যে, আপনার রুচির দিকে, ঝোঁকের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল সত্যানুসন্ধান করিবার ইচ্ছা হয়, তবে একদিন বিশ্বাসকে সমূলে উৎপাটন করা যাইতে পারে, কিন্তু জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মানুষের মনোবৃত্তিকে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিতে বিশ্বাস বা তাহাদের দিকে ঝোঁক স্বাভাবিক। সাত্ত্বিক ব্যক্তি ইহাদের অস্তিত্বের সপক্ষে যে সকল যুক্তিপ্রদান করেন, রাজসিক তামসিক লোকের তাহাতে কখনই পরিতৃপ্তি জন্মিতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে এই সাত্ত্বিক বৃত্তিকেও উন্নত অবস্থায় সত্যানুসন্ধানের অন্তরায় বলা হইয়াছে। 'এই তিন জনই চোর।' তবে সাত্ত্বিক বৃত্তিরূপ চোর অপেক্ষাকৃত সদয়। সেইজন্ত সে প্রকৃত সত্যকে দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে পলাইয়া আসে।

আর একটী কথা আসিতেছে। কোন একটী বিষয় বিশ্বাস করিতে করিতে এমন কি হইয়া যায় না যে, তাহাই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়? কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাস করা ছিল বলিয়াই তাঁহার প্রত্যক্ষই বল আর যাহা কিছু বল, সবই হইয়া থাকে। এ সকল পূর্ব্ব সংস্কারের ফল মাত্র। ইহাতে বাস্তবিক বিশ্বাসের কতদূর শক্তি, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যদি বিশ্বাস করিয়া তাহার যথাবৎ কার্য্য হওয়া স্বীকার করা যায়, তবে সে বিশ্বাস করা আর যথার্থ কোন বিষয় হওয়া এক হইয়া দাঁড়াইল। কোন ব্যক্তির যদি বিশ্বাসে ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, বিশ্বাসে ব্যারাম সারে, বিশ্বাসে মনের উন্নত অবস্থা হয়, তবে এ বিশ্বাসে আর প্রত্যক্ষে প্রভেদ কোথা, তাহা ত দেখিতে পাই না। বলিতে পার, একজন পাগলেও আপনাকে রাজা বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে কি সে বাস্তবিক রাজা? আমি বলি, রাজা বলিতে বুঝ কি, বল দেখি? রাজার যে মনোবৃত্তি, রাজার যে সুখ দুঃখ, সবই যখন সে ব্যক্তিতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে রাজা বলিতে হইবে বৈ কি! বাস্তবিক মনের শক্তি অসীম। এই বিশ্বাসের দার্শনিক নাম ধারণা। এই ধারণাবলে অসাধ্য সাধন করা যাইতে পারে।

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, যদি তোমাদের এক বিন্দু সর্ষপবীজের মত বিশ্বাস থাকিত, তবে পাহাড়কে এখান হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেও সরিয়া যাইত। বিশ্বাস এখানে ইচ্ছাশক্তির দার্ঢ্য অর্থে ব্যবহৃত। এই ইচ্ছাশক্তিবলে আমরা যাহাকে অলৌকিক বলি, এরূপ শত শত কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

জ্ঞানিগণ 'বিশ্বাস' সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়া থাকেন, তাহা বড় অপূর্ব্ব। তাঁহারা বলেন, প্রত্যক্ষ বলিয়া কিছু নাই, সবই বিশ্বাস। তুমি যে সন্দেশ খাইয়া তৃপ্ত হইতেছ, আবার অপর জিনিষের ঘ্রাণ মাত্র নাসিকা কুঞ্চিত

করিতেছ, ইহা তোমার বিশ্বাসের ফলমাত্র। তুমি এ জন্মে না করিয়া থাক, পূর্ব্বজন্মে এ অভ্যাস করিয়াছ। আর এই সকল ভ্রান্তবিশ্বাস—এই সকল কুসংস্কার তাড়াইয়া একমাত্র সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই বিশ্বাস উপার্জ্জন করিতে পারিলেই সমুদয় হইয়া গেল। জ্ঞানী সংসারকাতর জীবকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'কথং বোদিষি বে বৎস নামরূপং ন তে ন মে।' বলেন, তুমি সর্ব্বশক্তিমান, তুমি অনন্ত—তুমি কেন আপনাকে ক্ষুদ্র বিশ্বাস করিয়া ভ্রমে পড়িয়া আছ? অনন্ত জগতের রাজা, তুমি কোথায় রাজা খুঁজিয়া বেড়াইতেছ? হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।

ব্রাহ্মণ।

হে ব্রাহ্মণ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, দান্ত, ধীর,
সর্ব্বভূতে আত্মা জানে সদা চিত্তে রত,
ভুলিলে স্বরূপ নিজ, জাগো জাগো বীর,
জগৎবাসীরে পুনঃ দেখাও সুপথ।

অধ্যাত্মরাজ্যের গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার,
ভুলি অধিভূত কার্য্যে কেন দাও মন,
জান না কি, শাস্ত্রে বলে, জানে ব্রহ্ম যার,
ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বভূতে সেই সে ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ যে, নাহি জানে সে ত কভু দ্বেষ,
যশোলিপ্সা, ধনলিপ্সা, প্রভুত্ব বাসনা
নাহি কভু হৃদে তার, শুধু পরমেশ
আর ভূতহিতচিন্তা হৃদয়ে ভাবনা।

আব্রহ্মচণ্ডালে কোল দেয় অনায়াসে,
গর্ব্ব তার হৃদি কভু স্পর্শিবারে নারে,
ব্রহ্মতেজে তেজোময় মন তাঁর বশে,
নমস্তাপ তৃণ বলি তাঁর কাছে হারে।

প্রশান্তহৃদয়, মন সদা চিদাকাশে;
পুরুষপ্রকৃতিলীলা করে নিরীক্ষণ —
পরাবিদ্যা সাধনায় বদ্ধ তাঁর পাশে—
অধিকারী জনে গিয়ে করয়ে ভজন।

অনন্ত শক্তির হয়ে এক অধীশ্বর,
ধরিয়ে ক্ষুদ্রের নাম—জীবহিততরে
সদা শক্তিবিনিয়োগ—সর্ব্বচরাচর
কারো দুখ হৃদে কভু সহিবারে নারে।

শুচি, কার্য্যদক্ষ অতি, সৌম্যমূর্ত্তিধর,
দেখিলেই ইচ্ছা হয়, নোয়াই এ শির;
নির্লোভ নিষ্কাম সদা, দানে মুক্তকর,
দুঃখেতে সহিষ্ণু অতি—বিপদেতে বীর।

অপমান তিরস্কার অমৃত যেমন,
মানে বিষ বলি সদা দূরে পরিহার,
প্রেমিক সুজন, নাহি ধার্ম্মিকের ভান,
ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী আজন্মকুমার।

যথা কুহকের বশে চক্রবর্ত্তী রাজা
আপনারে দীন বলি করয়ে গেয়ান;
সেইরূপ হে ব্রাহ্মণ, তুমি মহাতেজা,
সত্য কি বারেক দেখ করিয়া খেয়ান।

ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নি—দাও উড়াইয়া—
ফুৎকারেতে ঐ ভস্ম—হোক সুপ্রকাশ।
লক লক করি বহ্নি উঠুক ভেদিয়া,
করুক আচ্ছন্ন দিগ্‌দিগন্ত আকাশ।

সে আগুনে হবে ভস্ম অজ্ঞানের রাশি,
উঠিবে জ্ঞানের জ্যোতি গগন প্রকাশি।
সকলে আপন বর্ণ দিবে ধরাইয়া,
মহাতেজে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম প্রকাশিয়া।

সৃষ্টির পূর্ব্বেতে যথা সকলে ব্রাহ্মণ,—
ব্রহ্মধ্যানে রত সবে ছিল সর্ব্বক্ষণ,
এখনও হইবে তাই—পুন একাকার,
হইবে সবার মুক্তি, সবার উদ্ধার।

সনাতন ধর্ম্ম তবে হইবে স্থাপন।
ভেদাভেদ কিছু নাহি রহিবে তখন।

তাই বলি,

ধর্ম্মকোষগোপ্তা হে ব্রাহ্মণ,
অগ্রজন্মা!—কর কর শীঘ্র জাগরণ।

তুমি জাগিলেই পুন জগৎ জাগিবে,
পুন আনন্দের স্রোতে জগৎ ভাসিবে।
আপনা উদ্ধারি, কর অপরে উদ্ধার,
করি তব পদে কোটি কোটি নমস্কার।

প্রাচীন ও আধুনিক।

প্রাচীন ও আধুনিকের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া অনেক সময়ে বিবাদ হইয়া থাকে। প্রাচীনের পক্ষপাতীরা বলেন, পূর্ব্বকালীন লোকে আমাদের অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে উন্নত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের পথানুসরণ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উপায় নাই। তাঁহারা বীরত্বে বলুন, জ্ঞানে বলুন, ধর্ম্মে বলুন, বিদ্যায় বলুন, সর্ব্ববিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উন্নত ছিলেন, অতএব শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের আলোচনা কর, তাঁহাদের যাহা আপাততঃ অজ্ঞতা, ভ্রান্তি বা কুসংস্কার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না বলিয়াই ঐরূপ বোধ হয়। প্রকৃত ব্যাখ্যার আলোকে সেই সকল, গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক বলিয়া প্রতীত হইবে। পক্ষান্তরে যাঁহারা আধুনিকের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, ক্রমোন্নতিবশে আমাদের সেই প্রাচীন অবস্থা হইতে কত উন্নতি হইয়াছে, সুতরাং প্রাচীনের দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা এই আধুনিক উন্নতিতে মাতি এস।

নিরপেক্ষ বিচারের চেষ্টা করিলে প্রতীয়মান হয়, প্রাচীনত্ব বা আধুনিকত্ব, কিছুই শ্রেষ্ঠতার কারণ নহে। শ্রেষ্ঠ যাহা, তাহা প্রাচীন বা আধুনিক হউক, শ্রেষ্ঠই থাকে, তাহাতে তাহার কোন গৌরবের হানি হয় না। বরাবরই যে আমাদের উন্নতি হইয়া আসিতেছে, তাহারই বা প্রমাণ কই, আবার ক্রমাগত অবনতি হইতেছে, তাহাই বা তুমি কিরূপে প্রমাণ করিতে পার? ক্রমবিকাশ বাদীরা (Evolutionists) আবার পুরুষানুক্রমিকশক্তিহ্রাসও (Atavism) মানিয়া থাকেন। ক্রমাগত উন্নতিই হইতেছে, এ বিষয়ে প্রমাণ কিছুই নাই, উহা কেবল একটী মত মাত্র, (Theory) উহা একটী ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। আবার ক্রমাবনতিবাদীরাও বিশ্বাস ব্যতীত আর কি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন যে, তাহাতে ক্রমশঃ সর্ব্ববিষয়ে অবনতিই হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? এ বিষয়ে যদি কখন প্রাচীন ও আধুনিকের যথার্থ ইতিহাস সঙ্কলন হয়, তবেই কতকটা নিঃসংশয় হইতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসের কথা ছাড়িয়াই দিন, পাশ্চাত্যদেশে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের যে সকল প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে কতটা বিশ্বাস করা যাইতে পারে, তাহাতেই ত সন্দেহ উপস্থিত হয়। প্রথম ধরুন, আধুনিক কালের ইতিহাস সঙ্কলনেই কত বাধা, কত বিঘ্ন আসিয়া থাকে। এক ত মানুষের জাতিগত, ব্যক্তিগত, পক্ষপাতের দরুন সত্যের উপর একটা কুজ্ঝটিকাবরণ পড়ে। তার পর সব ঘটনাই কি ঠিক ঠিক জানা যায়? অনেকটাই অনুমানের উপর সারিয়া লইতে হয়! দেশের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলনে আরও গোল দেখা যায়। এখানে আন্দাজে ঢিল মারার যতদূর প্রভাব, আর কোথাও তত নহে। শিলালেখ, তাম্রশাসনের দ্বারা সত্য নির্ণয়ের দ্বার কতকটা উদ্ঘাটিত হইতে পারে বটে, কিন্তু অনেক সময়ে ভাষার গোলযোগে তাহা হইতেও সত্যাসত্য নির্ণয়ের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। যাহাকে আভ্যন্তরিক প্রমাণ (Internal evidence) বলে, তাহা এত অনিশ্চিত যে, তাহাতে বাস্তবিক কিছু প্রমাণ হয় বলিয়া বোধ হয় না। দুইখানি গ্রন্থের রচনাপ্রণালীর ভাব দেখিয়া কি করিয়া তাহার পূর্ব্বাপর নির্ণীত হইবে? দেখা যায়, এক সময়েই কত বিভিন্ন প্রণালীর রচয়িতা বর্ত্তমান। এরূপ বিচারের সময় কতকগুলি theory প্রথমেই মানিয়া লওয়া হয়। বঙ্কিম বাবু শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র সমালোচনাকালে বলিয়াছেন, যাহা কিছু অলৌকিক, (Miraculous) তাহাকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। কে বলিল? আগে অলৌকিক

ঘটনার অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করুন। এ সকল যদি মানিয়াই লইলেন, তবে আর প্রমাণ করিলেন কি ?

অতএব সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ রাস্তা এই, প্রাচীনত্ব আধুনিকত্বের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল সত্যের দিকে দৃষ্টি করা। যেখানে সত্য পাইব, সেইখানেই লইব। সত্যের প্রমাণ সত্য। সত্য যাহা, তাহা নিত্য, তাহা অবিনাশী, তাহার কোন উপাধি নাই। প্রাচীন যাহা আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবে, তাহা যদি বাস্তবিক গ্রহণযোগ্য হয়, কেন না গ্রহণ করিব - আর আধুনিকে কিছু সত্য থাকিলে তাহাই বা কেন ঘৃণা করিব ? অনেকে মাথা ঘামাইতে চাহেন না বলিয়াই এইরূপ একটা যা তার উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এক তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, আমরা নিজ নিজ যুক্তিদ্বারা যাহা সিদ্ধান্ত করিব, তাহাই যে সত্য হইবে, তাহা কে বলিল ? সত্য বটে, যুক্তি ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু যতদিন যুক্তি ব্যতীত সত্যানুসন্ধানের অন্য কোন উপায় না পাই, ততদিন যুক্তিবলে আমরা আংশিক সত্যেও যে উপনীত হইতে পারিব, তাহার আর সন্দেহ কি ? আর যুক্তিবলে মন ক্রমশঃ সতেজ হইবে, তাহার সত্যানুসন্ধান শক্তি বর্দ্ধিত হইবে—ক্রমশঃ যুক্তি হইতেও সত্যানুসন্ধানের শ্রেষ্ঠতর উপায় সকল আমরা জানিতে পারিব। যুক্তির একটী বিশেষ দোষ এই যে, উহা আমাদের রুচির (Bais) অনুগামী হইয়া থাকে। এই রুচিকে প্রবল হইতে বাধা দিবার অভ্যাস করিতে হইবে। জিগীষাপ্রবৃত্তি আমাদের নিয়ামক না হইয়া যাহাতে আমরা নিরপেক্ষ হইতে পারি, তাহার জন্য বাসনার সংযম সাধনা করিতে হইবে। আর সকলের উপর, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে যত কম সত্য আমরা লাভ করি না কেন, তাহা আমাদের যথার্থ কাযে আসিবে।

প্রাচীন যাহা কিছু আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকে যেমন পাই, তেমনি লইয়া আমরা যেন চেষ্টা করি, তাহার মধ্যে আমাদের কতটুকু গ্রহণীয়, তাহার নির্ণয় করিতে ; যতটুকু আমাদের কাযে লাগিতে পারে, তাহার গ্রহণ করিতে। নতুবা প্রাচীন গৌরবের ঘোষণায় বা আধুনিকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে বিশেষ কোন লাভ নাই।

কেনোপনিষৎ।

কাহার প্রেরণাবশে মন
বিষয়েতে হয় ধাবমান?
বল গুরো, কাহার প্রেরণে
বিষয়েতে ধায় আদি প্রাণ?

বল বল কার প্রেরণায়
লোকে করে বাক্য উচ্চারণ?
কোন্ দেব বল চক্ষু কর্ণে
বিষয়েতে করে নিয়োজন?

শ্রবণশ্রবণ তিনি নয়ননয়ন;
মনেরও মানস তিনি বাক্যেরও বচন,
প্রাণেরও প্রাণন তিনি জেন সুধীগণ।
জেনে তাঁরে ত্যজে আত্মবুদ্ধি ইন্দ্রিয়েতে
ত্যজি ইহলোক সাধু যায় অমৃতেতে।

নাহি যায় চক্ষু, নাহি যায় মন,
নাহি যায় তথা অথবা বচন;
জানি তাঁরে নাহি বলিবারে পারি,
কিরূপে শিখাব স্বরূপ তাঁহারি?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিমুখে শুনেছি বচন,
জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হতে ভিন্ন তিনি হন।

বাক্য যাঁরে প্রকাশ করিতে নাহি পারে,
কিন্তু যাঁর শক্তিবলে নরবাক্য স্ফুরে।
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম, লোকে যাঁরে দেয় পূজা বলি।

মনেতে পারে না যাঁরে করিতে মনন,
মনেরে দেখেন যিনি, বলে জ্ঞানিগণ,
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম নরে যাঁরে দেয় পূজাবলি।

যাঁরে চক্ষু দিয়া নাহি পায় দেখিবারে,
যাঁর বলে চক্ষু দেখে বিশ্বচরাচরে,
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম নরে যাঁরে দেয় পূজাবলি।

শ্রোত্রবলে যাঁরে কেহ শুনিতে না পায়,
কিন্তু যাঁর জ্ঞানে শ্রোত্র বিষয়েরে প্রায়,
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম, নরে যাঁরে দেয় পূজা বলি।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়বলে যাঁর নাহি পায় ঘ্রাণ,
যাঁর বলে ঘ্রাণ স্ববিষয়ে ধাবমান,
তাঁহারেই সাধুবর, জেন ব্রহ্ম বলি,
নহে ব্রহ্ম নরে যাঁরে দেয় পূজা বলি।

যদি মনে কর তাঁয় ভালরূপে জানি,
বুঝিব তোমারে ব্রহ্মস্বরূপে অজ্ঞানী।
তোমার ভিতরে তাঁর কিরূপ প্রকাশ,
দেবতা ভিতরে কিম্বা কিরূপ বিকাশ,
এ সকল তত্ত্ব আগে কর অন্বেষণ।
শুনি শিষ্য কিছুদিন ব্রহ্মের চিন্তন
করি, পুন গুরু পাশে করিয়া গমন
বলেন—জেনেছি ব্রহ্ম জেন লং মন।

ইহা শুনি গুরুদেব করিলা উত্তর,
শুন মোর অনুভব, ওহে সাধুবর,
সুষ্ঠুরূপে জানি ব্রহ্মে বলিতে না পারি,
জানি না ইহাও আমি বলিবারে নারি,

'জানি না তাহাও নয়—জানি তাও নয়'
এ তত্ত্ব যে জানে সেই জেনেছে নিশ্চয়।

ব্রহ্মে জানি নাই এই জ্ঞান সদা যাঁর,
তাঁহারি হৃদয়ে সদা ব্রহ্মের বিহার।
জেনেছি এ অভিমান যাঁহার হৃদয়ে,
জ্ঞান তাঁর যায় বহু দূরে পলাইয়ে।

কত জ্ঞান মানুষের নিয়ত হয় উদয়,—
সেই জ্ঞানমূল তাঁরে যেবা করেছে নিশ্চয়;
বীর্য্যলাভ করে সেই—সেই আত্মবিদ্যাবলে
অমৃতত্ব লভি বাস করে সদা ভূমণ্ডলে।

এখানেই জানে ব্রহ্মে জনম সফল,
জানিতে নারিলে তার বিনাশ নিশ্চয়;
ধীর তাঁরে প্রতি ভূতে করিয়া চিন্তন,
ইহলোক হতে গিয়ে অমর যে হয়।

ব্রহ্মশক্তিবলে, দেব অসুরবিজয়ী,
ব্রহ্মে ভুলি করে সদা আত্ম অভিমান,—
আমাদের শক্তিবলে মহিমার বলে
অসুরে জিনিয়া ভুঞ্জি বৃন্দারক ধাম।
জানিয়া তাঁদের এই মহা অহঙ্কার,
দর্পচূর্ণ তরে ব্রহ্ম হন অবতার।

জ্যোতিরূপে হল তাঁর উদয় দ্যুলোকে
দেবগণ দেখে তাঁরে, এ জিজ্ঞাসে ওকে।
কেবা এই পূজ্যতম মহা জ্যোতির্ম্ময়?
যাও অগ্নি, এর তত্ত্ব কর হে নিশ্চয়।

শুনি অগ্নি তাঁর পাশে করিলা গমন,
কহে জ্যোতির্ম্ময়, তুমি হও কোন্ জন?
'অগ্নি মোর নাম, আমি বিদিত সংসারে,
জাতবেদা নাম মোর ঘোষে চরাচরে।'

'জাতবেদঃ, বল শুনি, কি বীর্য্য তোমার ?
'পৃথিবীর সর্ব্বদাহে ক্ষমতা আমার !'
একগাছি তৃণ দিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলে—
'কর অগ্নে, দগ্ধ ইহা তব শক্তিবলে'।

তৃণের সমীপে গিয়া যতদূর বল
প্রয়োগি হইল অগ্নি পুড়াতে বিফল।
ফিরি দেবগণ পাশে করে নিবেদন—
জানিতে নারিনু জ্যোতির্ম্ময় কোন্ জন।

'যাও বায়ু, জানি এস বলে দেবগণ'
মহাদম্ভে বায়ু তবে করিলা গমন।
'কে তুমি ?'—'পবন আমি খ্যাত চরাচর,
মাতরিশ্বা নাম মোর ঘোষে সদা নর।'

'কি শক্তি ?'—'সকল আমি উড়াই নিমিষে,'
'উড়াও তৃণেরে', জ্যোতির্ম্ময় কন হেসে।
সর্ব্বশক্তি প্রয়োগিয়া হইল বিফল,
চূর্ণ অভিমান, বুদ্ধি হইল বিকল।

দেবপাশে গিয়া সব করে নিবেদন,
শুনি দেবগণ ইন্দ্রে করিলা প্রেরণ।
ইন্দ্র যদা তাঁর পাশে করিলা গমন,
জ্যোতির্ম্ময় তখনই হল অদর্শন।

আবির্ভূতা আকাশেতে বহুশোভমানা
হৈমবতী উমা অতি সুন্দরদর্শনা।
তাঁর পাশে মঘবান করিয়া গমন
জিজ্ঞাসেন—জ্যোতির্ম্ময় হন কোন্ জন ?

বলিলেন উমা—'ইনি ব্রহ্ম—এঁর বলে
লভেছ বিজয় যত দেবতা সকলে।'

এরূপে জানিল ইন্দ্র ব্রহ্ম বলি তাঁরে
প্রথম জানিল তাই, সবার উপরে।
অগ্নি বায়ু গিয়েছিলা তাঁর নিকটেতে
এ হেতু গরিষ্ঠ তাঁরা দেবসমাজেতে।

দেবতাসমীপে এই ব্রহ্মের প্রকাশ
চক্ষের নিমেষ প্রায়—বিদ্যুত আভাস।
মন সদা তাঁর কাছে করিয়া গমন,
নিরন্তর করে যেন তাঁহারে স্মরণ।

ভজনীয় তাঁর নাম— ভজ সদা তাঁরে—
যদি হে যাইবে সাধু, ভবসিন্ধু পারে।
তাঁহারে জানেন এইরূপে সদা যিনি,
সর্ব্বভূত তাঁর সঙ্গ চায় বহু গণি।

চেয়েছিলে সাধো, উপনিষদ্ জানিতে
বলি তাই ব্রহ্মতত্ত্ব তোমার সাক্ষাতে।
তপোদম কর্ম্ম বেদ বেদাঙ্গ পঠন,
ব্রহ্মবিদ্যা লাভে হয় এ সব সাধন।
সত্যেরে জানিও সাধো, আশ্রয় ইহার;
ব্রহ্মবিদ্যা জেনো ভবে সর্ব্ববিদ্যাসার।

এই ব্রহ্মবিদ্যা ভবে হয় লাভ যার,
ঘুচে যায় সমুদয় পাতক তাহার।
অনন্ত গরিষ্ঠ স্বর্গে প্রতিষ্ঠা তাহার,
সেই ব্রহ্মবিৎ পদে নমি বার বার।

আমাদের কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে বলিয়াছেন, দুইটী রাস্তা মানুষের সামনে খোলা আছে—একটী প্রবৃত্তি ও অন্যটী নিবৃত্তিমার্গ। ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে অভ্যুদয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিসাধন এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। তুলনা করিলে বোধ হয়, হিন্দুজাতির সমুদয় চেষ্টাই অন্তর্ম্মুখী আর পাশ্চাত্য জাতির বহির্ম্মুখী। তাই হিন্দু অভ্যুদয় সাধনের জন্য যাগযজ্ঞ, যোগতপস্যা ইত্যাদি আধ্যাত্মিক উপায় বহুপরিমাণে অবলম্বন করিল। এইগুলিদ্বারা বাস্তবিক ঐহিক কোন উপকার সাধিত হইতে পারে কি না, সে বিচারের এস্থলে প্রয়োজন নাই। কিন্তু পাশ্চাত্যজাতি যে প্রবল কর্ম্মনিষ্ঠাবলে আজ প্রকৃতির সহস্র সহস্র গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে ও দিন দিন করিতেছে ও এইরূপে প্রকৃতিকে আপনার দাসী করিয়া রাখিয়াছে, সেই কর্ম্মনিষ্ঠার দীক্ষা আমরা বোধ হয়, অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে লাভ করিতে পারি। আজ ভারতের চতুর্দ্দিকে হাহাকার; অন্নাভাবে শত শত প্রাণী মরিতেছে, মহামারী চারিদিকে আপন করালছায়া বিস্তার করিতেছে। কিছুকাল এইরূপ ভাবে চলিলে হিন্দুজাতির নাম ভারতবর্ষ হইতে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এসময়ে কি অদৃষ্টের দোহাই দিয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়া নিশ্চিন্তমনে ধূমপান বিহিত? আমাদিগকে জাগ্রত হইতে হইবে—প্রবল উৎসাহসম্পন্ন হইতে হইবে। এসময় মহোৎসাহের বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চার ব্যতীত ইহার জাগরণ অসম্ভব। তাই বলি, উঠিতে হইবে, জাগিতে হইবে। যাহাতে দেশের এই সকল অমঙ্গল দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ক্ষীণ রাজনৈতিক আন্দোলনে অধিকার পাইবার আশা খুব কম। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা; বীর হইতে হইবে। নিজেকে উপযুক্ত হইতে হইবে। নহিলে ভিক্ষুকবেশে উপযাচক হইয়া অপরের দ্বারে উপস্থিত হইলে সে দয়া করিয়া কখন একটু ছেঁড়া রুটি দিবে, কখন বা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

উপযুক্ত আপনাদিগকে করিব কিরূপে? প্রথম উৎসাহসম্পন্ন হইতে হইবে; তাহার পর ধীরভাবে ভাবিতে হইবে, কিসে আমরা উপযুক্ত হই। অপরের চর্ব্বিতচর্ব্বণ গলাধঃকরণ করিয়া আপনি জাওর কাটিলে চলিবে না। আমাদের যা লেখাপড়া শেখা হইতেছে, তাহা কি কেবল এই জাওর কাটা নয়? আর উদ্দেশ্য কি? না, দুমুটা অন্ন—অন্ন। আপাত সুখের উত্তেজনায় লোক

ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যায়। আমাদের দেশে এমন কি যুবকদল নাই, যাহারা আপাততঃ দুটী খাবার ভাবনা ছাড়িয়া আপাততঃ কিছু কষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইতে পারে? কই, বাঙ্গালা ভাষায় কখানা মৌলিক গ্রন্থ দেখিতেছি? হয় সংস্কৃতের, না হয় ইংরাজীর চর্ব্বিতচর্ব্বণ। মাতৃভাষায় এমন মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া চাই, যাহা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অনুবাদের যোগ্য। তার পর শরীর? অল্প বয়সে সন্তানোৎপাদন ও ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া আমরা বল হারাইতে বসিয়াছি। শারীরিক বল সাংসারিক উন্নতির পক্ষে ত বটেই, আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষেও বিশেষ আবশ্যক। পিতামাতাগণ আপন আপন সন্তানগণকে কতকগুলা অনর্থক মাথা বকান হইতে নিবৃত্ত করিয়া আগে যাতে তাহারা মানুষ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করুন। শারীরিক বল উপার্জ্জিত হউক, তার সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক অনুসন্ধানের স্পৃহা উত্তেজিত করা হউক। প্রথম প্রথম অবশ্য অনেককে আপন আপন স্বার্থে বলি দিতে হইবে—এমন কি, মরিবার জন্য পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। কারণ, নরবলি ব্যতীত ভারতমাতা কখন তৃপ্ত হইবেন না। কতকগুলি ভারতীয় নরনারী আপনাদিগের বলি দিলে দেখিবেন, কেমন অপরাপর নরনারীতে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে। কি সমাজে, কি রাজনৈতিক জগতে, কি যুগান্তর উপস্থিত হইতেছে। নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের চেষ্টা, এই হইতেছে মূলমন্ত্র। অপরে যাহা আবিষ্কার করিতেছে, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রাচীন ভারতের ফাঁকা গৌরব ঘোষণা করিলে চলিবে না। প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক পাশ্চাত্য-জগতের যাহা কিছু ভাল, সেই গুলিকে আপনার করিয়া লইতে হইবে, তার পর চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে আরো নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির করিতে পারি। জীবনের প্রয়োজন কি কি, আগে বুঝিতে হইবে, তার পর সেগুলির সাধনে মন প্রাণ নিয়োগ করিতে হইবে।

আমরা কতকগুলি সংস্কারের ভারে, তাহা সুই হউক, বা কুই হউক, অবসন্ন। সেইগুলি যেন তেন প্রকারেণ ঠিক, ইহা প্রমাণ করিয়া নাসিকায় সর্ষপতৈল প্রদানের চেষ্টা ছাড়িতে হইবে। যাহাতে উন্নতি হয়, তাহাই করিতে হইবে।

অনেকে দেশের ধনিগণের দিকে তাকাইয়া দেশের উন্নতির ভরসা করেন, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। অতি যে দরিদ্র, সে চেষ্টা আরম্ভ করুক—ধনিগণের ধন তাহার নিকট আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। ভিক্ষুকের ভাব ত্যাগ করিয়া

বীর হইতে হইবে, ইহার প্রথম সাধনা, আপনাতে বিশ্বাস ও অপর সকলে বিশ্বাস। আমি কিছু করিতে পারি; এই সমস্ত জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে, ইহাতে আমারও একটু স্থান আছে—এই বিশ্বাস লইয়া সকলেই নিজ নিজ স্থানে বসিয়া তাহারই উন্নতির পথ ভাবিতে হইবে। কবে আমি সুবিধা পাইব, কবে সব সুযোগ জুটিবে, ইহা ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে কোন উন্নতি কখন হয় না। বর্ত্তমান অবস্থায় বর্ত্তমান প্রযত্ন, ইহাই জীবনসমস্তার মূলমন্ত্র। ভাবো, খাটো, প্রাণপাত কর। ইহাতে শুধু ঐহিক উন্নতি হইবে না, পারমার্থিক উন্নতির পথও সুপ্রশস্ত হইবে।

অধঃপতিত জাতির মুক্তির চেষ্টা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুক্তি কার হয়? যে শত শত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ, তার কি কখন মুক্তি হয়? এ মুক্তির চেষ্টা আমাদের নিকট স্বার্থচেষ্টার, স্বার্থপরতার নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলস্য—আলস্য—আমরা ঘোর আলস্যপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছি। মহা তমোগুণে আচ্ছন্ন। রজঃশক্তির প্রবল বিকাশ ভিন্ন যথার্থ সাত্ত্বিকতার বিকাশ সুদূরপরাহত। আমরা একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারি না, একটার জন্য প্রাণপাত করিতে পারি না। আমাদের সাহিত্য প্রেমের কবিতায় ও সাংসারিক আলস্যময় জীবনের সুখঘোষণে, আমাদের বিজ্ঞান কল্পনায়, আমাদের ধর্ম্ম অসার কর্ম্মাড়ম্বরে বা শুষ্ক জ্ঞানের কচ্‌কচিতে পূর্ণ। পরের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হয় না, চিট্‌কে থালা উচ্ছুগ্‌গু করিয়া বা একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল! যে জাতির চণ্ডাল রাস্তায় চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণের পথ চলা বন্ধ হয়, সে জাতিকে যখন অপর শ্রেষ্ঠ জাতি 'নেটিব,' 'নিগার,' ইত্যাদি মধুর আখ্যা প্রদান করিয়া কাণ মলিয়া দেয় বা সবুট পদাঘাত করে, তাহার তখন অভিযোগের বিষয় কি আছে, বুঝিতে পারি না। দুঃখের বিষয় কি বলিব, যে ধর্ম্মে ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল এবং এখনও যেখানে অনেক মহামহা ধর্ম্মবীরের নাম শুনা যায়, সে জাতিকে কি না ধর্ম্মবিষয়েও পাশ্চাত্য জাতির নিকট শিক্ষা লইতে হইতেছে। কি লজ্জা, কি ঘৃণা! আমাদের আত্ম-সম্মান বোধ একেবারে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যথার্থই পতিত, যথার্থই হীন হইয়াছি।

কত দিন আর এ কাতরোক্তি করিতে হইবে, কত দিন আমরা এরূপে নিদ্রিত থাকিব? কত দিনে আমরা আমাদের যথার্থ প্রাচীন ভাবগুলির আদর

করিতে শিখিব ও পাশ্চাত্যগণের নিকট হইতে যাহা গ্রহণের উপযুক্ত, তাহা লইব ? আমরা কি প্রাচীন শাস্ত্রে যথার্থ বিশ্বাসী ? হায়, যদি আমরা যথার্থ বিশ্বাসী হইতাম, তবে কি আমাদের এমন দুর্দশা হইত ? আমরা যে মহা কপট হইয়াছি। 'লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়' এই আমাদের মটো হইয়াছে। জাতিগঠন দূরের কথা। এক এক জাতির ভিতর সহস্র অবান্তরভেদ দূরের কথা। সেই অবান্তর ভেদের ভিতরও যে দলাদলি! বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে পর্যটন করিয়া এস। দেখিবে, দলাদলি। এক গ্রামে দেখিলাম, তিন চার ঘর লোক, তার ভিতরে দুই দল। ইহার একমাত্র কারণ আলস্য। আলস্য-পরায়ণ হৃদয় শয়তানের লীলাক্ষেত্র। আমাদের এই স্বভাবসিদ্ধ আলস্য না তাড়াইলে কি আর আমাদের কোন উপায় আছে ?

হিন্দুধর্ম্ম এই ভারতের ভিতর এত রকম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে যে, সকলকে হিন্দু বলিয়া মনে করা কঠিন। এত মতমতান্তরের পার্থক্য, এত আচার ব্যবহারের অনৈক্য ! কিন্তু বাস্তবিক কি এই হিন্দুধর্ম্মের কোন সাধারণ ভাব নাই ? অবশ্যই আছে। মহাপুরুষেরা হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মতগুলি স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিতেছেন। সেইগুলি বুঝিয়া ধারণা করিয়া আপন আপন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্জ্জন করিতে হইবে। মূলের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে, আগাছাগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। একটু আচারের খুঁটিনাটিতে হিন্দু-সমাজচ্যুত না করিয়া যথার্থ সদাচার, সংকর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্য, সহানুভূতি ও চরিত্র-বলের উপর হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জন্মগত না করিয়া হিন্দুভাব কর্ম্মগত করিতে হইবে। তাহা না হইলে আমাদের ক্রমশঃ সংখ্যা হ্রাস হইয়া শেষে আমরা নিশ্চয়ই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে।]

সপ্তমীপূজা, শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খৃঃ অঃ।

আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়াছেন। অনেকগুলি কাজ। শারদীয় মহোৎসব—রাজধানীর মধ্যে হিন্দুর প্রায় ঘরে ঘরে আজ মায়ের সপ্তমীপূজা আরম্ভ। ঠাকুর অধরের (খ) বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিবেন ও আনন্দময়ীর আনন্দোৎসবে যোগদান করিবেন। আর একটি সাধ—শিবনাথকে দর্শন করিবেন।

বেলা আন্দাজ দুই প্রহর হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ফুটপাথের উপর একটি ছাতি হাতে করিয়া মাষ্টার পাদচারণ করিতেছেন। একটা বাজিল, দুইটা বাজিল, তবু ঠাকুর আসিলেন না। শ্রীযুত মহলানবীসের ডিস্পেন্সারির ধাপে মাঝে মাঝে বসিতেছেন ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে ছেলেদের আনন্দ ও আবালবৃদ্ধ সকলের ব্যস্তভাব দেখিতেছিলেন। বেলা ৩টা বাজিল, কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সমাজমন্দিরপৃষ্ঠে ঠাকুর করজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে হাজরা। মাষ্টার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমি শিবনাথের বাড়ী যাব।" ঠাকুরের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া দেখিতে দেখিতে কয়েকটি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া যুটিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মপাড়া মধ্যে শিবনাথের বাড়ীর দ্বারদেশে লইয়া গেলেন। শিবনাথ বাড়ীতে নাই—কি হইবে? দেখিতে দেখিতে বিজয় (গ) মহলানবীস ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাজ মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। ঠাকুর

(ক) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) অধরলাল সেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, বাড়ী সভাবাজার বেণেটোলা। ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। অধর প্রায় প্রত্যহ গাড়ী ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার পর ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরের কালিবাড়ীতে যাইতেন।

(গ) শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

একটু বসুন—ইতিমধ্যে শিবনাথ আসিয়া পড়িলেও পড়িতে পারেন। ঠাকুর আনন্দময়, সহাস্যবদনে আসন গ্রহণ করিলেন। বেদীর দিকে যে স্থানে সংকীর্ত্তন হয়, সেই স্থানে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল। বিজয়াদি অনেকগুলি ব্রাহ্মভক্ত সম্মুখে বসিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও
সাইনবোর্ড (Sign-Board) সাকার, নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি, হাসিতে হাসিতে)। শুনিলাম এখানে সাইন-বোর্ড (Sign-board) আছে। অন্যমতের লোক নাকি এখানে আসিবার যো নাই। নরেন্দ্র (ক) বল্লে 'সমাজে গিয়ে কাজ নাই, শিবনাথের বাড়ীতে যেও।'

আমি বলি সকলে তাঁকে ডাক্‌ছে। দ্বেষাদ্বেষীর দরকার নাই। কেউ বলছে সাকার, কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি, যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারই চিন্তা করুক, যার নিরাকারে বিশ্বাস, সে নিরাকারই উপাসনা করুক। তবে এই বলা যে মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়। অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম ঠিক, আর সকলের ধর্ম্ম ভুল। আমার ধর্ম্ম ঠিক আর ওদের ধর্ম্ম ঠিক কি ভুল, সত্য কি মিথ্যা, এ আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—এ ভাব ভাল, কেন না ঈশ্বরের স্বরূপ তাঁর সাক্ষাৎকার না কল্লে বুঝা যায় না।

কবীর বল্‌তো, 'সাকার আমার মা নিরাকার আমার বাপ। কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দোনো পাল্লা ভারী।'

"হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন আর পাঁচটি ছেলে থাকে তাহলে সকলকেই পোলোয়া কালিয়া করে দেন না। কেন না সকলের পেট সমান নয়। কারুর জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন কিন্তু মা সকলকেই সমান ভাল বাসেন।

"আমার ভাব কি জান? আমি মাছ সব রকম খেতে ভালবাসি। আমার মেয়েলি স্বভাব। (সকলের হাস্য)। আমি ভাজা, হলুদ্ দিয়ে টকের মাছ, বাটিচচ্চড়ি এ সব তাতেই আছি। আবার মুড়ির ঘণ্টতেও আছি, কালিয়া পোলোয়াতেও আছি। (সকলের হাস্য)।

(ক) ইদানীং স্বামী বিবেকানন্দ।

"কি জান, দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম্ম করেছেন কিন্তু সব মারই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় কল্লে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়। যদি কোন আশ্রয় করে তাতে ভুল থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভুল শুধরে দেন। যদি কেউ আন্তরিক জগন্নাথ দর্শনে বেরোয় আর ভুলে দক্ষিণদিকে না গিয়ে উত্তরদিকে যায়, তাহলে অবশ্য কেউ বলে দেয়, 'ওহে ওদিকে যেওনা, দক্ষিণদিকে যাও'। সে ব্যক্তি কখন না কখন জগন্নাথ দর্শন কর্‌বে।"

"তবে অন্যের ভুলমত হয়েছে একথা আমাদের ভাব্‌বার দরকার নাই যাঁর জগৎ তিনি ভাব্‌ছেন। আমাদের কর্ত্তব্য—কিসে যো সো করে জগন্নাথ দর্শন হয়।"

"তা তোমাদের মতটি বেশ তো। তাঁকে নিরাকার বল্‌ছো এতো বেশ। মিছরির রুটি সিদে করে খাও, আর আড় করে খাও, মিষ্টি লাগ্‌বে।"

(বিজয়ের প্রতি) তবে মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। তুমি বহুরূপীর গল্প শুনেছ? একজন বাহ্যে কর্ত্তে গিয়ে গাছের ওপর বহুরূপী দেখেছিল। বন্ধুদের কাছে এসে বল্লে আমি একটি লাল গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকালাল। আর একজন সেই গাছতলা থেকে এসে বল্লে যে, আমি একটি সবুজ গিরগিটি দেখে এলুম। তার বিশ্বাস একেবারে পাকাসবুজ। কিন্তু যে গাছতলায় বাস কত্তো, সে এসে বল্লে তোমরা যা বলছ সব ঠিক, তবে সে জানোয়ারটি কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, আবার কখন কোন রং থাকে না।

"বেদে তাঁকে সগুণ, নির্গুণ দুই বলা হয়েছে। তোমরা নিরাকার বল্‌ছো, একঘেয়ে। তা হোক্। একটা ঠিক জান্‌লে অন্যটাও জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। তোমাদের এখানে যে আসে, এঁকেও জানে, আবার তাঁকেও জানে।"

ঠাকুর এই বলিয়া দুএকজন ব্রাহ্মভক্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(বিজয়ের প্রতি উপদেশ।)

বিজয় তখনও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। ব্রাহ্মসমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য। আজকাল তিনি ব্রাহ্মসমাজের সব নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেছেন

না। সাকারবাদীদের সঙ্গে মিশিতেছেন। এই সকল লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর হইতেছিল। এই সমাজের ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ হঠাৎ বিজয়কে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

(বিজয় ও লোকনিন্দা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি) তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশ বলে তোমার নাকি বড় নিন্দে হয়েছে? যে ভগবানের ভক্ত, তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাহ (Anvil); হাতুড়ীর ঘা অনবরত পড়ছে, তবু নির্ব্বিকার যেমন তেমনি। অসৎ লোকে তোমাকে কত কি বল্‌বে, নিন্দা করবে। তুমি যদি আন্তরিক ভগবানকে চাও, তাহলে সব সহ্য করবে।

(বিজয় ও দুষ্ট লোক।)

দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকে কি আর ঈশ্বর চিন্তা হয় না? দেখ না, ঋষিরা বনের মধ্যে থেকে ঈশ্বরকে চিন্তা করতো। চারিদিকে বাঘ, ভাল্লুক, নানা হিংস্রক জন্তু। অসৎ লোকের বাঘ ভাল্লুকের স্বভাব, তেড়ে এসে অনিষ্ট করে।

এই কয়টির কাছে থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড়মানুষ। টাকা লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে। তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, সায় দিয়ে যেতে হয়। তার পর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখের মিষ্টি আওয়াজ করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতোতে এলে তাকেও মুখের আওয়াজে ঠাণ্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে তোর চোদ্দপুরুষ তোর হেন তেন বলে গালাগাল দেবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তাহলে খুব খুসি হবে, তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।

অসৎ লোক দেখলে আমি সাবধান হইয়া যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকো টুকো আছে, আমি বলি আছে।

কারও কার সাপের স্বভাব। তুমি জান না, তোমায় চোবল দেবে। চোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা হলে হয়তো তোমার এমন রাগ হল যে, তার আবার উল্টে অনিষ্ট করতে ইচ্ছে হয়।

(বিজয় ও সাধুসঙ্গ।)

তবে মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ বড় দরকার। সৎসঙ্গ করলে তবে সদসৎ বিচার আসে।

বিজয়। অবসর নাই, এখানে কাজে আবদ্ধ থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা আচার্য্য। অন্যের ছুটি হয়, কিন্তু আচার্য্যের ছুটি নাই। নায়েব একধার শাসিত করলে, জমিদার আর একধার শাসন কর্ত্তে পাঠান। তাই তোমার ছুটি নাই।

বিজয়। (কৃতাঞ্জলি)। আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওসব অজ্ঞানের কথা, ঈশ্বরই আশীর্ব্বাদ করবেন।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস।)

বিজয়। আপনি কিছু উপদেশ দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে, সমাজগৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া)। এ এক রকম বেশ। সারে মাতে। সারও আছে, মাতও আছে। (সকলের হাস্য)। আমি বেশী কাটিয়ে জলে গেছি। (সকলের হাস্য)। নক্স খেলা জান? সতের ফোঁটার বেশী হলে জলে যায়। একরকম তাস খেলা। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে, তারা বড় সেয়না, পাঁচে থাকে, সাতে থাকে, দশে থাকে। আমি বেশী কাটিয়ে জলে গেছি।

কেশব সেন বাড়ীতে লেক্‌চার দিলে। আমি শুনেছিলাম। অনেক লোক বসেছিল। চিকের ভিতর মেয়েরা ছিল। কেশব বল্লে, হে ঈশ্বর, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা ভক্তির নদীতে একেবারে ডুবে যাই। আমি হেসে কেশবকে বল্লুম, "ভক্তির নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে, তাহলে চিকের ভিতর যাঁরা রয়েছেন, ওঁদের দশা কি হবে? তবে এক কর্ম্ম করো। ডুব দেবে, আর মাঝে মাঝে আড়ায় (ক) উঠবে। একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না।" এই কথা শুনে কেশব আর সকলে হোহো করে হাঁসতে লাগলো।

তা হোক্। আন্তরিক হলে সংসারেও ঈশ্বর লাভ করা যায়। 'আমি' আর 'আমার' এইটি অজ্ঞানী। হে ঈশ্বর 'তুমি' ও 'তোমার' এইটি জ্ঞানী। সংসারে থাক যেমন বড় মানুষের বাড়ীর ঝি। সব কাজ করে, ছেলে মানুষ করে,

---

(ক) আড়া অর্থাৎ নদীর তীর।

বাবুর ছেলেকে বলে 'আমার হরি,' কিন্তু মনে মনে বেশ জানে, এবাড়ী আমার নয়। সব কাজ করে, কিন্তু তার মন দেশে পড়ে থাকে। তেমনি সংসারে সব কর্ম্ম কর, কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো। আর জেনো যে গৃহে পরিবার পুত্র এ সব আমার নয়, এ সব তাঁর। আমি কেবল তাঁর দাস।

আমি মনে ত্যাগ কর্‌তে বলি। সংসার ত্যাগ করতে বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থেকে তাঁকে আন্তরিক চাইলে তাঁকে পাওয়া যায়।

(ব্রাহ্মসমাজ ও ধ্যানযোগ।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি)। আমিও চক্ষু বুজে ধ্যান কর্‌তুম। তার পর ভাব্‌লুম, এমন কল্লে, (চক্ষু বুজ্‌লে) ঈশ্বর আছেন, আর অমন কল্লে (চক্ষু খুল্লে) কি ঈশ্বর নেই? চক্ষু খুলেও দেখ্‌ছি, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীব, জন্তু, গাছ, পালা, চন্দ্র সূর্য্যমধ্যে, জলে, স্থলে, সর্ব্বভূতে তিনি আছেন। আবার অন্তরে হৃদয়মধ্যেও আছেন।

(শিবনাথ 'মম তেজোঽংশসম্ভবম্') (ক)

কেন শিবনাথকে চাই? যে অনেক দিন ঈশ্বর চিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্বে খুব ভাল রকম জানে, তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি গীতার মত। চণ্ডীতে আছে, যে খুব সুন্দর, তার ভিতর সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে।

(শ্রীযুত কেদারনাথ চাটুর্য্যে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। আহা! কেদারের কি স্বভাব হয়েছে, এসেই কাঁদে। চক্ষু দুটি সর্ব্বদাই যেন ছানাবড়া হয়ে আছে।

বিজয়। সেখানে (খ) কেবল আপনার কথা ও আপনার কাছে আস্‌বার জন্য ব্যাকুল।

(ক) যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।

(খ) ৺ কেদার চাটুয্যে পরম ভক্ত। তখন ঢাকায় সরকারি কাজ উপলক্ষে ছিলেন। ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন ঢাকায় মাঝে মাঝে যাইতেন, তখন তাঁহার সহিত দেখা হইত। দুজনেই ভক্ত, পরস্পর দর্শনে আনন্দ করিতেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা নমস্কার করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। অধরের বাড়ী প্রতিমা দর্শন করিতে যাইতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার আমেরিকায় গিয়া অধিকাংশ সময় কালিফোর্নিয়ায় বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ তথায় একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছে, ইহা উদ্বোধন পাঠকগণের বিদিত আছে। ঐ সময়েই কালিফোর্নিয়ার রাজধানী সানফ্রান্সিস্কো সহরে এক বেদান্তসভা গঠিত হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সভ্য—ডাক্তার লোগান নামক এক বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সভাপতি। এই সভায় স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেক দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইলে উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত সেই সভায় কার্য্য করিবার জন্য গিয়াছেন। এই সভার সভ্যগণ স্বামীজির মহাসমাধির সম্বাদ পাইয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত 'প্যাসিফিক বেদান্তিন্' নামক ইংরাজী পত্রিকায় গভীর শোক প্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এত সুন্দর, এত মর্ম্মস্পর্শী ও তাঁহার প্রতি এত গভীর প্রেমের পরিচায়ক যে, আমরা উদ্বোধন পাঠকগণকে তাহার কিঞ্চিৎ মর্ম্ম না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।

"পূজাপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ গত ৪ঠা জুলাই হঠাৎ নশ্বর মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করিয়া জগদম্বার অনন্ত ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছেন। আমাদের প্রিয়তম স্বামীজি তাঁহার গুরুর পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তাঁহারই সম্বন্ধে তিনি 'আমার গুরু' নামধেয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, কোন মানুষ কখন তাহার প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে এত সুন্দর ভাষায় লিখে নাই। তিনি তাঁহার গুরুকে যেরূপ ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, আমরাও সেইরূপ তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিব। মহাপুরুষগণ জগতের হিতার্থে যুগ-যুগান্তরে এক এক বার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনিও সেইরূপ একজন মহাপুরুষ ছিলেন—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও অন্যান্য মহাপুরুষগণের অবতারস্বরূপ ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান কালের অভাব দূর করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিক তাঁহার গুরুর সহিত অভেদাত্মা ছিলেন- যিনি প্রাচীন আধুনিক

সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ের অবতার। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মহান্ ভাবরাশি দ্বারা সমুদয় জগৎ তোলপাড় করিয়া গিয়াছেন—যতদিন পর্য্যন্ত জগতের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন উঁহারা কালরূপ গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। তাঁহার নিকট সকল ব্যক্তি ও সকল ধর্ম্মমত এক ছিল। তাঁহার খৃষ্টের ন্যায় ধৈর্য্য এবং সূর্য্য ও বায়ুর ন্যায় সকলের প্রতি সমভাব ও সদাশয়তা ছিল। কি রাজা কি প্রজা, কি ধনী কি দরিদ্র, কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ, এমন কি, ঘৃণিত ক্রীতদাস ও বেশ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিত। তিনি বলিতেন, সকলেই এক পরি-বার-ভুক্ত, আমি দেখিতেছি, আমি তাহাদের সকলের ভিতর রহিয়াছি এবং তাহারা আমার ভিতর রহিয়াছে। এই জগৎ এক পরিবার স্বরূপ—ব্রহ্ম ইহার পিতা মাতা স্বরূপ ও ইহার যথার্থ সত্তা। প্রকৃতি তাঁহাকে অতি মনোহর রূপ দিয়াছিলেন, কিন্তু অবিশ্রান্ত কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করেন নাই। জগৎ আশাবাণী শুনিবার জন্য কাতরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি *জগৎকে তাহা শুনাইলেন—তিনি জগতের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।* যখন এই দেশে প্রথম আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প, তাহাতে তাঁহার বিদেশ; এখানে আধুনিক কালের বাছা বাছা ধর্ম্মাচার্য্যগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই বিরাট ধর্ম্মসভায় অগণ্য যুক্তিপ্রিয় দর্শকগণের মনে তাঁহার অসঙ্কোচ দর্শন ও অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তিগুণে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভীতি উৎপাদন করা এবং পরেও এই ভাব বরাবর রক্ষা করিয়া চলাতে তাঁহার অপরিমিত পরিশ্রম হয়। ইহা তাঁহার কোমল শরীরে কিরূপে সহ্য হইবে? সেই মহতী সভায় এরূপ অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন পুরুষ আর কেহ ছিলেন না, আর কোন ধর্ম্মের প্রতিনিধিই এরূপ শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। আর কাহারই এত মহান্, এত বৃহৎ কার্য্য ছিল না। আমাদের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিলেন। যখন তিনি মিচিগানের অন্তর্গত ডিট্রএট সহরের ভিতর দিয়া যান, তখন লোকে বলিতে লাগিল, 'ইঁহার প্রকাণ্ড বুদ্ধির সহিত তুলনায় এই অধ্যাপকগণ শিশুমাত্র' 'এই প্রকাণ্ড হিন্দুঝড় জগতকে তোলপাড় করিয়া দিয়াছে।' তাঁহার নিকট কোন ভাষাই অপরিচিত ছিল না অথবা কোন দেশই তাঁহার বিদেশ ছিল না। সমুদয় পৃথিবীই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। এখন তিনি তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ জগজ্জননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছেন; আবার এই সন্তপ্ত কাতর জগতে আসিবেন। যখন তিনি আবার আসিবেন, তখন যেন আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বশেষ দেখিয়াছেন, তাঁহারা যেন সেই সময় ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

যখন তিনি এই সুদূর প্রশান্তমহাসাগরোপকূলে আসিয়াছিলেন, আমাদের অনেকেরই তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার আশাতীত সুযোগ হইয়াছিল। অনেক ভক্ত খৃষ্টীয়ানগণের পক্ষে যীশুখৃষ্ট যেরূপ, আমাদের পক্ষে তিনিও সেইরূপ। যদিও এক্ষণে আমাদের নিকট তিনি স্থূলশরীরে বর্ত্তমান নহেন, তথাপি তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অধিকতর সমীপে রহিয়াছেন। আমরা যে তাঁহাকে স্থূলশরীরে দেখিয়াছিলাম, সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলাম এবং তাঁহার মধুর ঐশ্বরিক প্রভাব অনুভব করিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা আপনাদিগকে অতিশয় সৌভাগ্যশালী মনে করি।

হউক এ মন্ত্র সদা আমা সবাকার
অনন্ত শাশ্বত সুখ হোক গো তোমার—
হে স্বামীজি, প্রিয়, প্রিয়তম আমাদের—
কি দিবসে, কি রাত্রিতে, সেই অনন্তের।

স্বামীজির শরীর ত্যাগে আমাদের বেদান্ত প্রচার—এমন এক নেতা হারাইলেন, যিনি আমাদের সকলের গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার বস্তু ছিলেন। তাঁহার মধুর হাস্য,সুমিষ্ট বাণী ও মধুর সম্ভাষণে সর্ব্বদাই তাঁহাকে যত্ন করিয়া কাছে রাখিতে ইচ্ছা হইত। তিনি মানবীয় ও দৈব শ্রেষ্ঠ গুণসমূহের আধার এক অদ্ভুত পুরুষ ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম আদর্শে জীবন যাপন করিতেন, সুতরাং তাঁহার নাম, তাঁহার চরিত্র ও তাঁহার স্মৃতি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের পক্ষে চিরকালের জন্য উচ্চ ভাবের উদ্দীপক আধ্যাত্মিক শক্তিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিবে।

নাহি মৃত্যু ভবমাঝে—দেব একজন
ধীর পদে ধরাতলে করে বিচরণ;
প্রিয়তম বস্তু আমাদের লন হরে,
'মৃত' বলি আখ্যা তদা দিই তাঁহাদেরে।
কিন্তু চক্ষু অগোচরে সদা সন্নিকটে
প্রিয় অমরাত্মাগণ করে বিচরণ,
জান না কি অনন্ত এ ব্রহ্মাণ্ড ভুবন
প্রাণরূপ— কভু হেথা নাহিক মরণ?

ভ্রাতঃ, সখে, গুরো, শান্তি ও বিদায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা এই সভা হইতে এই কয়েকটী প্রস্তাব স্থির করিলাম,—

১ম—আমাদের পূজনীয় আচার্য্যদেবকে জগদম্বা আমাদের নিকট হইতে কেন কাড়িয়া লইলেন, ইহা আমরা যদিও সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিতেছি না, তথাপি আমরা সেই জগদম্বার ইচ্ছার নিকট ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করিতেছি, যাঁহার পক্ষে ভ্রম ও নিষ্ঠুরতা অসম্ভব।

২য়,—যদিও আমরা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরুর দেহত্যাগ সম্বন্ধে কোন-রূপ সন্তোষকর দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না, তথাপি আমাদের পরমাত্মায় বিশ্বাস অটলভাবে বর্ত্তমান আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁহার শোকসন্তপ্ত সন্ন্যাসী গুরুভাইগণকে ভগবান সান্ত্বনা দিবেন।

৩য়,—এই সভার বিবরণীপুস্তিকায় আমাদের প্রিয় পরলোকগত গুরুর প্রতি ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি রক্ষিত হউক এবং উহার নকল ভারতের মঠে বা অন্যত্র তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভাইগণের নিকট প্রেরিত হউক—

স্যানফ্রানসিস্কোর বেদান্তসভা হইতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রেরিত—

এম, এইচ, লোগান—সভাপতি।
সি, এফ, পেটার্সন—সহকারী সভাপতি।
এ, এস, উলবার্গ—সম্পাদক।

নির্ব্বাণতত্ত্ব।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

পদার্থ মাত্রেরই এক এক বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই ইহাকে অন্যান্য পদার্থ হইতে বিশেষ বা পৃথক্ করিয়া ইহার নিজত্ব বিধান করে। এই নিজত্ববিধায়ক বিশেষ ভাবটির নামই স্বভাব। সুতরাং বস্তুর স্বভাব জানিলেই তাহাকে যথার্থ জানা হইল। এরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান। কোন বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান, জানিতে হইলে তাহার স্বভাব জানিলেই হইল। এই স্বভাব রাগদ্বেষাত্মক; ইহা কতকগুলিকে গ্রহণ করিতে চায়, কতকগুলিকে ত্যাগ করিতে চায়; কতকগুলির সহিত ইহার নিত্যপ্রীতি, কতকগুলির সহিত নিত্য অপ্রীতি। পদার্থ সমুদয় জড় ও চেতন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জড়পদার্থসমূহের ভিতরেও রাগদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন অন্ধকারের সহিত অন্ধকারেরই ঘনিষ্ঠতা হয়, আলোকের কখনও হয় না, সেইরূপ সজাতীয় বস্তুর সহিতই বস্তুর ঘনিষ্ঠতা হইয়া থাকে, বিজাতীয়ের সহিত কখনই হয় না। জলীয় ও স্নেহময় পদার্থ বিজাতীয় বলিয়া মিলিত হইতে পারে না। জলীয় জলীয়ের সহিত, স্নেহময় স্নেহময়েরই সহিত মিলিত হয়। স্থাবর জীবেও, (যথা বৃক্ষলতাদি) রাগদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। বায়ু, জল এবং সূর্য্যালোক ইহাদের অভিমত; অনাবৃষ্টি, অতিরিক্ত উত্তাপ, এবং অন্ধকার ইহাদের অনভিমত। বায়ু, জল এবং আলোকের সহায়ে বৰ্দ্ধমানা লতা স্বায় সুকোমল অগ্রভাগদ্বারা কেবল সূর্য্যালোকতপ্ত স্থানই অন্বেষণ করে, তুমি যতই তাহাকে ছায়ার দিকে ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা কর না, তোমার যত্ন কখনও সফল হইবে না। অদ্য ফিরাইয়া দাও, কল্য দেখিবে, তাহা সূর্য্যাভিমুখী হইয়াছে। আলোকের প্রতি অনুরাগ এবং ছায়ার প্রতি দ্বেষই ইহার স্বভাব। সুতরাং জড় ও উদ্ভিদ পদার্থসমূহ যে রাগদ্বেষের অধীন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

জীবজগৎ রাগদ্বেষ দিয়া গঠিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গো, মহিষ প্রভৃতি শষ্পপ্রিয় জন্তুগণ তৃণ, পল্লব, লতা প্রভৃতিতেই বিশেষ অনুরক্ত, কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল মাংসাশী বলিয়া, তৎসমুদয়ে উহাদের কোনও অনুরাগ লক্ষিত হয় না। প্রতি জীবেই এই রাগদ্বেষের পার্থক্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, তদ্দ্বারাই তাহাদের স্বভাব নির্ণয় করিতে হয়। স্বভাব রাগদ্বেষাত্মক হইলেও

প্রকৃতপক্ষে ইহা রাগাত্মক ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ, আলোকই আমার একমাত্র অনুরাগের কারণ বলিয়া তদ্বিপরীত অন্ধকার সহজেই হেয় হইবে। অতএব দ্বেষ অনুরাগজন্য বলিয়া, ইহা অনুরাগেরই অন্য এক রূপ, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত। রাগে গ্রহণ এবং দ্বেষে ত্যাগ করায়, এই জন্য রাগ ভাবাত্মক, এবং দ্বেষ অভাবাত্মক অর্থাৎ রাগেরই সত্তা আছে, দ্বেষের সত্তা নাই। সুতরাং স্বভাব রাগাত্মক। যে যাহা চায়, তাহাই তাহার স্বভাব, যে যাহা দ্বেষ করে, তাহাই তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। মৎস্য জলে বাস করিতে চায়। জলে বাসই সুতরাং তাহার স্বভাব। আবার স্থলে বাস ইহার পক্ষে অত্যন্ত হেয় বলিয়া, তাহা ইহার পক্ষে অস্বাভাবিক।

এইরূপে মনুষ্যস্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহাও রাগদ্বেষাত্মক। আনন্দভোগে ঈপ্সা, দুঃখভোগে জিহাসা কাহার না হয়? জীবনে প্রীতি এবং মরণে ভীতি সকলেরই দৃষ্ট হয়। মননশীল মনুষ্য মনন সহায়ে জ্ঞানোপার্জ্জনে একান্ত অনুরক্ত, অজ্ঞানের উপাসনা, সূর্য্যের অন্ধকার উপাসনার ন্যায়, তাহার পক্ষে অসম্ভব; জ্ঞানে আদর এবং অজ্ঞানে অনাদর তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এইরূপে মনুষ্যের স্বভাব, অর্থাৎ, মনুষ্য কি দিয়া গঠিত, জানিতে হইলে আমরা সহজেই দেখিতে পাই যে, আনন্দভোগই তাহার স্বভাব, দুঃখ নহে; জীবনধারণই তাহার স্বভাব, মরণ নহে, এবং জ্ঞানই তাহার স্বভাব, অজ্ঞান নহে। আনন্দভোগ আনন্দপদবাচ্য, জীবনধারণ সৎপদবাচ্য, এবং জ্ঞান চিৎপদবাচ্য। ঋষিগণ এইরূপে মনুষ্যকে, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

মানব সচ্চিদানন্দময় স্থির হইলে, যাহা মরণশীল, তাহা মনুষ্য নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। দেহবান্ মনুষ্যের জন্ম ও মরণ আছে, সুতরাং তিনি প্রকৃত মনুষ্য নহেন। এইরূপে ক্রিয়াময়, মননশীল, কর্ত্তা ও ভোক্তা-পদবাচ্য মনুষ্য নিদ্রাবস্থায় লয় হয়েন বলিয়া তিনিও প্রকৃত মনুষ্য নহেন, কারণ, সংস্বভাবের লয় হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই পণ্ডিতগণ মনুষ্যকে পঞ্চকোষাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোষান্তর্গত মানব প্রকৃত মনুষ্যের ছায়ামাত্র। কোষ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন বলিয়া প্রকৃত মানব অসীম, বিভু, মহতো মহীয়ান্, আর্য্য ঋষিকুলের এইরূপ মীমাংসা।

ক্ষত্রিয়কুলগৌরব শুদ্ধোদননন্দন শাক্যসিংহের জীবনে প্রকৃত মনুষ্যের বিকাশ যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য

সচ্চিদানন্দময় হইলেও পৃথিবীর প্রায় সমগ্র মানবমণ্ডলীই আপনাদিগকে নামরূপবিশিষ্ট, সোপাধিক, নশ্বর জীব স্বরূপ ধারণা করিয়া সন্তুষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে এরূপ বোধ হয় না যে তাঁহারা নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন, সর্ব্বতঃপূর্ণ, পরমানন্দময় পরম পুরুষ। ঘট কুড্যাদির ন্যায় তাঁহারাও নশ্বর, নানাবিধ অবস্থার অধীন, সুখ দুঃখের তরঙ্গমধ্যে দোদুল্যমান হইয়া নিত্যই কৃপাপাত্র ও কৃপাভিক্ষুক। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনেই তাঁহাদের যাবতীয় শক্তি ব্যয়িত হয়। তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যরূপে জীবনযাপন করিতে চাহেন, অমনিই তিনি স্বীয় স্ত্রী পুত্র, পরিবার, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতির ভাবভঙ্গি দেখিয়া, সেরূপ সঙ্কল্প হইতে বিরত হয়েন। সুতরাং এই সংসার-এক ধারায় আহার নিদ্রাদির বশবর্ত্তী মানবকুলকে লইয়া আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একজন এই মহা স্রোতের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া বজ্রনির্ঘোষে বলেন, "পশুবৎ জীবনযাপন করা মানবের উদ্দেশ্য নহে। স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই দুঃখসঙ্কুল সংসার-সমুদ্র হইতে আপনাদের উদ্ধার কর।" সেই শব্দে কেহ কেহ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠেন, এবং সেই দেবতুল্য সৌম্যমূর্ত্তির দিব্য মুখজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া, এবং তাঁহার অবিশ্বাসরূপ অন্ধকার বিনাশী সুযুক্তির আলোকপূর্ণ, সুমধুর, সহজবোধ্য, উপদেশাবলি শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ে আশা ও বল প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারাও তৎসঙ্গে সংসারসমুদ্রের উপর স্ব স্ব মস্তক উত্তোলন করেন এবং দেখেন যে, তাঁহাদের প্রাণের ক্ষুধা ও পিপাসা মিটাইবার একমাত্র বস্তু সম্মুখে জাজ্বল্যমান। তাহার অন্বেষণে এতদিন তাঁহারা মিথ্যা সংসারসমুদ্রের অতল তলে হাবুডুবু খাইতেছিলেন, তাহা যে ঐ ভয়সঙ্কুল, দুঃখময় সাগরের বাহিরে অবস্থিত, ইহা কেবল এই মহাপুরুষের বাক্যে জানিতে পারিয়া আপনাদের কৃতার্থ করিলেন। মধ্যে মধ্যে এইরূপে কেহ কেহ মহাপুরুষ সহায়ে আপনাদের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। এবং ঐ মহাপুরুষও মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা দিয়া অনেক দুঃখী, হতাশ, শোকসন্তপ্ত মানবকে নিত্য শান্তিনিকেতনে লইয়া যান। এই সকল পরদুঃখকাতর, শান্তিদানসমর্থ, মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে আসেন বলিয়াই এই দুঃখের সংসারে দুঃখী তাপীর দুঃখের অবসান আছে। তাহা না হইলে ইহা নরকতুল্য ভয়ঙ্কর হইত, অজ্ঞান অন্ধকার কখনও ইহা হইতে অপসৃত হইত না।

শাক্যসিংহ যে এইরূপ এক মহাপুরুষ ছিলেন, ইহা তাঁহার পূর্বজীবন পর্য্যা-

লোচনা করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আদর্শ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সর্ব্বসৌভাগ্যের আস্পদ, সুকোমলহৃদয় সেই রাজপুত্র নিখিল আরামনিলয় স্বীয় দিব্য প্রাসাদে যুবতী জায়া, ও নবজাত সন্তানের সহিত অশেষ দাসদাসীপরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তাহাকে সর্ব্ববিধ সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য তাঁহার স্নেহময় পিতা রাজা শুদ্ধোদন কোন যত্নেরই ক্রটি করেন নাই। প্রাসাদের চতুঃপার্শ্বে ক্রোশব্যাপী ইন্দ্রের নন্দনকানন তুল্য মনোহর উদ্যান। তন্মধ্যে কত প্রফুল্লকমলহংসকারণ্ডবাকীর্ণ, চিত্তমুগ্ধকারী সরোবর, কত কেলিসদন, কত দেবদেবীনরনারীর প্রস্তরময়ী, মনোহারিণী মূর্ত্তি, কত কেলিতরণীসমাকীর্ণ সরোবর হইতে সরোবরান্তরগামী, ঈষৎ তরঙ্গাকুল খাত, তাহা কে গণনা করিতে পারে? কিন্তু সেই পরিখা ও প্রাকার বেষ্টিত সুবিশাল উদ্যান সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বাধীনচেতা, মুক্তস্বভাব রাজকুমারের পক্ষে অনতিবিলম্বেই বিষম বন্ধনভূমির ন্যায় বোধ হইল। তিনি একদা প্রাতঃকালে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, "দেখিতে হইবে, এই প্রাকারের বহির্দ্দেশে কি আছে?" এরূপ স্থির করিয়া ছন্দকনামা স্বীয় সূতকে কহিলেন, "অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি উদ্যানের বহির্দ্দেশে গমন করিব, তুমি রথ লইয়া প্রস্তুত থাকিও।"

সমাচার পিতার কর্ণে উপনীত হইল। তিনি অমনি প্রজাবর্গকে স্বীয় রাজধানী সুসজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন, কুরূপ, কুশব্দ, ও কুগন্ধ যাহাতে রাজকুমারকে ব্যথিত না করে, এই বিষয়ে সকলকে বিশেষ সতর্ক হইতে কহিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত। উদ্যানের উত্তর দ্বার দিয়া ছন্দকপরিচালিত রথ নগরে প্রবেশ করিল। অসংখ্য নরনারী মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া রাজকুমারের দর্শনলালসায় উদগ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। কুমার রাজপথে উপনীত হইলে সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গায়ক ও নর্ত্তকগণ মধুরস্বরে মঙ্গলগীতি গান করিতে লাগিলেন। যুবরাজের তদ্দর্শনে ও তচ্ছ্রবণে অপার আনন্দ হইল।

সন্ধ্যা প্রায় অতীত হইয়া যায়। এমন সময় ছন্দক উদ্যানাভিমুখে রথ ফিরাইলেন। সেই সময় এক জরাতুর বৃদ্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন বলিয়া যষ্টির উপর ভর করতঃ নিকটবর্ত্তী কোনও পান্থকে পথ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং যদিও সেই পান্থ তাঁহাকে বার বার দক্ষিণে যাইতে কহিতেছিলেন, তথাপি শ্রবণশক্তিহীন বলিয়া বৃদ্ধ বিরক্ত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পথের কথা জিজ্ঞাসা

করিতেছিলেন। তাঁহার শ্বেত কেশ ও শ্মশ্রু, রদনহীন বক্তু, কম্পিত কলেবর, ও ভগ্নস্বর দর্শন এবং শ্রবণ করতঃ কুমার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সূত, এ কোন্ জাতীয় জীব?" সূত কহিলেন, "প্রভো, ইনি বৃদ্ধ, বার্দ্ধক্যে সকল মনুষ্যেরই এই অবস্থা হয়।" কুমার কহিলেন, "আমাকেও একপ হইতে হইবে?" সূত তাহাতে উত্তর দিলেন, "যুবরাজ, জরাবশে মনুষ্য মাত্রকেই এরূপ ইন্দ্রিয়শক্তিশূন্য, অজ্ঞান শিশুর ন্যায় হইতে হয়।" ইহা শুনিয়া তিনি নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। যান প্রাসাদে উপনীত হইল। সে রজনী তিনি সুখে আরাম করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় ছন্দকপরিচালিত রথ কুমারকে লইয়া উদ্যানের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় নগরবাসিগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং মধুর মঙ্গলগীতিরব চিন্তাকুল কুমারের চিন্তাকে ক্ষণকালের জন্য তিরস্কৃত করিয়া দিল। কিয়দ্দূর গিয়া যুবরাজ দেখিলেন যে, একব্যক্তি রোগের যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে, এবং আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তাহার স্বজনগণ বিবিধ উপায়ে তাহাকে স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। কুমার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, "কুমার, এ ব্যক্তি জ্বরে অভিভূত হইয়া বিষম যন্ত্রণা পাইতেছে। মনুষ্যদেহে ধাতুবৈষম্য উপস্থিত হইলে এরূপ হয়। যতদিন ধাতুসমূহ সমতা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন ইহাকে এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।" ইহাতে যুবরাজ কহিলেন, "সকলকেই কি এইরূপে সর্ব্বসুখবিনাশক অতীব ক্লেশজনক জ্বরের অধীন হইতে হইবে?" ছন্দক কহিলেন, "সর্ব্বকাল মনুষ্যের হিতাহিত বিবেচনাশক্তি থাকে না, সুতরাং তিনি অনেক সময়েই অত্যাচার করিয়া ফেলেন। সেই অত্যাচার হইতে ধাতুবৈষম্য, ও তাহা হইতে জ্বরের উদয় হয়।" যুবরাজ ব্যাকুলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রজনীতে উত্তমরূপ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় দিবস কুমারের রথ নগরের পশ্চিম দিকে, সন্ধ্যার সময়, উপনীত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় জয়ধ্বনি ও মঙ্গলগান আর তাঁহাকে অধিক উল্লসিত করিতে পারিল না। কিয়দ্দূর গিয়া যুবরাজ দেখিলেন যে, চারিব্যক্তি খট্টার উপর শায়িত পুরুষকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ কতিপয় স্ত্রীপুরুষ আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে গমন

করিতেছেন। এই করুণদৃশ্যে ব্যথিত হইয়া কুমার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কহিলেন, "হে কুমার, খট্টায় শয়ান পুরুষ আর জীবিত নাই। তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহমাত্র এখানে আছে। সকলকেই কোন না কোন সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। মনুষ্য শতবৎসর কাল মাত্র এ ভবধামে থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন। তাহার পর তাঁহাকে ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে। অধিকাংশই ষষ্ঠি বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে চলিয়া যান।"

এই নূতন সম্বাদে যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাকুলান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সে রজনী মুহূর্ত্তমাত্রও নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "যে জ্ঞান আমার এত প্রিয়, যাহার আমি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, বার্দ্ধক্যে তাহার অপলাপ হইবে, যে আনন্দ পৃথিবীর একমাত্র আকর্ষণ, রোগতাড়নায় তাহার লোপ হইবে; যে জীবন এত আশাময়, এত মনোহর, মৃত্যুতে তাহারও অবসান হইবে। তবে কিসের জন্য সকলে এই পার্থিব জীবনকে এত আদর করিয়া থাকে? মনুষ্য মাত্রেই উন্মাদরোগগ্রস্ত। যাহার স্থিরতা নাই, তাহাকে স্থিরজ্ঞান করা কি বাতুলতা নয়?" এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া তিনি অতি কষ্টে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাত হইল। প্রফুল্লকুসুমকুল প্রাতঃসমীরণে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া চারিদিকে আপন আপন সৌরভ বিকীর্ণ করিতে লাগিল। পক্ষিসমূহ পরমানন্দে প্রাভাতিক গান আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকৃতির সকলই মনোহর, সকলই উৎফুল্ল ও সজীব। যুবরাজের বদনকমলের অদ্য আর সেরূপ বিকাশ নাই। পাছে গোপা মনে ব্যথা পান, এই হেতু তিনি স্বীয় ভাব গোপন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সম্যক্ কৃতকার্য্য হইলেন না। পতিপ্রাণা গোপা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আরাধ্য দেবতার কোনও গভীর মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সশঙ্কিতচিত্তে যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আর্য্যপুত্র, অদ্য তোমাকে এরূপ বিমনা দেখিতেছি কেন? আমি কি তোমার নিকট কোনরূপে অপরাধিনী হইয়াছি?" সুমধুর প্রিয়সম্ভাষণে কুমার স্বীয় জায়ার শঙ্কা দূর করিলেন, এবং তিনি কোনও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন আছেন বলিয়া কিছুক্ষণ একান্তে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গোপা অন্যত্র গমন করিলেন।

ছন্দকপরিচালিত রথ সন্ধ্যার সময় অন্য উদ্যানের উত্তর দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। নাগরিকগণ জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যুবরাজ এক ভিক্ষাপাত্রধারী, কাষায়বসন, উদাসীন-দৃষ্টি ভিক্ষুককে দেখিয়া ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তির এরূপ উদাসীন ভাবে থাকিবার কারণ কি?" ছন্দক উত্তর করিলেন, "হে কুমার, এই মহা-পুরুষ জগতের অকিঞ্চিৎকরত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন। ইনি স্বীয় স্ত্রীপুত্রপরিবার প্রভৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ-পূর্ব্বক এক্ষণে যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বস্থলেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইঁহার কোনও নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। যখন যেখানে থাকেন, তাহাই উঁহার গৃহ। উঁহার আত্মপর কেহ নাই। উনি সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত।" এই সমাচারে ভাবিবুদ্ধের যাবতীয় চিন্তা দূর হইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন যে, সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী। অনিত্যে নিত্য-জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বাতুলতা মাত্র। যদিও তাঁহার নিদ্রা হইল না, তথাপি তিনি সে রজনী আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অজ্ঞান, দুঃখ, ও মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি? জগতের ক্ষণভঙ্গুর সুখে সর্ব্বতোভাবে উদাসী না হইলে সে উপায় কখনও উদ্ভাবিত হইবে না।"

যুবরাজ ইহা স্থিরনিশ্চয় করিলেন, এবং কিয়দ্দিবস পরে গোপনে রাজ্য হইতে পলাইয়া গিয়া ভিক্ষুবেশে ক্রমাগত ছয় বৎসর অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এবং বহুগুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক অকৃতকার্য্য হইয়া, পরিশেষে স্বচেষ্টায় সেই পথ আবিষ্কার করিলেন, যদ্দ্বারা গমন করিলে অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞান (চিৎ), আনন্দ চিরজীবন (সৎ) পথিকের লাভ হয়। সুতরাং বুদ্ধাবিষ্কৃত নির্ব্বাণ, ঋষিদৃষ্ট সচ্চিদানন্দময় স্বস্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৃত্যু।

'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥'

প্রাণিগণ প্রতিদিনই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তথাপি আর সকলে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবার বাসনা করিতেছে, ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য আর কি আছে? একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহা বলিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমি যখন ভাবিতে চেষ্টা করি, এই মুহূর্ত্তেই হয়ত আমি কলেরা বা প্লেগরোগাক্রান্ত হইয়া মরিতে পারি, তখন কে যেন আমার মনের ভিতর হইতে আশ্বাস দিয়া বলে, না, তুমি মরিবে কেন? যে মরিবার, সে মরিবে, আমি যতই তাহাকে সদযুক্তি দেখাই, বলি, কে তোমায় বলিল, আমি মরিব না, তখন সে তাহার নানা বিপরীত যুক্তি দেখাইতে থাকে। মরিবার কথা ভাবিলেই যেন মনটা দমিয়া যায়, কায কর্ম্মে যেন আর উৎসাহ থাকে না। যেন ভয়ে মন আড়ষ্ট হইয়া আসে। নানা বন্ধু নানা সান্ত্বনা বলেন,—জগতের ভিতর নানা অশুভ আছে সত্য, অশুভের সেরা মৃত্যু আছে, এ কথাও সত্য, কিন্তু যখন তখন ওরূপ চিন্তা করিয়া সংসারের রসভঙ্গ করিও না। বিবাহবিভ্রাটের নন্দলালের মত বাসরঘরে বসিয়া 'শেষের সে দিন মন' গাইও না। এখন যাহা চলিতেছে, সব চলুক; অশোভন অসুন্দর সমুদয় ব্যাপার গুলিকে নিরাবরণ করিয়া বীভৎস রসের সৃষ্টি করিও না। তোমার কি একটু কবিত্ব বোধ নাই, তোমার কি একটু artএর জ্ঞান নাই? যাহা কিছু অশুভ, তাহা যত না দেখিতে পার, চেষ্টা কর, যদি বাধ্য হইয়া দেখিতেই হয়, তবে তাহার উপর যত পার ফুল চাপাও, ফুল চাপাইয়া তাহা ঢাকিয়া রাখ, সোনার পাতে শব মুড়িয়া রাখ—জগতে আসিয়া কাযের লোক হও; অনর্থক ভাবুকতা করিও না।

যুক্তি জিনিষটা যেন মনের দাসীস্বরূপ, মনের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ; উহাকে যে দিকে লওয়াইবে, ও সে দিকে যাইবে। এই বন্ধুর যুক্তিগুলি কি রকম? যেন মনকে আঁখি ঠারা, মনের স্বাভাবিক গতিকে বন্ধ করিয়া রাখা। নিজেদের কার্য্যগুলি সমর্থনের জন্য বুদ্ধিবিচারকে যেন ধাবা দেওয়া। প্রকৃত বিচার কি কখন আমাদের হয়?

মৃত্যুচিন্তা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে উদিত না হইলে—সংসারের সমুদয় অশুভ, বিপদ্, দুঃখ সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে না রাখিলে সেইগুলি হইতে মুক্ত হইবার উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না। যাহাকে জয় করিতে হইবে, তাহাকে সর্ব্বদা চক্ষের সামনে রাখা দরকার, তাহার বলাবল পরীক্ষার দরকার, তাহা হইতে পলায়ন, তাহাকে ভুলিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। কত বিপদ্ যে আমাদের মস্তকের উপর সর্ব্বদা ঝুলিতেছে, তাহার গণনা করা যায় না। এই মুহূর্ত্তেই, যে গৃহে বসিয়াছি, তাহার ছাদ পড়িয়া যাইতে পারে—নদীতে গমন কালে নৌকা ডুবি হইতে পারে; গাড়ীতে যাইতে যাইতে বা ট্রামে চলিতে চলিতে ঘোড়া খেপিয়া বিপদ্ ঘটাইতে পারে, এমন কি, ধূমপান করিতে করিতে তাহার ভিতর হইতে সর্প বহির্গত হইয়া লোকের মৃত্যুসাধন করিয়াছে, শুনা গিয়াছে। নানাপ্রকার রোগ যেন যমদূতের মত সর্ব্বদা জগতে সঞ্চরণ করিতেছে, কাহাকে লইবে, কিছু ঠিক নাই। পরন্তু এই দেহনাশের এত প্রকার উপায় রহিয়াছে যে, তথাপি কেন এই দেহ এখনও স্থির রহিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সুখ দুদিনের জন্য, আমোদ দুদিনের জন্য, উৎসব দু দিনের জন্য, তার পর ঘোর অন্ধকার। রাজা প্রজা, বড়লোক ছোটলোক, এ বিষয়ে কাহারও প্রভেদ নাই।

একবার এই মৃত্যুর কথা গভীরভাবে ভাবিলে আমাদের আশা উদ্যম, সুখচেষ্টা, প্রেম, অহঙ্কার, অভিমান সমুদয়ই দেখিয়া হাসি পায়। মানুষের এই শক্তি! এই শক্তির এত অহঙ্কার? এত ঐশ্বর্য্য, এত সম্পদ্, তাহার এই পরিণাম! এত বিদ্যা, এত মান, তাহার এই পরিণাম! আবার এত উৎসব, এত প্রেম, এত হাঁসি খুঁসি, তাহারও এই পরিণাম! কি ভয়ানক! মরিবার জন্যই এই জন্ম—জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উপ্ত, একদল যাইতেছে, আর এক দল আসিতেছে।

ভগবানের সৃষ্টি কখন শূন্য থাকিতেছে না, কিন্তু আজ যে দল, কাল আর সে দল নাই! আজ যে ছেলে, কাল সে ছেলের বাপ হইতেছে, পরশ্ব সে ঠাকুরদাদা হইয়া নাতিদের সহিত আমোদ করিতে লাগিল। পরদিন সে আপনার স্থান শূন্য করিয়া দিয়া অপরকে আবার তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতেছে। সে ঠাকুরদাদা এখন গেলেন কোথায়? কে জানে?

এখন কথা এই, এই মৃত্যু ব্যাপারটী সত্য, আবার ইহাতে যে মানুষের একটা মহাভয়, তাহাও সত্য, কিন্তু এই সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন মানুষের মনে

স্বতঃ উদয় হয়। ১ম, এই মৃত্যু কোনরূপে নিবারণ করা যাইতে পারে কি না, ২য়, ইহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত কি না, ৩য়, মৃত্যুর পর কি হয়, ৪র্থ, যদি ইহাকে নিবারণ করা অসম্ভব বা অনুচিত হয়, তবে তজ্জনিত মহাভয়, মহা আতঙ্ক নিবারণেরই বা উপায় কি আর ঐ ভয়ের কারণই বা কি? এই গুলির যথামতি আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

সমুদয় জগতে চিরকাল ধরিয়া চেষ্টা চলিয়াছে, মৃত্যু একেবারে লোপ করিয়া দিয়া কিসে চিরজীবিত্ব লাভ করিতে পারা যায়। এই চেষ্টার ফলে চিরজীবিত্ব না হউক, দীর্ঘজীবিত্ব লাভ অনেকের হইয়াছিল, পড়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ঋষি অনেক সাধনার পর ১১৬ বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক যুগে শুনা যায়, অনেকে স্বভাবতঃই ১০।২০ হাজার বৎসর জীবন ধারণ করিতেন আবার অনেকে যোগ-তপস্যার দ্বারা উহা আরো বাড়াইতেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রসায়ন নামক এক দর্শনের কথা পাওয়া যায়; সেই দর্শনানুসারিগণ পারদের অদ্ভুত শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, পারদ কোন এক বিশেষ প্রকারে প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহার সেবনে মানুষ অসম্ভবরূপ দীর্ঘায়ু হইতে পারে। হঠযোগীরাও প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা অতিশয় দীর্ঘায়ু হইতে পারা যায়, বলিয়া থাকেন। শুধু আমাদের দেশে নহে, ইউরোপেও এক সময়ে আলকেমি নামক এক বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। এই আলকেমিষ্টগণ দ্রব্যগুণ দ্বারা এমন কোন রসায়ন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেন, যাহাতে মানুষ মৃত্যুকে একেবারে জয় করিতে পারে। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিয়াও আজ কাল বৈজ্ঞানিক জগতেও এই অনুসন্ধানের কথা দেখা যায়—দুই চারিটী ব্যক্তির কথা শুনা যায়, যাঁহারা পরিমিত জীবনযাপনের দ্বারা সাধারণ আয়ুকাল অপেক্ষা অধিক দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। একজন পার সাহেবের কথা পড়া যায়, যিনি ১২০ বৎসর বয়সে পুত্রমুখ দেখেন এবং ১৫৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বৈজ্ঞানিক-গণও যোগীদের দীর্ঘজীবন প্রভৃতি ব্যাপারে উপহাস করিলেও বাস্তবিক তাঁহারাও যে ইহা অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে কথা এই, এই দীর্ঘজীবন হইলেও মৃত্যুশঙ্কা একেবারে গেল না। রোগজরার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইলেও অপঘাতমৃত্যুর সম্ভবনীয়তা নিবারণ হইল না। তার পর কথা এই, এই দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব হইলেও ইহা প্রার্থনীয় কি না। এই দীর্ঘজীবন লইয়া কি করিব? পার্থিব সমুদয়

সুখ সম্ভোগ করিব ? না, তত্ত্ব অন্বেষণ করিব ? সুখসম্ভোগে কি এক দিন বিতৃষ্ণা আসিবে না ? ইহা কি এক দিন একঘেয়ে হইয়া যাইবে না ? আর যদি তত্ত্বানুসন্ধানেই জীবন যাপন করি, তবে ত এখনকার পরমায়ু লইয়াও তত্ত্বালোচনা করিতে পারি। আর মরিলে হয়ত কোন অজানিত রাজ্যে গিয়া অনেক নূতন নূতন তত্ত্বালোক পাইতাম। তাহাতেও ত বঞ্চিত হইলাম। আর এখনকার মত মৃত্যু থাকিলে হয়ত সংসারে আসক্তি অনেকটা কমিত। তত্ত্বান্বেষণে স্পৃহা অনেকটা বাড়িত। আর যতই দীর্ঘজীবন লাভের আশা থাকুক, কাল যে মরিব না, এ বিশ্বাস কেহ যে কখন নিশ্চিত করিয়া পোষণ করিতে পারেন, ইহা ত আমার বোধ হয় না। আসল সমস্যা যে মৃত্যুভীতির নিরাকরণ, তাহা ইহাতেও হইতেছে না।

এই মৃত্যুর পর কি হয়, তাহা জানিবার জন্য চিরকাল অনুসন্ধান চলিয়াছে। নিশ্চয় কিছু হইয়াছে কি না, কে জানে ? কঠোপনিষদে নচিকেতারও এই প্রশ্ন, মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না ? তাহাতে বলা হইয়াছে, মানুষ কর্ম্ম ও সংস্কার অনুসারে কেহ বা স্থাবর যোনি, কেহ বা পশুযোনি, কেহ বা মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়, সৎকর্ম্মী-দের নানালোক লোকান্তর দিয়া শেষে চন্দ্রলোকে গতি হয়, অবশেষে আবার পৃথিবীতে আসিতে হয়। যাঁহারা জ্ঞানপরায়ণ, তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয়, তথা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। আবার যাহারা অতিশয় পাপকর্ম্মী ছিল, তাহাদের মশক দংশাদি হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণগ্রস্ত হইতে হয়। পুরাণে আবার আমরা নানাবিধ লোকের কথা পাঠ করিয়া থাকি ;—ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জনাদি এবং ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ লোক প্রভৃতি উচ্চতর লোকসমূহ এবং পাতাল, তলাতল, রসাতল প্রভৃতি নিম্নতর লোকসমূহ। আবার রৌরব, মহা-রৌরবাদি নানাবিধ নরকেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ ভাব স্পষ্টতঃ সর্ব্বত্র বর্ণিত আছে যে, স্বর্গনরকাদি যাহাই ভোগ হউক না, এই নরলোক অথবা অন্য কোন লোকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে, যতদিন না জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানের উদয়ে আর এই সংসারচক্রে আবর্ত্তন করিতে হয় না।

হিন্দুধর্ম্মের সন্তান বৌদ্ধধর্ম্মেও নানাপ্রকার স্বর্গনরকাদি এবং পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকৃত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বলেন, মৃত্যুর পর মানুষ হয় অনন্ত স্বর্গে, নয় অনন্ত নরকে গমন করিয়া থাকে কিন্তু বাইবেল মনোযোগপূর্ব্বক আলোচনা করিলে তাহাতেও স্থলে স্থলে পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রভাবে এই সকল পারলৌকিক ব্যাপার উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞান প্রমাণ ব্যতীত কোন জিনিষ স্বীকার করিতে চান না। তিনি বলেন, ও সকল স্বর্গ নরকাদির কোন প্রমাণ নাই। শুধু তাহাই নহে, তিনি মৃত্যুর পর আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান। বিজ্ঞান সব কাটিয়া ছাঁটিয়া এইটুকু বলিতে চান, "ও সকল ব্যাপার সম্বন্ধে আমি 'না', 'হাঁ,' কিছুই বলিতে পারি না। ও সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞেয়বাদী। আমি বলি, ও সকল অনর্থক বিষয়ে মাথা ঘামাইয়া অনর্থক শক্তিক্ষয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

কিন্তু মানুষের প্রাণ বিজ্ঞানের স্তোকবাক্যে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। জানিতে না পারিলেও সে সর্ব্বদা যবনিকার অন্তরালে উঁকি মারিতে চেষ্টা করে। আধুনিক বিজ্ঞানের পীড়নে পূর্ব্ববিশ্বাস হারাইতে বসিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদের কতকগুলি ব্যক্তি প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) নামক এক নূতন বিদ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা এমন অনেক প্রমাণ দেখান, যাহাতে বোধ হয়, পরলোকের সহিত ইহলোকের ক্ষণিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। ইঁহারা অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইতেছেন, এবং বলিতেছেন, মৃতের প্রেতাত্মা ব্যতীত অন্য কোন জড়শক্তির কর্তৃত্বে এ সকল ঘটা অসম্ভব। অবশ্য ইহার মধ্যে অনেক জালজুয়াচুরী থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু সকল ঘটনাগুলি একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহারা যে প্রেতাত্মার কর্তৃত্বে ঘটিতেছে, কি আর কোন অজানিত শক্তির প্রভাবে হইতেছে, সে সম্বন্ধে এখনও নিঃসংশয় প্রমাণের অভাব রহিয়াছে।

সম্পূর্ণ জড়বাদীকে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব। তাঁহার বুঝা উচিত, যদি তিনি তাঁহার কোনরূপ ইন্দ্রিয়সাহায্যে বা কোনরূপ যন্ত্রবলে আত্মার সাক্ষাৎকার পাইতে পারেন, তবে সেই আত্মা অন্যান্য জড় পদার্থের ন্যায়ই হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য, জড়ের প্রমাণ কি? আমার অনুভব ব্যতীত দ্বিতীয় প্রমাণ কিছু আছে কি? আমার অনুভব যদি জড়েরও প্রমাণ হয়, তবে চৈতন্যকে প্রমাণ করিতে হইলে তাহাকে চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত আর কিসে প্রমাণ করা যাইবে? জড়বাদীরা যে বলিয়া থাকেন, মন বা আত্মা মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিশেষ, কিন্তু জিজ্ঞাস্য, তোমার মস্তিষ্ক তুমি কি কখন দেখিয়াছ? তুমি অপরের মস্তিষ্ক দেখিয়া, অনুমান করিতেছ, তোমার মস্তিষ্ক আছে। কিন্তু তুমি তোমার মনকে সাক্ষাৎ

জানিতেছ। আর ইহার যে একেবারে ধ্বংস হয় না, তাহার প্রমাণ এই যে, কেহই 'আমি নাই বা থাকিব না', এরূপ চিন্তা করিতে পারে না। আসল কথা এই, স্থূল বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্ব বুঝা যায় না। যেমন স্বরজ্ঞানের জন্ত বিশেষরূপে কর্ণকে প্রস্তুত করিতে হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ত শুদ্ধচিত্ত হইতে হয়। কেহ বলিতে পারেন, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কি তবে স্থূলবুদ্ধি? উত্তর—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বটে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্ত যেরূপ শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা কোন কিছু না মানিয়াও হইতে পারে। সংযতেন্দ্রিয়, সংযতচিত্ত হওয়া কোন রূপ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। পরোপকারের জন্ত আত্মবলিদানে প্রস্তুত হইয়া থাকা কোন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। অতএব যাঁহার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না হয়, তাঁহার বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক, তিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন কি না।

তার পর দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব একবার স্বীকার করিলে তাহার যে পুনর্ব্বার দেহধারণ সম্ভব, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেক তত্ত্বের, অনেক জটিল প্রশ্নের সমাধান হয় বলিয়া ইহাকেই আপাততঃ একটী স্বীকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুনর্জ্জন্মবাদের যুক্তিপরম্পরা সকলেই বোধ হয় জানেন, তজ্জন্য উহার বিস্তার করিলাম না।

কিন্তু সে কথায় কি হইল? মৃত্যুভয় ঘুচে কিসে? দেখা যাক, মৃত্যুকে আমাদের এত ভয় হয় কেন? প্রথমতঃ, দেখিতেছি, আমরা এই শরীর লইয়া নানাবিধ ভোগ করিতেছি। যদি এই শরীরের অঙ্গবিশেষ নষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা কত দুঃখিত হইয়া থাকি ও আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য মনে করিয়া হাহাকার করি। তখন সমগ্র ভোগের আয়তন শরীরটী নাশ হইয়া গেলে যে কিছুই ভোগ করিতে পাইব না—দেখিবার ইচ্ছা, দেখিতে পাইব না; শুনিবার ইচ্ছা, শুনিতে পাইব না, বলিবার ইচ্ছা, বলিতে পাইব না; খাইবার ইচ্ছা, খাইতে পাইব না—এরূপ অবস্থা মহা বিড়ম্বনার কারণ ভাবিয়া আমরা মৃত্যুকে মহা অমঙ্গলের বিষয় মনে করিয়া উহার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করা অন্যায় মনে করি। আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের ধারণা ভোগ ও ভোগাভাব বা ভোগশক্তির অভাবেই সীমাবদ্ধ।

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কিরূপভাবে আপনাকে গঠন করিতে পারিলে আর মৃত্যুভয়ে ভীত হইতে হইবে না। বস্তুতঃ, যদি আমরা এখন হইতেই চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সংযোগ না হয়, অর্থাৎ যদি

আমরা এখন হইতে একটু একটু করিয়া মরিতে অভ্যাস করি, তবে বোধ হয়, মৃত্যু আমাদিগকে একেবারে অত ভীত করিতে পারিবে না। দেহ থাকিতে থাকিতে যাহাতে আমরা দেহজ্ঞানশূন্য হইতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা কিরূপে করিতে হইবে, তাহারই উপায় শাস্ত্র ও গুরুমুখে পাওয়া যায়। ইহা বড় কঠোর সাধনা। বলেন কি, যে মৃত্যুকে আমাদের এত ভয়, সেই মৃত্যুরই সাধনা। আসক্তির সমূলে উৎপাটন—ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহির্বিষয় ছাড়াইয়া, তথা হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে নিয়োগ। একি সাধারণ কথা? কিন্তু যদি আমরা মৃত্যুভয়শূন্য হইতে চাই, তবে এই পথ ছাড়া আর উপায় নাই। যে যে অবস্থায় অবস্থিত আছে, তাহাকে তাহারই ভিতর থাকিয়া ধীরে ধীরে এই চেষ্টা করিতে হইবে।

কামনা, সুখভোগের ইচ্ছা যে হেয়, পরিত্যজ্য—তাহার আর এক কারণ, সত্য ও সুখ দুইটী পৃথক্ পদার্থ। সত্যলাভ করিবার যার চেষ্টা আছে, সে যেন সুখের প্রয়াসী না হয়। দিবারাত্রি ত আমাদের হয় সুখভোগে, না হয় সুখের আকাঙ্ক্ষায়, না হয়, উহার বিরহে কাটিয়া যাইতেছে। সত্য অনুসন্ধান হইতেছে কই? ভয়ের উৎপত্তি মিথ্যা হইতে—অসত্যনিষ্ঠা হইতে। সত্য—নিত্য বস্তু—সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান—উহা সর্ব্বব্যাপী, নিত্যপ্রাপ্ত, উহা হারাইবার ভয় নাই।

সেই নিষ্কাম, ভক্ত, জ্ঞানী, স্থির, ধীর, শান্ত, অচল, অটল, নিষ্কম্প মহাপুরুষই ধন্য, যিনি মৃত্যুভয়শূন্য হইয়া সদা আত্মাতে আনন্দ করিতেছেন।

দীনতা সাধন।

অনেকে, বিশেষতঃ ভক্তসম্প্রদায়ে, কথায় কথায় আপনাদিগকে দীনহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অবশ্য, কপটদের কথা ধরিতেছি না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনবোধ সম্ভব কি না, আর যদি সম্ভব হয়, উহা উন্নতির সহায়ক, না, উন্নতির প্রতিকূল? আমার আশঙ্কার কারণ-গুলি বলিতেছি। যদি যথার্থ বিচার করিয়া দেখি, তবে ত দেখিতে পাই, আমি বাস্তবিক অনেকের হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি জগতের সর্ব্বনিকৃষ্ট, এইরূপ ভাবা একটা নিরর্থক ভাবুকতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? দেখিতেছি,

কত লোকে দিন রাত কত ভয়ানক ভয়ানক অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে! আমি সত্যসম্বন্ধে একেবারে অন্ধ না হইলে কিরূপে মনে করিতে পারি, আমি তাহাদের অপেক্ষা হীন? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, অসৎ ব্যক্তিগণ যে অবস্থাচক্রে পড়িয়া সেই সকল অসৎ কর্ম্ম করিয়াছে, আমি সেই সকল অবস্থায় পড়িলে তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অসৎ কর্ম্ম করিতাম না, তাহার প্রমাণ কি? আমি বলি, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়ে যে, অবস্থাচক্রকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, আরও ইহাতে এই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে, সকল মানুষই সমান, কারণ, অবস্থাচক্র অতিক্রমে সকলেরই সমান সামর্থ্য। তবে আর আমি অপরের অপেক্ষা হীন হইলাম কিরূপে? সুতরাং বোধ হইতেছে, কেহই সত্যের বিরোধী না হইয়া কখনই এই দীনতা সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

কিন্তু বাস্তবিক এই দীনতাসাধনের অন্যরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। মানুষ যখন উন্নতি করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার ক্রমশঃ আপনার দিকে প্রখর দৃষ্টি পড়িতে থাকে। অপরের দোষ গুণের আলোচনার দিকে দৃষ্টি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ক্রমশঃ সে দেখিতে পায়, বাস্তবিক যাহাদিগকে আগে অসৎ দেখিতেছিলাম, তাহাদের মধ্যে ভগবান রহিয়াছেন। সেই ভগবানের দিকে তাহার ক্রমাগত দৃষ্টিবশতঃ তাহার বাস্তবিকই সকলের উপর যথার্থ ভক্তি হইতে থাকে। এমন কি, জড়পদার্থগুলির উপর পর্য্যন্ত তাহার যে স্বাভাবিক ঘৃণা, তাহাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কেবল কি তাহার নিজের উপরই ক্রমাগত ঘৃণা হয়? তাহা কখনই হয় না। তাহার ঘৃণা হয় অহংভাবটীর উপর। যে অহংভাবটীর দরুন আমাদিগকে সকল ভূতে ও সকল বস্তুতে ব্রহ্মবোধ করিতে দেয় না, তাহারই উচ্ছেদে তাহার প্রাণপণ শক্তি নিয়োজিত হয়।

এই অহংভাব দূর করিবার জন্য মহাপুরুষগণ দুইটী পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ১ম—আমিত্বের প্রসার, ২য়, আমিত্বের সঙ্কোচ। প্রথমটীতে 'আমি' এই সমুদয় জগদ্ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—সবই আমি, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, দ্বিতীয়টীতে সেই বিরাট্ সর্ব্বব্যাপী পুরুষের সত্তাতে ক্ষুদ্র 'আমি' জ্ঞানটী ধীরে ধীরে ডুবাইতে হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, উভয়টীতেই 'আমি' জ্ঞানের বিনাশ হয়, আবার উভয়টীতেই প্রকৃত 'আমি' স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়। এই উভয় অবস্থাই এক এবং অনির্ব্বচনীয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন

ব্যক্তিগণ যথার্থই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডকে ও আপনাকেও প্রকৃত প্রেম ও ভক্তির সহিত পূজা করিতে পারেন।

দীনতার যথার্থ ধারণা করিতে হইলে বুঝিতে হইবে—দীনতা অর্থে আত্মবিসর্জ্জন। আমরা ভ্রান্তবুদ্ধিতে বুঝিয়া থাকি, জগৎ সংসার সমস্ত যেন আমারই জন্য—আমারই সুখভোগের জন্য—সৃষ্ট। এই বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আমি সংসারে সকলকে ঠেলিয়া আপনিই অগ্রবর্ত্তী হইতে বাসনা করি। কিন্তু যথার্থ সাধু পুরুষ জানেন, এ সংসার আমার জন্য নহে, সুতরাং তিনি আপনাকে সর্ব্বদা সকলের পশ্চাতে রাখিয়া থাকেন। তাঁহার এই উদাহরণের প্রভাবে সকলেই যদি আপনাকে সকলের পশ্চাৎ রাখিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে অতি মহৎ ফলই ফলিয়া থাকে, জগতে সংঘর্ষ একেবারে উঠিয়া যায়; সুতরাং এই আত্মবিসর্জ্জন সাধনেই যথার্থ দীনতাসাধন হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যিনি 'আমি'র বিস্তার করিতে চান, তাঁহারও লক্ষ্য বাস্তবিক অহংবিনাশ। সুতরাং তিনিও প্রকৃত দীনতার সাধক, তাহার সন্দেহ নাই। এই জ্ঞানসাধক যতই উন্নত হউন না, তিনি কখনই ভাবিতে পারেন না, আমি খুব উন্নত হইয়াছি, কারণ, তিনি জানেন, আমি বাস্তবিক অনন্তস্বরূপ, সুতরাং আমি যে একটু উন্নতি করিয়াছি, মনে করিতেছি, তাহা ত কিছুই নয়। মোট কথা, যাঁহার মনে সর্ব্বদা অতি মহা আদর্শ বিরাজিত, তাঁহার কখন অভিমান আসিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দিবানিশি ঈশ্বরচিন্তাই দীনতা লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন।

আমরা আমাদের অভিমান নানাপ্রকার লৌকিক বিষয়ের উন্নতির উপরও স্থাপিত করিয়া থাকি। আমি ধনী, আমি সদ্বংশজাত, আমি বিদ্বান পণ্ডিত, এই সকল অভিমান সচরাচর আমাদের হইয়া থাকে। আমরা যদি ধনমান বিদ্যা প্রভৃতির অনিত্যত্ব সর্ব্বদা চিন্তা করি এবং নিত্য অনন্ত পদার্থের চিন্তায় দিবানিশি মনকে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, তবে এই সকল অভিমান ধীরে ধীরে কোথায় পালাইয়া যায়! নিউটনের সেই কথা স্মরণ করুন,—আমি অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের তটে কতকগুলি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র, অনন্ত সমুদ্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। সক্রেটিসকে যখন ডেলফির প্রত্যাদেশবাণী গ্রীসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিল, তখন তিনি আপনার মহত্ত্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলেন, আমি যে কিছু জানি না, আমি এইটীই জানি বলিয়াই আমাকে লোকে এত বড় বলিতেছে। বাস্তবিক

যে প্রকৃত দীন, সেই যথার্থ সত্যের উপাসক—সে জগতের মধ্যে আপনার স্থান কতটুকু, জগতের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা জানিয়াছে। সে বুঝিয়াছে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি একটী ক্ষুদ্র বেঙ্গাচিতুল্য; সে বুঝিয়াছে, জগতে যাহাদিগকে নগণ্য তুচ্ছাৎ তুচ্ছতম পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতেছে, আমিও এক সময়ে সেই সকল ছিলাম। ক্রমবিকাশে আমি এখন এই মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি, আবার কত উন্নতি হইবে, কে জানে?

দীনতা ব্যতীত উন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। অভিমানের অর্থ উন্নতির গতি রোধ—যে অবস্থায় আছি, তাহাতেই তৃপ্তি—সীমাবদ্ধ হইয়া থাকা। দীনতা ব্যতীত অপরের মহত্ত্ব বুঝা যায় না, অপরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা অন্ধ হইয়া থাকিতে হয়, মনের প্রসার হয় না।

অতএব মনকে সর্ব্বদা এরূপ ভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের জগতে সর্ব্ববিধ দোষদর্শন সত্ত্বেও সর্ব্বদা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবের সম্ভবনীয়তাতে বিশ্বাস হয়। এই বিশ্বাস ব্যতীত কখন উন্নতি হইতে পারে না।

পূর্ব্বে দীনতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে অবশ্য বেশ বুঝিতে পারা গেল, এই দীনতা একটী মহাশক্তিস্বরূপ। এই দীনতার তেজের নিকট যাহাদিগকে আমরা বড় লোক বলি, রাজা মহারাজা, বিদ্বান সকলকেই মাথা নুয়াইতে হয়। অতএব এই দীনতা সাধনকে আমরা যেন কখন না ভুলি।

কীটের সিদ্ধিলাভ।

কীট আমি দলে সবে পায়,
ঘৃণা করে মোরে কীট বোলে;
কেন আমি বল কার দোষে
এতই অধম ভূমণ্ডলে?

পিতামাতা গুণ দোষ ভাগী
পুত্রকন্যা—পণ্ডিতেরা বলে—
আমিও কি পিতামাতা দোষে
হেন নীচ এ মহীমণ্ডলে?

প্রতিপদে অতি সশঙ্কিত
কেহ নাহি স্নেহদৃষ্টি করে,—

ভয়—কারো পদচাপবলে
বুঝি মোর পরাণ বাহিরে।

বুঝি দগ্ধ বিধাতার কোপে
হেন দশা হয়েছে আমার ;
রে বিধাতঃ, তাই যদি হয়,
দিই তোরে শাপ বারম্বার।

কিম্বা বুঝি গ্রহপরবশে,
দুরবস্থা এত হল মোর,
তবে বল, বল কিরূপেতে
ঘুচাই এ দুরদৃষ্ট ঘোর ?

কেমন সুন্দর পাখা ভরে
উড়ে পাখী গগন মাঝারে ;
সুমধুর কূজন ছড়ায়ে,
সকলের প্রাণ লয় হরে।

কেমন সে প্রতিহিংসাক্ষমা
ভুজঙ্গিনী বিচরে মহীতে ;
ক্ষুদ্র অনিষ্টেতে প্রতিশোধ
দেয় কত আনন্দিত চিতে।

ব্যাঘ্র সিংহ কথা কি বলিব ?
সবে শক্ত আপন রক্ষায় ;—
আমিই কি কেবল একাই
ভূলুণ্ঠিত, ঘৃণিত ধরায় ?

মানুষের কথা ছেড়ে দাও ;
সেত হয় দেবতার প্রায়—
বল বল কার তীব্র দোষে—
এত নীচ আমি এ ধরায় ?

কেন মোর জীবনের সাধ ?
কেন মোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদে ?

দিব প্রাণ দিব বিসর্জ্জন
পড়িব না আর মায়া ফাঁদে।

কীট নাম বিলুপ্ত করিব,—
আলিঙ্গিব মরণে নিশ্চয়;—
বৃথাই ঘৃণিত বপু ধরে
ধরা ভ্রমা উচিত না হয়।

ভাবি পুনঃ কঠোর সাধনে
মহা ঘোর যোগ তপস্যায়
কীটত্ব কি যাবে না কখন?
দেবত্ব কি হবে না উদয়?

হবে হবে, বলে হৃদিবাণী
ভয় নাই, মাত উৎসাহেতে,
যায় যাক্, থাকে থাক্ প্রাণ,
চালি অঙ্গ তপস্যার স্রোতে।

তপস্যায় জগৎ. সৃজন,
তপস্যায় ধরা নিয়মিত;
তপস্যায় ষড়্‌ঋতু বয়,
তপস্যায় বায়ু প্রবাহিত।

কিম্বা কেন কল্পনার স্রোতে
ভাসিয়া চলেছি আমি হায়?
করিব এখনি তপ ঘোর,
ঘুচাইব অদৃষ্ট বালাই।

যে কোন কারণে এই দশা,
কিবা কায বিচার করিয়া?
বর্ত্তমান উন্নতি সাধকে
সঁপিব এ প্রাণ মন হিয়া!

আছে শক্তি আমার ভিতরে,
অনুভূত হইতেছে হৃদে,

সর্ব্বশক্তি কবি পরাজয়
জয়ী হব, কিবা কায খেদে।

যদি হয় এ ঘোর সংগ্রামে
একান্তই মোর পরাজয়;
বুঝিব এ ধরার মাঝারে
উচ্চ আশা ব্যোমপুষ্প প্রায়।

কিন্তু নাহি কোরে প্রাণপণ
কেন দিই নানাজনে দোষ?
কেন বৃথা বিফল রোদনে
কেন বৃথা কোরে অসন্তোষ?

অথবা সন্দেহ কেন করি,
সদ্ধ শোভে অলস জনাব,
সক্ষম কি অক্ষম করিতে,
দেখা যাক দশা প্রতীকার।

এত বলি কীট তপস্যামগন,—
অনেক কঠোর সাধনার পরে,
মহাশক্তি আর মহা জ্ঞান লভি,
কীট দেহ ত্যজি নরদেহ ধরে।

হইল পরম উচ্চ সিদ্ধ যোগী—
পরম সন্তোষ উদয় হৃদয়ে—
ধরাবাসী সবে শাপভ্রষ্ট ভ্রমে—
স্তব করে তাঁরে সম্ভ্রমে বিস্ময়ে—

আমরা কি কীট হতে এতই অধম?
হবে না কি শক্তিস্ফূর্তি কখন হৃদয়ে?
ঘৃণিত দলিত হয়ে রব চিরকাল—
মাটীর পুতুল রব মাটীতে মিশায়ে?

ঠাকুরদাদার গল্প।

সুখটুকুও আছে আবার রাগটুকুও আছে।

একদা এক দণ্ডী ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া কোন বৃক্ষতলে এক-খানি ইট মাথায় দিয়া শুইয়াছিলেন। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সেই পথ দিয়া জল আনিতে যাইতেছিল। তাহারা দণ্ডীকে এইরূপ ইষ্টক মস্তকে শুইতে দেখিয়া আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল, দেখ দিদি, ইনি দণ্ডী হয়েছেন, সংসার ছেড়েচেন, তবু এঁর এখনো সুখটুকু আছে, শুধু মাথায় শুতে পারেন না, আবার ইঁট মাথায় দেওয়া হয়েচে। দণ্ডী সমস্ত শুনিয়া ভাবিতে লাগি-লেন, তাইত, আমার এখনো ত সুখবাসনা যায় নাই, আগে না হয় বালিশ মাথায় দিতাম, এখন নয় তাহার পরিবর্ত্তে ইট মাথায় দিয়াছি, একটা কিছু মাথায় দেওয়া চাই। কেন, শুধু মাথায় শুইতে পারিব না কেন? এই বলিয়া তিনি ইট খানি মাথা হইতে সরাইয়া শুধু মাথায় শুইয়া রহিলেন। জলপূর্ণ কলস কক্ষে করিয়া গ্রাম্য নারীগণ আবার সেই পথ দিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিতেছিল। তাহারা পুনরায় দণ্ডীর কাছ দিয়া যাইতে লাগিল। দণ্ডীকে এবার শুধু মাথায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা আবার পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—দিদি, সন্ন্যাসী ঠাকুরের রাগটুকুও আছে। মেয়ে মানুষের দুটো কথা সইতে পারলেন না, অমনি ইটখানা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, মজা মন্দ নয়। আর তিনি কখন লোকের কথায় চালিত হইতেন না।

পালকের গদি।

নলিনী বাবু হালে বড়লোক হইয়াছেন। অনবরত তাওয়া দিয়া গুড়-গুড়িতে তামাক চলিতেছে। টানা পাখায় হাওয়া চলিতেছে। চাকর বাকরে কেহ পাদসম্বাহন করিতেছে, কেহ দূরে দাঁড়াইয়া হুকুমের অপেক্ষা করিতেছে। অনেক টাকা খরচ করিয়া অনেক যত্নে একখানি পালকের গদি তৈয়ার করাইয়াছেন, তাহাতে বাবু শায়িত। হঠাৎ বাবু উঠিয়া ডাকি-লেন, ভোজো! ডাকিতে না ডাকিতে ভজহরি যোড়হস্তে হাজির। বাবু বলিলেন, কোচম্যানকে গাড়ী তৈয়ার করতে বল, একটু হাওয়া খেয়ে আসি। বাবু হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছু পরে সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠামাখা কাদামাখা ন্যাংটা একটা লোক আসিয়া

হাজির। আসিয়া পাগলের মত বাবুর সেই সখের গদির উপর যাইতে উদ্যত। চাকরদের বাধা প্রদান। পাগল কিছু না মানিয়া গদির উপর শয়ন করিল ও একবার এ পাশ একবার ও পাশ করিতে লাগিল। চাকর বাকর তাহাকে ছুঁইতেও পারে না, গায়ে বিষ্ঠামাখা, অবার একটা কুসংস্কার—বোধ হয় এ পরমহংস, কোন কিছু বলিলে শাপ দিতে পারে, এদিকে বাবুর ভয়ে সন্ত্রস্ত। এদিকে এই গোলমাল, এমন সময় বাবু আসিয়া হাজির। ছিলাম ভরো, বলিতে না বলিতেই ব্যাপার দেখিলেন, চাকর বাকরে যোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু আমাদের কোন দোষ নাই। এদিকে পাগলা সটান শুইয়া আছে। বাবুর চাবুক গ্রহণ ও সপাসপ পাগ্‌লার পৃষ্ঠে প্রদান। পাগ্‌লা এ পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, যেন কত আরামে আবার ও পাশে ফিরিল। চাবুক চলিতেছে—ক্রমশঃ দর দর ধারে রক্তপ্রবাহ, পাগ্‌লা অচঞ্চল, স্থির। রক্তে গদি রক্তময় হইতে লাগিল। পাগ্‌লাকে স্থির দেখিয়া তখন বাবুর মনে একটু ভয় হইল—মনে ভাবিলেন, বুঝি, নরহত্যা অপরাধে অপরাধী হইলাম। এই বলিয়া পাগ্‌লার মুখের দিকে দেখিতে গেলেন, দেখেন, পাগ্‌লা ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছে। তখন বাবুর অমনি পদদ্বয় ধারণ, পাগ্‌লার অমনি উঠিয়া কি কর, কি কর, বলিয়া বাবুর হস্তধারণ। পাগ্‌লা বলিতে লাগিল, এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল, এ আবার কি ভাব? নলিনী বাবু কাঁদিয়া বলিলেন, আমি মহাপাপী, কিছু উপদেশ—কে আপনি? পাগ্‌লা বলিতে লাগিলেন—ওসব অতশত জানি না, তবে এইটুকু বোল্‌তে চাই যে, এই পালঙ্কের গদি, এতে আমি সুখের জন্য নয়, অমনি খানিকক্ষণ শোবার জন্য এতগুলি চাবুক খেলুম—এর সংস্পর্শের গুণ এই, আর তুমি এত যত্ন কোরে, এত সখ কোরে কোরেছ, এইতে দিন রাত তোমার মন প্রাণ পোড়ে আছে, এর সঙ্গ দিন রাত তোমার। তোমাকে কত চাবুক খেতে হবে, এক একবার ভেবো দেখি। এই বলিয়া উত্থান ও বেগে প্রস্থান। বাবুরও কাপড় ফাড়িয়া কৌপীন ধারণ ও দ্রুতবেগে প্রস্থান।

দশ বৎসর পরে নলিনী বাবুদের বাড়ীর সকলে একবার তীর্থ ভ্রমণ ছলে হরিদ্বারে যান। সেখানে দেখেন, এক মহা তেজঃপুঞ্জকায় পুরুষ একটী নির্জ্জন মঠে ধ্যাননিমগ্ন রহিয়াছেন। বাঙ্গালীর চেহারা। তাঁহারা নলিনী বাবু বলিয়া চিনিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রসর হইতে ভরসা করেন নাই। তিনিও কোন কথা বলেন নাই।

যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল।

হরিবিলাস বাবু বামুন আড়া গ্রামের জমিদার। বাবুর যাত্রা শুনবার বড় সখ—স্বর্ণলতায় বিধুভূষণের মত। কিন্তু বাবু বড় ধার্ম্মিক, সন্ধ্যা থেকে ২। ৩ ঘণ্টা জপ পূজা আহ্নিক করা আছে। তার পর বয়সও অনেক হইয়াছে। কিছু আহার অবশ্যই করিতে হয়। এইরূপ জমিদারীরও কিছু কিছু কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বাবুর যাত্রা শুনিতে যাইবার একটু বিলম্ব হইয়াছে, রাত ১২টা। রাতদশটার সময় সাংতা গ্রামে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, গোবিন্দ অধিকারীর দল। তাঁহার গ্রাম হইতে ১॥০ মাইলটাক দূর। বাবু বাহির হইলেন, চাকর লণ্ঠন লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাবুর পাল্‌কী আছে বটে, কিন্তু ১০। ১২ ক্রোশ যাইতে না হইলে পাল্‌কীর ব্যবহার হয় না। আর আজ চাঁদনীরাত, পথটীও ভাল। সোজা পথ। বাবু চলিতেছেন। হাতে মালা আছে, জপও চলিতেছে। অর্দ্ধেক পথ গিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি লোক ফিরিয়া আসিতেছে, দাঁড়াইয়া প্রীতিসম্ভাষণ হইল। পরিচিত বৃদ্ধ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হচ্চে দাদা? তিনি বলিলেন, দাদা, যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল। ঘুমকাতরেরা যাত্রার মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। বাবুও থমকিয়া দাঁড়াইলেন। চাকর বলিল, বাবু দাঁড়ালেন যে! বাবু বলিলেন, হুঁ, যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল। চাকর ভাবিল, বাবুর ভিড় বশতঃ যাত্রা শুনিবার আর ইচ্ছা নাই। কিন্তু বাবু ত হাজার ভিড় হইলেও যাত্রা শুনিতে কখন নারাজ নন। চাকর একটু বিস্মিত হইল। চাকর জিজ্ঞাসিল, তবে ফিরিবেন কি? বাবু বলিলেন, হুঁ, যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল। চাকর লণ্ঠন লইয়া ফিরিল। পথে অনেকের সঙ্গে দেখা হইল, সকলেই ইঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সকলকেই এক কথা, যাত্রা বেশ হচ্চে, কিন্তু পথে বড় গোল। সকলেই একটু বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের যাত্রা শুনিবার সখ এত প্রবল হইয়াছিল যে, আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, সকলে চলিয়া গেল।

বাড়ী গিয়া ছেলে পুলে সকলকে ডাকান হইল। সরকারকে ডাকান হইল। জিজ্ঞাসা করিলে সেই এক কথা। বিষয় ভাগ হইল। প্রাতে এক বস্ত্রে নিরুদ্দেশ।

আমরাও সকলে যাত্রা শুনিতে মত্ত, পথের গোলের কথা কেহ ভাবি কি?

নাস্তিক ও আস্তিক বন্ধুদ্বয়।

রামধন ও হরিধনে ভারি বন্ধুত্ব। এক সঙ্গে শয়ন, এক সঙ্গে ভোজন, এক সঙ্গে কথোপকথন, আলাপ; যে কোন স্থানে যান, কখন দুজনে ছাড়া-

ছাড়ি হয় না। তবে ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘণ্টা খানেকের জন্য রামধনকে কেহ দেখিতে পায় না। হরিধনের ক্রমশঃ কৌতূহল হইল—কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সে সন্ধানে সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল, জানিবে, রামধন কি করিতেছে। একদিন রামধন ধরা পড়িল। হরিধন দেখিল, রামধন চক্ষু মুদিয়া বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে। হরিধন হাঁসিয়াই খুন। একেবারে রামধনের গায়ে পড়িয়া গিয়া বলিল, কি হে, ভারি ধার্ম্মিক হোয়েছ যে দেখ্‌চি! ও সব ঈশ্বর টীশ্বর কিছু আছে না কি? রামধন বন্ধুকে আদর করিয়া বসাইয়া বলিল, ভায়া, যদি কিছু নাই থাকে, তাতে ক্ষতি কি? একঘণ্টা সময় না হয় বাজে গেল, ২৩ ঘণ্টা ত আমোদ করিলাম—আর, যদি কিছু থাকে? হরিধন মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, তাই ত, তা হলে ত আমি একেবারে গেলাম! হরিধনের মুখে ক্ষণিক একটু বিষাদের ছায়া আসিয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। রামধনেরও মনে একটা খট্‌কা উঠিল; এখনও আমি 'যদি'র ভিতর রহিয়াছি। বন্ধুকে ত ঈশ্বর মানাইতে পারিলাম না। কিসে মানান যায়—যুক্তি তর্কে ত পারা যাইবে না। এই মনে করিয়া সে গোপনে গোপনে সদ্গুরু অন্বেষণ করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, শেষে উভয়েই সদ্গুরু পাইয়া কঠোর সাধনায় ঈশ্বরসাক্ষাৎকার পাইয়াছিল।

সমালোচনা।

পালিভাষার উৎপত্তি ও উন্নতি; পালি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং পালি ও সংস্কৃতভাষার পরস্পর সম্বন্ধ। (বাবু চারুচন্দ্র বসু প্রণীত; মহা-বোধি পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত।) এই তিন খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইংরাজী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকার নানা প্রমাণ সহকারে স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পালিভাষা প্রথমে মগধে উৎপন্ন হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি-সহকারে ক্রমশঃ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে উহা বিস্তৃত হয়। অশোকের রাজত্বকালে তাঁহার পুত্র যুবরাজ মাহিন্দ সিংহলে পালিভাষার বিস্তার করেন, তথা হইতে ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে গমন করে। অন্যান্য বৌদ্ধপ্রচারকগণ ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমুদয় এসিয়াতে এই ভাষার প্রচার করেন। কাচ্চায়ন ও অন্যান্য বৌদ্ধগণ প্রণীত ব্যাকরণের অস্তিত্ব দ্বারা গ্রন্থকার বলিতে চান, পালি একটী অসংযত ভাষা নহে; এমন কি, পালিভাষা ও সংস্কৃত ভাষা উভয়ই কোন প্রাচীন অজানিত ভাষা হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। যাহা হউক, প্রধান প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ পালিভাষায় লিখিত বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে এবং ভারতের একটী শ্রেষ্ঠতম যুগের আচার ব্যবহার সামাজিক জীবনসম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে পালিভাষার চর্চ্চা বিশেষ আবশ্যক। আমরা ইংরাজী অনুবাদের মায়া কাটাইয়া যদি মূল পালিভাষার চর্চ্চায় মনোযোগ দিই, তবে যে আমরা ভারতেতিহাসের ও ভারতীয় ধর্ম্মের অনেক নূতন নূতন ও গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হইতেছে যে, অচ্ (স্বরবর্ণ) পরে থাকিলে, বেদে "আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি। ৬।১।১২৬। (আঙ্ উপসর্গের পরে স্বরবর্ণ থাকিলে, অনুনাসিক হয় এবং তাহার প্রকৃতি ভাব হয় অর্থাৎ সন্ধি হয় না, বেদে) এই সূত্রানুসারে, প্রসঙ্গক্রমে, বেদে অনুনাসিকই সাধু হইবে।

তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্।

তুল্যাস্যপ্রযত্নং। ১। সবর্ণম্। ১।

সূত্রানুবাদ।—তালু প্রভৃতি স্থান এবং আভ্যন্তরপ্রযত্ন, ইহারা দুইটাই, যে যাহার সহিত তুল্য, তাহারা (তালু প্রভৃতি স্থান এবং আভ্যন্তরপ্রযত্নবিশিষ্ট বর্ণ সমূহ) পরস্পর সবর্ণ-সংজ্ঞা-বিশিষ্ট হয়।

ভাষ্যমূলম্।—তুলয়াসম্মিতং তুল্যম্। আস্যং চ প্রযত্নশ্চ আস্যপ্রযত্নম্। তুল্যাস্যং চ তুল্যপ্রযত্নঞ্চ সবর্ণসংজ্ঞং ভবতি।

কিং পুনরাস্যম্।

লৌকিকমাস্যম্। ওষ্ঠাৎ প্রভৃতি প্রাক্কাকলকাৎ।

কথং পুনরাস্যম্।

অস্যন্ত্যনেনবর্ণানিতি আস্যম্।

অন্নমেতদাস্যন্দত ইতি বা আস্যম্।

অথ কঃ প্রযত্নঃ।

প্রযতনং প্রযত্নঃ প্র পূর্ব্বাৎ যতৈর্ভাবসাধনো নঙ্ প্রত্যয়ঃ।

যদিলৌকিকমাস্যম্। কিমাস্যোপাদানে প্রয়োজনম্। সর্ব্বেষাং হি তত্তুল্যম্। বক্ষ্যত্যেতৎ। প্রযত্নবিশেষণমাস্যোপাদানমিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তুলা (তুলনামক পরিমাণযন্ত্র) দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে পরিমাণ করা যায় যাহা, তাহার নাম তুল্য। আস্য এবং প্রযত্ন আস্যপ্রযত্ন। তুল্য আস্য এবং তুল্য প্রযত্ন বিশিষ্ট বর্ণের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়।

আস্য জিনিসটী পুনঃ কিরূপ?

আস্য বলিতে লোকসমাজে যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহারই নাম 'আস্য'; অর্থাৎ ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কাকলকের (১) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

---

(১) আমাদের গ্রীবার মধ্যে যে উন্নত স্থান আছে, তাহার নাম 'কাকলক।'

'আস্য' এই শব্দটী কিরূপে নিষ্পন্ন হইল? অর্থাৎ ওষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কাকলকের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত যে মুখ, তাহার 'আস্য' সংজ্ঞা কিরূপে সিদ্ধ হইল?

অস্যন্তি (বহির্নির্গচ্ছন্তি) অর্থাৎ বহির্গত হয় বর্ণ সমূহ ইহা (এইস্থানে) দ্বারা, এই জন্য ইহার নাম 'আস্য'।

অথবা অন্ন সমূহ 'আস্যন্দতে' (দ্রবীকরোতি)' অর্থাৎ দ্রবীভূত হয় এখানে নিক্ষেপ করিলে, এই জন্য ইহার নাম 'আস্য'।

আস্য যেন সিদ্ধ হইল, অনন্তর জিজ্ঞাস্য এই যে, 'প্রযত্ন' জিনিসটী কি?

প্র (প্রকৃষ্টরূপে) যতন, প্রযত্ন; 'প্র' পূর্ব্বক 'যত' ধাতু ভাববাচ্যে 'নঙ্' প্রত্যয়।

যদি লোকপ্রসিদ্ধ আস্য শব্দই এই স্থলে গৃহীত হইয়া থাকে, তবে আবার (স্বতঃসিদ্ধ) আস্য শব্দ শাস্ত্রে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? সকলেরই ত তাহা একরূপ?

"প্রযত্নের বিশেষণ করিবার জন্যই সূত্রে 'আস্য' শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন; এই কথা পরে বলা হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সবর্ণসংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেষ্বতিপ্রসঙ্গঃ প্রযত্নসামান্যাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—সবর্ণ সংজ্ঞাতে ভিন্ন দেশে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে) উৎপন্ন যে বর্ণ, তাহাদেরও প্রযত্ন সমান বলিয়া অতিপ্রসঙ্গ (১) হইবে। *

ভাষ্যমূলম্।—সবর্ণসংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেষ্বতিপ্রসঙ্গোভবতি। জবগডদশাম্।

কিং কারণম্।

প্রযত্নসামান্যাৎ। এতেষাং হি সমানঃ প্রযত্নঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—সবর্ণ সংজ্ঞা করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উৎপন্ন যে বর্ণ, তাহার অতিপ্রসঙ্গ হইবে। যেমন,—জ, ব, গ, ড, দ, ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ তালু, ওষ্ঠ, প্রভৃতি স্থান হইতে উৎপন্ন যে বর্ণ, ইহারাও পরস্পর সবর্ণ হইবে।

কারণ কি?

প্রযত্ন সমান বলিয়া। এই সকল (জ, ব, গ, ড, দ) বর্ণের প্রযত্ন সমান (একই)।

---

(১) প্রসঙ্গকে অতিক্রম করিয়া অন্য বিষয়কে বুঝাইলে, তাহাকে 'অতিপ্রসঙ্গ' বা 'অতিব্যাপ্তি' বলে।

বার্ত্তিকমূলম্।—সিদ্ধংত্বাস্যে তুল্যদেশপ্রযত্নং সবর্ণম্।

বার্ত্তিকানুবাদ।—আস্যে (মুখে) যাহাদের তুল্য স্থান এবং প্রযত্ন তাহার সবর্ণসংজ্ঞা সিদ্ধই হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সিদ্ধমেতৎ।

কথম্।

আস্যে যেষাং তুল্যোদেশঃ প্রযত্নশ্চ তে সবর্ণসংজ্ঞা ভবন্তীতি বক্তব্যম্।

এবমপি কিমাস্যোপাদানে প্রয়োজনং সর্ব্বেষাং হি তত্তুল্যম্।

প্রযত্নবিশেষণমাস্যোপাদানম্। সন্তি হ্যাস্যাদ্বাহ্যাঃ প্রযত্নাঃ। তে হাপিতা ভবন্তি। তেষু সংস্বসংস্বপি সবর্ণসংজ্ঞা ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।—ইহা সিদ্ধ হইবে।

কিরূপে?

আস্যে (মুখাভ্যন্তরে) যাহাদের তুল্য স্থান এবং তুল্য প্রযত্ন, তাহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়, এইরূপ বলিতে হইবে।

এইরূপ হইলেও পুনঃ (সূত্রে) আস্য শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন কি? কারণ তাহা ত সকলেরই তুল্য?

প্রযত্নের বিশেষণ হওয়ার জন্য 'আস্য' শব্দ (সূত্রে) উল্লেখ করা হইয়াছে। মুখের বাহিরে কতকগুলি প্রযত্ন রহিয়াছে; 'আস্য' শব্দ গ্রহণে তাহারা বিনষ্ট হইবে, অর্থাৎ সবর্ণ সংজ্ঞাতে তাহারা গৃহীত হইবে না। তাহারা (বাহ্যপ্রযত্ন সমূহ) তুল্য হইলেও হইবে; না হইলেও (সবর্ণ সংজ্ঞা) হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—কে পুনস্তে।

বিবারসংবারৌ। শ্বাসনাদৌ। ঘোষবদঘোষবত্তা। অল্পপ্রাণতা মহাপ্রাণতেতি॥ তত্র বর্গানাং প্রথমদ্বিতীয়া বিবৃতকণ্ঠাঃ। শ্বাসানুপ্রদানা অঘোষাশ্চ। একেঽল্পপ্রাণাঃ ইতরে মহাপ্রাণাঃ। তৃতীয়চতুর্থাঃ সংবৃতকণ্ঠানাদানুপ্রদানা ঘোষবন্তঃ। একেঽল্পপ্রাণাঃ। অপরে মহাপ্রাণাঃ। যথা তৃতীয়াস্তথা পঞ্চমা আনুনাসিক্যবর্জম্। আনুনাসিক্যমেষামধিকো গুণঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহারা কি কি?

বিবার, সংবার; শ্বাস, নাদ; ঘোষবত্তা, অঘোষবত্তা; অল্পপ্রাণতা, মহাপ্রাণতা ইত্যাদি।

তন্মধ্যে বর্গের যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ণ, বিবৃতকণ্ঠ, শ্বাসানুপ্রদান এবং অঘোষপ্রযত্নবিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে একটী অর্থাৎ প্রথম বর্ণ অল্পপ্রাণ-

বিশিষ্ট, তদ্ভিন্ন অন্যান্য বর্ণ মহাপ্রাণবিশিষ্ট॥ তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ সংবৃত, কণ্ঠ, নাদানুপ্রদান এবং ঘোষবান্; তাহার মধ্যে একটী অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণবিশিষ্ট। অন্য বর্ণ মহাপ্রাণবিশিষ্ট। তৃতীয় বর্ণের যেরূপ প্রযত্ন, পঞ্চম বর্ণেরও সেইরূপ প্রযত্ন, অনুনাসিক ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অর্থাৎ পঞ্চম বর্ণে তৃতীয় বর্ণ অপেক্ষা অনুনাসিক ধর্ম্মমাত্রা অধিক।

ভাষ্যমূলম্।—এবমপ্যবর্ণস্য সবর্ণসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। বাহ্যংহ্যাস্যা স্থানম- বর্ণস্য।

সর্ব্বমুখস্থানমবর্ণস্য একে ইচ্ছন্তি। এবমপি ব্যপদেশো ন প্রকল্পতে। আস্যে- যেষাং তুল্যোদেশ ইতি। ব্যপদেশিবদ্ভাবেন ব্যপদেশো ভবিষ্যতি। সিদ্ধ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।—এরূপ হইলেও অবর্ণের (অকারে আকারে) সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে না। কারণ অ বর্ণের স্থান মুখের বাহিরে।

(এই স্থলেও কোন দোষ হইবে না); যেহেতু, এক সম্প্রদায়ের [illegible]- গণ, মুখই অ বর্ণের অবস্থান-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এইরূপ হইলেও (মুখ অ বর্ণের স্থান হইলেও) ব্যপদেশ [মুখ্য স্থানে মুখ্য ব্যবহার] প্রকল্পিত হইবে না। আস্যে (মুখের অভ্যন্তরে কোনও এক স্থানে) যে সকল বর্ণের তুল্য স্থান, তাহাদের সবর্ণসংজ্ঞা হইয়া থাকে; সুতরাং মুখের একদেশ হইতে উচ্চারিত বর্ণের সবর্ণসংজ্ঞাই যখন মুখ্য, তখন 'অ' বর্ণ মুখের একদেশে উচ্চারিত না হইয়া সর্ব্বমুখব্যাপী হইলে, কিরূপে সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে?

ব্যপদেশিবদ্ভাব (ভিন্ন দেশের ন্যায় ভাব অর্থাৎ অমুখ্য স্থলেও মুখ্য ব্যব- হার) হইয়া থাকে বলিয়া এই স্থলেও (অবর্ণের, মুখের একদেশে) মুখ্য ব্যবহার হইয়া, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভাষ্যমূলম্।—সূত্রং তর্হি ভিদ্যতে।

যথান্যাসমেবাস্তু।

নন্বুচোক্তং সবর্ণসংজ্ঞায়াং ভিন্নদেশেষ্বতিপ্রসঙ্গঃ প্রযত্নসামান্যাদিতি।

নৈষদোষঃ। ন হি লৌকিকমাস্যম্।

কিং তর্হি।

তদ্ধিতান্তমাস্যম্। আস্যেভবমাস্যম্। শরীরাবয়বাদ্যৎ।

কিং পুনরাস্যেভবম্।

স্থানং করণং চ।

এবমপি প্রযত্নোঽবিশেষিতো ভবতি।

প্রযত্নশ্চ বিশেষিতঃ। কথম্।

ন হি প্রযতনং পয়ত্নঃ। কিং তর্হি।

প্রারম্ভো যত্নস্য প্রযত্নঃ।

যদি প্রারম্ভোযত্নস্যপ্রযত্নঃ। এবমপ্যবর্ণস্য এঙোশ্চ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা হইলে (প্রকারান্তরে সিদ্ধ করিলে) সূত্র ত ভিন্ন হইবে? আচ্ছা, তবে সূত্র যেরূপ আছে, সেরূপই হউক? যদি বল যে, সবর্ণ সংজ্ঞায় (মুখের) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অতিপ্রসঙ্গ হইবে, যেহেতু প্রযত্ন পরস্পর সমান?

এইস্থলে কোন দোষ হইবে না। কারণ, লোকে আস্য বলিতে যাহা ব্যবহার হয়, এইস্থলে তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

[illegible]ব কি হইবে?

তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন আস্য শব্দ, এখানে গ্রহণ করা হইবে। আস্যে (মুখে) উৎপন্ন যে সকল বর্ণ, তাহারই নাম আস্য। আস্য শব্দ শরীরের অবয়বকে বুঝায় বলিয়া শরীরাবয়বাদ্‌যৎ ৫।১।৬। (শরীরের অবয়ববাচক শব্দের উত্তর 'যৎ' প্রত্যয় হয়) 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে।

পুনঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, আস্যে কি উৎপন্ন হয়?

স্থান এবং করণ (উচ্চারণসহায়ক প্রযত্নাদি।)

এইরূপ হইলেও প্রযত্নকে বিশেষ করিবে না, অর্থাৎ আস্য শব্দ এইরূপ তদ্ধিতপ্রত্যয়বিশিষ্ট হইলেও তাহাতে 'প্রযত্ন' শব্দ গৃহীত হইবে না; তাহা অনুল্লিখিতই থাকিবে?

প্রযত্ন ও বিশেষিত (বিশেষত্ব প্রযুক্ত গৃহীত) হইবে।

কিরূপে?

কারণ, প্র (প্রকৃষ্টরূপে) যত্নের নাম যে প্রযত্ন, তাহা নহে।

তবে কি?

প্রারম্ভ যত্নের নাম প্রযত্ন।

যদি প্রারম্ভ যত্নের নামই প্রযত্ন হয়; তবে এইরূপ হইলেও ত অবর্ণের এবং এঙ্ (এও) এর পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে?

ভাষ্যমূলম্।—প্রশ্লিষ্টবর্ণাবেতৌ। অবর্ণস্য তর্হ্যেচোশ্চ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি বিবৃততরাবর্ণাবেতৌ। এতয়োরেব তর্হি মিথঃ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি।

নৈতৌ তুল্যস্থানৌ।

উদাত্তাদীনাং তর্হি সবর্ণসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি। অভেদকা উদাত্তাদয়ঃ।

অথবা কিং ন এতেন প্রারম্ভোযত্নস্য প্রযত্ন ইতি। প্রযতনমেব প্রয়ত্নঃ তদেব চ তদ্ধিতান্তমাস্যম্। যৎসমানং তদাশ্রয়িষ্যামঃ।

কিং সতিভেদে, সতীত্যাহ। সত্যেব হি ভেদে সবর্ণসংজ্ঞয়া ভবিতব্যম্।

কুত এতৎ।

ভেদাধিষ্ঠানাহি সবর্ণসংজ্ঞা। যদি হি যত্র সর্ব্বং সমানং তত্র স্যাৎ সবর্ণসংজ্ঞাবচনমনর্থকং স্যাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তাহা ('অ'বর্ণে এবং একার ওকারে পরস্পর সবর্ণ) হইবে না। কারণ, ইহারা উভয়েই প্রশ্লিষ্ট (একত্র মিলিত) বর্ণ। (১)

আচ্ছা, তবে 'অ'বর্ণ এবং ঐকার ঔকারের সহিত পরস্পর (২) সবর্ণসংজ্ঞা হইবে?

তাহাও হইবে না। কারণ, এই (ঐ, ঔ) বর্ণদ্বয় বিবৃততর প্রয়ত্নবিশিষ্ট। অর্থাৎ অবর্ণের কেবল বিবৃতপ্রয়ত্ন, এবং ঐকার ঔকারের বিবৃততর প্রয়ত্ন বলিয়া, প্রযত্নভেদ হওয়াতে, ইহারা পরস্পর সবর্ণ হইতে পারিবে না।

আচ্ছা তবে, এই (ঐ এবং ঔ) বর্ণদ্বয়ের পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হউক?

তাহাও হইবে না। কারণ, ইহাদের (ঐকার এবং ঔকারের) স্থানই সমান নহে।

(যদি এইরূপই হয়) তবে, উদাত্ত প্রভৃতি অর্থাৎ উদাত্ত অ, অনুদাত্ত অও এবং স্বরিত অও পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারিবে না।

তাহাতেও কোন দোষ হইবে না। কারণ, উদাত্তানুদাত্তাদিও পরস্পর অভেদবাচক। (ভেদবাচক নহে)।

---

(১) যেমন কর্দ্দমাক্ত জল মাটীর সহিত অত্যন্ত প্রশ্লিষ্ট বলিয়া কোন্ অংশ জল কোন্ অংশ মাটী, তাহা পৃথক্ করা যায় না; সেরূপ অকারে, ইকার বা উকারের অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট (মিলিত) থাকাতেও চিনিবার যো থাকে না বলিয়া, 'এ'কার বা 'ও'কারের সহিত যে অকার মিলিত আছে তাহাও জানা যায় না। এজন্যই 'অ'বর্ণের সহিত 'এ'কার 'ও'কার সবর্ণও হইবে না।

(২) ঐ এবং ঔ বলিলে তৎপূর্ব্বভাগে অকার স্পষ্ট প্রতীতি হয় বলিয়া (অ+ই=ঐ, অ+উ=ঔ) পুনঃ এইরূপ শঙ্কা করা হইয়াছে।

অথবা "প্রারব্ধ হইয়াছে যে যত্ন, তাহার নাম প্রযত্ন" এইরূপ অর্থ করিবার আমাদের প্রয়োজন কি?

প্রযতন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যত্নের নামই প্রযত্ন; আর সেই তদ্ধিতপ্রত্যয় নিষ্পন্নই "আস্য" শব্দ। সুতরাং যে বর্ণ যে বর্ণের সমান, তাহাকেই আশ্রয় করিবে।

কি, ভেদ (বাহ্য প্রযত্ন সকল ভিন্ন) হইলেও সবর্ণসংজ্ঞা হইবে?

হাঁ, তাহাই হইবে। যেহেতু বর্ণসমূহ পরস্পর (কোনও ধর্ম্মপ্রযুক্ত) ভিন্ন হইলেও, পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞা হইতে পারে।

কেন এইরূপ হইবে?

ভিন্ন ভিন্ন রূপে বর্ণসমূহ অবস্থিত হইলেই সবর্ণসংজ্ঞা হইয়া থাকে। নতুবা যে সকল বর্ণের সকল ধর্ম্মই সমান, তাহারাই যদি পরস্পর সবর্ণ হয়, তাহা হইলে সবর্ণ সংজ্ঞার জন্য পৃথক্ সূত্র করাই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে যাহা ছিল না, পরে তাহা বিধান করিবার জন্যই সূত্রের প্রয়োজন।)

ভাষ্যমূলম্।—যদি তর্হি সতি ভেদে কিংচিৎসমানমিতিকৃত্বা সবর্ণসংজ্ঞা ভবিষ্যতি অকারহকারয়োঃ ষকারঠকারয়োঃ সকারথকারয়োঃ সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্নোতি। এতেষাং হি সর্ব্বমন্যৎ সমানং করণবর্জ্জম্।

এবং তর্হি প্রযতনমেবপ্রযত্নঃ তদেব হি তদ্ধিতান্তমাস্যম্, ন ত্বয়ং দ্বন্দ্বঃ, আস্যং চ প্রযত্নশ্চ আস্য প্রযত্নমিতি। কিং তর্হি? ত্রিপদোয়ং বহুব্রীহিঃ; তুল্য আস্যে প্রযত্ন এষামিতি।

অথবা পূর্ব্বস্তৎপুরুষস্ততো বহুব্রীহিঃ। তুল্য আস্যে তুল্যাস্যস্তুল্যাস্যঃ প্রযত্ন এষামিতি।

অথবা পরস্তৎপুরুষস্ততো বহুব্রীহিঃ। আস্যে প্রযত্নঃ আস্যপ্রযত্নঃ। তুল্য আস্যপ্রযত্ন এষামিতি।

ভাষ্যানুবাদ।—তবে যদি বর্ণসমূহ পরস্পর ভেদ সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, এই করিয়া সবর্ণসংজ্ঞা হয়; তবে অকারের সহিত হকারের, ষকারের সহিত ঠকারের, সকারের সহিত থকারের সবর্ণসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে। কারণ, ইহাদের আর সমস্ত ধর্ম্মই (স্থান প্রভৃতি) সমান; কেবল করণ অর্থাৎ প্রযত্ন সমান নহে।

এইরূপ দোষ হইলে, তবে প্র যতন (প্রকৃষ্ট যত্ন) ই প্রযত্ন; আর সেই

তদ্ধিতপ্রত্যয়নিষ্পন্ন 'আস্য' শব্দ। কিন্তু ইহা আস্য এবং প্রযত্ন=আস্য-প্রযত্ন এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন নহে।

তবে কি?

ইহা ত্রিপদ বহুব্রীহি। যেমন;—তুল্য হইয়াছে আস্যে (মুখে) প্রযত্ন ইহাদের, এইরূপ বিগ্রহ করিব। তাহা হইলেই কোন দোষও হইবে না।

অথবা পূর্ব্বভাগে তৎপুরুষ সমাস করিব, পরে বহুব্রীহি সমাস করিব। যেমন;—তুল্য আস্যে (আস্যে তুল্য ৭মী তৎপুরুষ) তুল্যাস্যঃ; তুল্যাস্য-প্রযত্ন হইয়াছে ইহাদের (বহুব্রীহি) সে তুল্যাস্যপ্রযত্ন।

অথবা পরাংশে তৎপুরুষ এবং তদনন্তর পূর্ব্বাংশে বহুব্রীহি সমাস করিব। যেমন;—আস্যে প্রযত্ন (৭মী তৎ) আস্যেপ্রযত্ন; তুল্য হইয়াছে আস্যে প্রযত্ন ইহাদের, এইরূপ বিগ্রহবাক্য করিয়া "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্" এই সূত্র নিষ্পন্ন হইবে।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্য। *

বার্ত্তিকানুবাদ।—তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্ সূত্রে, তস্য (তাহার) এই শব্দ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। *

ভাষ্যমূলম্।—তস্যেতিতুবক্তব্যম্। কিং প্রয়োজনম্। যো যস্য তুল্যাস্য-প্রযত্নঃ স তস্য সবর্ণসংজ্ঞো যথাস্যাৎ। অন্যস্য তুল্যাস্যপ্রযত্নোঽন্যস্য সবর্ণসংজ্ঞো-মাভূৎ।

ভাষ্যানুবাদ।—তস্য (তাহার) এইরূপ বাক্য বলা উচিত।

তাহার প্রয়োজন কি?

যে যাহার তুল্য আস্য এবং প্রযত্ন, সে তাহারই যাহাতে সবর্ণ সংজ্ঞা হয়; অন্য এক বর্ণের সহিত তুল্য আস্য এবং প্রযত্ন, সে সেই বর্ণের সবর্ণ না হইয়া অন্য বর্ণের সবর্ণ, যাহাতে প্রাপ্তি না হয়।

বার্ত্তিকমূলম্।—তস্যাবচনং বচনপ্রামাণ্যাৎ। *

বার্ত্তিকানুবাদ। বচনের প্রামাণ্য অর্থাৎ এই সূত্রের আরম্ভ হেতুই তস্য (তাহার)—এইরূপ বাক্য (সংযোগ) করিবার প্রয়োজন নাই। *

ভাষ্যমূলম্।—তস্যেতি ন বক্তব্যম্। অন্যস্য তুল্যাস্য প্রযত্নো নাস্য সবর্ণসংজ্ঞঃ কস্মান্নভবতি। বচনপ্রামাণ্যাৎ। সবর্ণসংজ্ঞাবচনসামর্থ্যাৎ। যদি হি অন্যস্য তুল্যাস্যপ্রযত্নোঽন্যস্য সবর্ণসংজ্ঞঃ স্যাৎ। সবর্ণসংজ্ঞাবচনমনর্থকং স্যাৎ।

REGISTERED No. C 295.

উদ্বোধন।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

৭ — ৮।

সূচী।

কলিকাতা।

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্রের গলি, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

পাক্ষিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা।